জননী

শওকত ওসমান

জননী

শওকত ওসমান

ষ্টুডেন্ট ওয়েজ
বাংলাবাজার, ঢাকা

JONONEE
By
Shaukat Osman
Rs. 5·00

ষ্টুডেণ্ট সংস্করণ
জুন, ১৯৬৮

প্রচ্ছদ অঙ্কণে
দেবদাস চক্রবর্তী

পাঁচ টাকা

ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা—১ হইতে মোহাম্মদ
হাবিবউল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও রিপাবলিক প্রেস, ২ নং,
কবিরাজ লেন, ঢাকা—১ হইতে এম. চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ইবনে গোলাম নবী
তারাপদ ঘোষ

মুখবন্ধ

ছাব্বিশ বৎসর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই উপন্যাস রচনা শেষ হয়। তখন ডাল-চালের মত কাগজের দাম এমন অগ্নি-পর্যায়ে ওঠে যে পুস্তক প্রকাশের কথা আর ভাবিনি। এক প্রকাশক দুই বৎসর পরে পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দেন। কারণ, অত্যধিক প্রকাশনা-ব্যয়। এই ডামাডোলের মধ্যে আরো উনিশ বৎসর কেটে যায়। পরে এই পুস্তক জনসমক্ষে পরিবেশনের সৌভাগ্য ঘটে।

বর্তমান সংস্করণও কিছু ইতিহাস-লিপ্ত। কয়েক বৎসর থেকে আর এক সংস্করণ প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। এতদিনে তার সুযোগ ঘটল। পূর্বে পাঠকের কাছ থেকে প্রাপ্ত আন্তরিকতার মত, আশা করি, এবারও এই উপন্যাস সমাদর লাভ করবে।

প্রকাশনার ব্যাপারে ষ্টুডেন্ট ওয়েজের কর্তৃপক্ষ জনাব আল্‌হজ্জ মহাম্মদ হাবিবউল্লাহ এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র জনাব মোহাম্মদ ওহিদউল্লাহ সাহেব ও ম্যানেজার মহাম্মদ হোসেন সাহেবের সৌজন্য মনে রাখার মত। আমার শুভ কামনা, এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক।

বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান জনাব আবদুল হাই সাহেবের পরামর্শ-প্রস্তাবাদি আমার পরিশ্রম অনেক লাঘব করেছে, সেই জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে একদিন তা করতে গিয়ে জানলাম, বিনয়ে তিনি বৈষ্ণব। সুতরাং প্রকাশ্যে তাঁকে আর ধর্মচ্যুত করার সাহস আমার নেই। কোন লেখক বা সজ্ঞানে পাপের ভাগী হোতে চাইবে?

ঢাকা কলেজ,
ঢাকা
২২.৬.৬৮

শ. ও

উ ৭২৬/২৩৯৯১

BANGLA BAZAR GOVT. GIRLS' HIGH SCHOOL DACCA

আলী আজহার খাঁ মহেশডাঙার মামুলী চাষী।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এইখানে সরল রেখায় গ্রাম গ্রামান্তরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ট্রাঙ্ক রোডের পাশেই সরু গ্রামের পথ। কয়েক মিনিট হাঁটিলেই প্রথমে পড়ে আলী আজহার খাঁর বস্তী। সম্মুখে একটি খড়ো দহলিজ। বাম পাশে ছোট ডোবা। পূর্বধারে প্রতিবেশীদের খড়ো ঘর। কয়েকখানা কলাগাছের নীলাভ পাতা চালের ভেতর উঁকি মারিতেছে। উঠানে কেউ বোধ হয় কলাগাছ রোপন করিয়াছিল। আসন্ন বৈকালে এই অঞ্চল ভয়াবহ ঠেকে। জন-বিরল গ্রাম। অরণ্যানীর ছায়াভাষ আগাছার জঙ্গলে সর্বক্ষণ কালো দাগ আঁকিয়া রাখে। বর্ষাকালে পথঘাট দুর্গম। ঝড়ে পাতাপুতি, হেলানো বাঁশবনের কঞ্চি আর কাদায় রাস্তা-চলা বিপজ্জনক। বেতবনের ঝোপ-নিষ্ক্রান্ত বিষাক্ত সাপ দিনেও আশেপাশে বিচরণ করে।

আলী আজহার খাঁকেও এই পথে হাঁটিতে হয়। লাঙল কাঁধে হালের বলদ দু'টীকে ভর্ৎসনার আহ্বান দিতে দিতে বহুদিন দেখা গিয়াছে আলী আজহার খাঁও আনমনে পথ হাঁটিতেছে।

আজ এই খাঁ-পরিবারের কোন ছেলেকে দেখিয়া বোঝা মুশকিল, এক'শ বছর আগে তাহাদের পূর্বপুরুষেরা বাঙালী ছিলেন না। আলী আজহার খাঁর চেহ্‌রা পাট্টা জোয়ানের। রঙ ফর্সা। শুধু এই অবয়বে অন্যান্য প্রতিবেশীদের কাছে সে-ই বৈশিষ্ট্য-পৃথক। নচেৎ কিষাণ পল্লীর ভেতর তার অন্য কোন মাহাত্ম্য গুণ নাই, যার জন্য শত জনের মধ্যে সে প্রথমে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

আলী আজহার খাঁ জানে, তার পূর্বপুরুষেরা এই গাঁয়ের বাসিন্দা ছিলেন না।

দহলিজের ডোবার পাশ দিয়া আর একটা সরু সড়ক কিছুদূর সোজাসুজি পশ্চিমে জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার মধ্যে আত্ম-বিলোপ সাধন করিয়াছে। ভিটার তিনদিকে ঘন ফণীমনসার কাঁটার ঝোপ। আর এক পাশে বেউড় বাঁশ আর বেত এবং অন্যান্য আগাছার রাজত্ব। ভিটার আশে-পাশেও বহু খণ্ড আর চূর্ণ ইঁট পড়িয়া রহিয়াছে। অতীতে এখানে ইমারত ছিল, তার প্রমাণ ইঁট ছাড়া আরো বহু উপাদান আছে, গ্রামের জনপ্রবাদ—ইতিহাসকে নানা রঙে যা' সঞ্জীবিত রাখে। দুপুরে সাপের ভয়ে এইদিকে কেউ আসে না। খাঁ পরিবারের লোকেরা অবশ্য ভয় করে না। জ্বালানীর জন্য এই ভিটার ঝোপ-ঝাড় শুধু তাহারাই সাহস করিয়া কাটে। ইহা আর কারো সহ্য হয় না। কোন না কোন বিপদ জড়াইয়া আসে এই রাজ্যের জ্বালানীর সঙ্গে। মহেশডাঙার শেখেরা একবার একটী চারা অশত্থ গাছ তুলিয়া তাহাদের উঠানে রোপন করিয়াছিল। চার বছর পর সেই বাড়ীর মুরুব্বী নাকি বজ্রাঘাতে উঠানেই মারা যায়। আরো বহু দুর্ঘটনার জন্য খাঁ পরিবার এই রাজ্যচ্যুতির আশঙ্কা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ভিটার চাতালের গাছপালা তাহারাই ভোগ করে।

ভিটা-সংলগ্ন একটা বড় পুষ্করিণী ছিল। বর্তমানে মজা পুকুর মাত্র। পাড়ে কাঁটাবন দুর্ভেদ্য। কয়েক বছর আগেও পদ্মপাতায় পুকুরের সামান্য পানিও দেখা যাইত না। বর্তমানে জীবনের দ্বিতীয় নামও অন্তর্হিত হইয়াছে। খাঁর পুকুরে পীরের কুমীর ছিল। সেই প্রবাদ এখনও মুখে মুখে ফেরে।

আলী আজহার খাঁর নাম পিতৃ-প্রদত্ত। নামের মাহাত্ম্য তারা বোঝে। আজহার খাঁর পিতা আলী আসগর খাঁ সামান্য লেখাপড়া জানিতেন। তবে পার্শীতে তার দখলের যথেষ্ট সুনাম ছিল এই অঞ্চলে। আজহার খাঁ পিতার এই মহিমা-গুণ কিছুই পায় নাই। তাঁর পিতামহ আলী আস্জাদ খাঁ নাকি আরো পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। সওয়া-শ'বছর আগে তার প্রপিতামহ আলী মজহার খাঁ এই গ্রামে অকস্মাৎ নাজেল হইয়াছিলেন। এই বংশের তিনিই আদি-পিতা। শান্-শওকত

দব্‌দবা তার আমলেই ছিল। তারপর খাঁ পরিবারের অধঃপতনের যুগ। ইমারতের আকাশ হইতে আলী মজহার খাঁর বংশধরেরা আজ খড়ো ঘরের মাটিতে নামিয়াছে। শিক্ষা সংস্কৃতি সব নিরুদ্দিষ্ট। মাটীর কাছাকাছি আসিয়া আলী আজহার খাঁও অতীতের দিকে চাহিয়া থাকে। বিগত ইতিহাসের স্বপ্ন তার কাছে ধূসর মরীচিকার মত মাঝে মাঝে জীবন-সংগ্রামের নিরাশা-ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ মুহূর্তে ভাসিয়া আসে বৈকি।

আলী আজহার খাঁর রক্তে পূর্বপুরুষদের যাযাবর নেশা আছে যেন। আবাদের পর আর কোন কাজ থাকে না। ফসলের অনিয়ম নীড়ে কোন মোহ জাগায় না। আজহার তাই রাজমিস্ত্রীর কাজও শিখিয়াছিল। তখন সে দুর ভিন্ গাঁয়ের দিকে কন্নিক আর সূতা হাতে চলিয়া যায়। এম্নি আজহার খাঁ নিরীহ। প্রতিবেশীদের কাছে সে সাধু ও সজ্জন নামে খ্যাত। আলী মজহার খাঁর পঞ্চম অধস্তন পুরুষের একটী যুবক নির্জীবতার জন্য নিরীহ—এমন অপবাদ দেড় শ' বছর আগে কেহ মুখে উচ্চারণেও সাহস করিত না। কর্মময় জীবনের ক্ষেত্র, সাংসারিকতার নাগপাশ, দাসত্বের বেড়ি, পলিমাটীর অদৃশ্য যোজনা শক্তি, কোথায় কিরূপ এখানে কাজ করিয়াছে, কেউ তার ইতিহাস জানে না।

আলী মজহার খাঁর রক্তেও কি এমন ধরা-দেওয়া নির্জীবতার ধারা ছিল?

অতীতের সঙ্গীত-তরঙ্গ কলধ্বনি তোলে। সব সেখানে একাকার হইয়া যায়ঃ বিরাট সমুদ্র-স্তনিত পৃথিবী, স্থাবর-জঙ্গমের গতিশীল যাত্রা-ধ্বনি, শত-মন্বন্তরের পদক্ষেপ, মানুষ আর মানবীর কীর্তিত মিছিল, কালের প্রান্তর-মর্মর। তবুও ভবিষ্যৎ দিক্‌চক্রবালের মত মানুষের নয়ন-পটের সম্মুখে আঁকা। তাই ত এই পথ চলা—যে-পথের বার্তা অতীত-বর্তমান—বর্তমান, অতীত আর ভবিষ্যৎ ত্রিকালের সমাহারে অপূর্ব সমারোহ-ধ্বনি ভাঙা-গড়ার খঞ্জনীতে বাজায়, বাজায়।

আলী আজহার খাঁর সাত বছর বয়সের পুত্র আলী আমজাদ খাঁও হারানো বাছুর খুঁজিতে আসিয়া স্তিমিত বৈকালে তারই হানা-রেশ পাঁজরের গলি-তটে বার বার যেন শুনিতে পায়।

* * * *

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। এই রাজপথ। শেরশার বিজয় বাহিনীর যাত্রাপথ। পাঠান সম্রাট আর নবাবদের ঐশ্বর্য-দ্রষ্টা ধূলি-সড়ক। সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্রমশঃ আত্মগোপন করিতেছে। পত্র-পুষ্পের আবরণে দিনের আলো বাধাপ্রাপ্ত। অন্ধকার অবোধ বালকের মুখেও ছায়া ফেলে। দূরে মলিন আকাশ আর দেখা যায় না। শীতের হিমাচ্ছন্ন রাত্রির আবাহনী শিরীষের ডালে বাজিতে থাকে।

এই রাজ-পথ বাহিয়া সওয়া-শ' বছর আগে আলী মজহার খাঁ পনের জন সহচর, আরো কয়েকটা ঘোড়া লইয়া মহেশডাঙার অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। চারিদিকে গাছপালার অরণ্য। ইংরেজ শাসকদের অস্ত্র-বর্ম-সজ্জিত কোন প্রহরী অন্ততঃ কিছুদিন তাহাদের সন্ধান পাইবে না। বিরাট কর্তব্যের অনুশাসন চতুর্দিকে, মজহার খাঁ বাগ্-ডোর শ্লথ করিয়াছিলেন ঘোড়ার। কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে অশ্ব-পৃষ্ঠে। শুষ্ক রুটী ও ছোট মশকের পানী মাত্র আহার। বিহারের কাছে কোম্পানীর একদল সিপাহী তাহাদের পশ্চাৎ-অনুসরণ করিয়াছিল। মজহার খাঁ ভীরু নন। পাঠানের সন্তান বুজ্‌দীল হয় না কোন দিন। অনেক সময় আত্মগোপন নিজকে বিরাটরূপে বিকাশেরই প্রাথমিক উপায় মাত্র। মজহার খাঁ তাই সেদিন পনের জন অনুচর সহ বহু জনপদ ও দুর্গম পথে পাড়ি দিয়াছিলেন। বাংলা মুল্লুকে হয়ত বহুদিন কাটাইতে হইবে। বাংলার মুসলমানের সঙ্গে তাঁর অনেক বোঝা-পড়া আছে।

অন্ধকার রাত্রি শীতের হিম-হাওয়া পত্রে পত্রে বাজিয়া যায়। ঘোড়াগুলিকে ঘাস খাইতে দিয়া মজহার খাঁ ও তাঁর সঙ্গীরা রুটী সেঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রতি কার্যে অসম্ভব রকম ক্ষিপ্রতা। আহার সমাপনান্তে মজহার খাঁ একবার ঘোড়ার উপর উঠিয়াছিলেন, আবার অবতরণ করিয়াছিলেন তখনই।

মজহার খাঁ বলিয়াছিলেন, "ভাইয়ো, ঠৈরকে ম্যাই আতা।" হাঁটু অবধি নাতি-দীর্ঘ পাজামা-পরিধানে, কোমরে তলোয়ার, বাম বাজুর দিকে গাদা-বন্দুক। মজহার খাঁ মহেশডাঙার অন্ধকারে একাকী ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

সঙ্গী দু-একজন অনুগমন করিতে চাহিল, তিনি বাঁধা দিলেন। "আসহাব, মাই খোদ জানে-ওয়ালা।"

মহেশডাঙার এই সব অঞ্চল তখন জনবিরল। মুসলমান পরিবার নিতান্ত নগন্য। আলী মজহার খাঁকে অনিশ্চয়তা, বোধ হয় সেদিন দৈব কিছু সাহায্য করিয়াছিল। নচেৎ আকস্মিকভাবে তিনি শেখ আরিফউদ্দীন মুনশীর বাড়ীতে প্রথমে পৌঁছিয়াছিলেন কিরূপে!

গ্রামে পশ্চিম-দেশীয় ব্যক্তি মাঝে মাঝে আসে। অগাধ রাত্রে মুনশী আরিফউদ্দীন দহলিজে আসিয়া বিস্মিত হইলেন। জনবিরল অঞ্চলে দস্যুর প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক। মুনশী সাহেব নবাব দপ্তরে বহুদিন কাজ করিয়াছেন। পার্শী জবানেই মজহার খাঁর পরিচয় গ্রহণ শুরু হইয়াছিল। এক প্রহরের মধ্যে দুই বিদেশী মুসলমানে অন্তরঙ্গতা আরম্ভ হইয়াছিল। একজন যুবক আর একজন বৃদ্ধ। মুনশী সাহেবের যুবক-পুত্র শরিফউদ্দীন পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাত্রির মধ্যে আয়োজন চলিতেছে। কিসের আয়োজন?

মুনশী সাহেব বলিলেন, মেরা এহি এক ল্যাড়কা। ওয়াস্তে দীন-কে। খোদাকে রাহ পর।

—বহুৎ আচ্ছা, আব্বাজান।

মজহার খাঁ শরিফ সাহেবকে পিতার মর্যাদা দিয়াছিলেন। তিনি পার্শী জবানে বলিয়াছিলেন, দেশের সূর্য আজ অস্তমিত। কুফর ইংরেজ আমাদের শাসক। মুসলমান আজ ভিখ-মাঙ্গা। আমাদের ঈমান, আমাদের খোদার বেইজ্জতির শুরু হইয়াছে মাত্র। আজ তাই চাই আপনার মত ওয়ালেদ। কওমের সেবায় যিনি একমাত্র নয়নের মণিও উৎপাটিত করিয়া দিতে পারেন!

মজহার একটী ঘোড়া লইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

গভীর শীতার্ত তমিস্রাময়ী রাত্রি।

মুনশী সাহেব, শরিফউদ্দীন আর মজহার খাঁ আল্লার আকাশের নীচে দণ্ডায়মান। শরিফউদ্দীন মজহার খাঁ প্রদত্ত হাঁটু-ঢাকা পাজামা আর পিরহান পরিয়াছিলেন। পিতার চোখের দিকে বিদায় দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, আব্বাজান, এজাজাত (আদেশ দিন)।

'যাও বেটা, কওম-কে রাহ্ পর।' দুই অশ্বারোহী অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছিল। মুনশী আরিফউদ্দীন চাহিয়াছিলেন গভীর তিমির-স্পৃষ্ট পথ আর বনানীর দিকে।

অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি দূরে দূরে মিলাইতে লাগিল। মুনশী সাহেবের কর্ণে ভাসিয়া আসিল বজ্র-কণ্ঠের আওয়াজ:

ওয়াস্তে দীন-কে লড়্না না-পায়ে তম্‌য়ে বেলাদ
শরয়্ মে কঁহতে হেঁ ইস্‌কো জঙ্গে জেহাদ।*

এদেশে তখন ইংরেজদের প্রতাপ ও আক্রমণ নানাদিকে প্রচণ্ডতর হইতেছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় সুদূর কাবুল হইতে বাংলার গ্রাম-অভ্যন্তরে ওহাবী-আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই সময়কার কাহিনী। ওহাবী নেতারা বাংলার গ্রামে প্রভাবশালী মুসলমানদের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিতেছিল। মুনশী আরিফউদ্দীন এই বিষয়ে গোপনে সাহায্য-রত ছিলেন।

কয়েকদিন পর গভীর রাত্রে আবার তাহার ঘুম ভাঙিয়াছিল। শরিফ-উদ্দীনের সঙ্গে আরো বহু বাঙ্গালী ওহাবী দহলিজে উপস্থিত। এইখানে সংবাদ পাওয়া গেল, কোম্পানী তাহাদের গতিবিধির গন্ধ পাইয়াছে। মজহার খাঁ জানিতেন, ক্যাপ্টেন হ্যারিংটন একটী ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া এই অঞ্চলে বাহির হইয়াছে।

রাত্রির অন্ধকারে অশ্বারোহী পদাতিক প্রায় চল্লিশজন মজহার খাঁর নেতৃত্বে আবার চলিয়া গেল।

সেইদিন মহেশডাঙার তিন মাইল উত্তরে হ্যারিংটনের সেনা-বাহিণীর সহিত মজহার খাঁর সাক্ষাৎ ঘটিল।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এখানে সংকীর্ণ। দুপাশে খাদ আর জঙ্গল। অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি শোনামাত্র আলী মজহার খাঁ সঙ্কেত দিয়াছিলেন। ঘোড়া হইতে অবতরনের পর তাহারা সকলেই খাদ পার হইয়া জঙ্গলে আত্ম-

---

* ধর্মের জন্য এই সংগ্রাম—দেশ শাসনের জন্য নয়। ধর্ম গ্রন্থে ইহাই জেহাদ নামে কীর্তিত।

গোপন করিল। ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

মজহার খাঁ কোন আক্রমণ এখন পছন্দ করেন না। সঙ্গীদের তিনি বলিয়াছিলেন, ছোট-খাট দল পাইলে তাহারা আক্রমণ করিবে; কেবল বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র-সংগ্রহের উদ্দেশ্য মাত্র। বিভিন্ন এলাকায় শক্তি বৃদ্ধি হইলে, একযোগে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত তাহারা আক্রমণ শুরু করিবে। তৎপূর্বে নয়। এখন আক্রমণ অযথা শক্তিক্ষয়।

চল্লিশ জন ওহাবী-সৈন্য ঝোপের ভেতর আত্মগোপন করিয়া রহিল। ঘোড়াগুলি শিক্ষিত। সব চুপচাপ শায়িত। এই ঝোপে-ঝাড়ে মশকের দংশনে অতিষ্ঠ হইলেও সকলে নিস্তব্ধ। আরো অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি শোনা-গেল।

মজহার খাঁ অস্পষ্ট কণ্ঠে শরিফউদ্দীনকে বলিতেছিলেন, পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ওহাবী প্রেরিত হইয়াছে। সেখানে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়াছে! তাহারা ফিরিয়া আসিলে তখন আক্রমণ-মূলক পন্থা আরম্ভ করা সমীচীন হইবে। এইজন্য কতগুলি ভাল ঘোড়-সওয়ার কাসেদ বা দূত প্রয়োজন। দলের মধ্যে যারা আর্বী-পার্শী জানেন তাহাদেরই এই ভার দিতে হইবে। নচেৎ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা মুশকিল।

আলী মজহার খাঁ আবার উৎকর্ণ হইলেন। ক্ষুরধ্বনি যেন আরো নিকটবর্তী। আবার মজহার খাঁ বলিলেন, দলে কাল হইতে শরিফউদ্দীন যেন উর্দ্দু-পার্শীর শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। বাঙালী ওহাবী-বন্ধুরা উর্দ্দু বা পার্শী জানে না। আলাপ আলোচনায় বড় অসুবিধা ঘটে। আর ভাষার জন্য মৈত্রীর বন্ধনও ঠিকমত গড়িয়া ওঠে না।

অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি নিকটবর্তী হইল। ফিকে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। মাত্র বারো জন গোরা সিপাহী। সম্মুখে একজন সামরিক সুসজ্জায় শোভিত ইংরেজ। বোধ হয়, ক্যাপ্টেন হ্যারিংটন। আলী মজহার খাঁর শ্যেন-চক্ষু এড়াইয়া কিছুই যায় নাই।

মাত্র বারোজন। প্রত্যেকের নিকট বন্দুক আছে। মজহার খাঁ শরিফউদ্দীনকে বলিলেন, আজ এই সুযোগ তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদের বন্দুক হাল-আমলের নয়। সংখ্যায় কম। এই কয়েকজনকে পরাস্ত করা খুব সহজ। সেইজন্য প্রথম কর্তব্য, শরিফউদ্দীন অন্য কোন

পথে মহেশডাঙা পৌঁছিতে পারে কি-না।

শরিফউদ্দীন সম্মতি-সূচক সায় দিয়াছিলেন।

মজহার খাঁ বলিলেন, আর একটি পন্থা দরকার। দলের কয়েকজন ইহাদের অনুসরণ করিবে। একদল পূর্ব হইতে মহেশডাঙার সড়কে ইহাদের বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। আর একদল মহেশডাঙার এক মাইল দক্ষিণে গাছ কাটিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড অবরোধ করিয়া রাখিবে। কেহ যেন কোনরূপে পালাইয়া না যায়। একটী প্রাণী জীবিত থাকিলেও তাহাদের উদ্দেশ্য বিফল হইবে। পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বে এরূপ আক্রমণ খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শরিফউদ্দীনের সঙ্গে একদল সুশিক্ষিত বন্দুকধারী ঘোড়-সওয়ার খাদ পার হইয়া গ্রামের মেঠো পথ ধরিয়াছিল। মজহার খাঁ মাত্র তিন জন বিশ্বস্ত অনুচর সহ ক্যাপ্টেন হ্যারিংটনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

শরিফউদ্দীনকে তিনি আক্রমণের পূর্বে একটা বংশীনিনাদের সঙ্কেত করিতে বলিয়াছিলেন।

আলী মজহার খাঁ খুব ধীরে ধীরে সতর্কতার সহিত ঘোড়া পরিচালনা করিতেছেন। বিন্দুমাত্র ক্ষুরধ্বনি না দূরে ছড়াইয়া পড়ে।

অনুচরবর্গ প্রত্যেকে সুদক্ষ ঘোড় সওয়ার। তারাও আজ আরো সাবধানী।

সেই গভীর রাত্রে মুন্‌শী আরিফউদ্দীন পুত্রকে কয়েকজন লোক ও কুঠার সংগ্রহ করিয়া দিয়া ইমারতের ছাদে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনিও আজ অস্তমিত। বৃদ্ধ। দেশের সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত হইয়াছে। এই বেইজ্জতি তাঁর সম্মুখে অসহনীয় ব্যাপার। তিনিও আজ নও-জওয়ানের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন। শরীর সামর্থ্যহীন। নচেৎ তিনিও আজ জেহাদের মল্লভূমে গিয়া দাঁড়াইতেন।

আরো দুই প্রহর পরে মহেশডাঙার সন্নিকট গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সড়কের উপর শোনা গেল বন্দুকের দুম্‌দুম্‌ আওয়াজ। নিশীথিনীর পঞ্জর ভেদ করিয়া অস্ত্রের আওয়াজ, আহতের গোঙানি দূরে ভাসিয়া যাইতেছিল। আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি শূন্যে ফরিয়াদের মত বিলীন হইয়া গেল।

মজহার খাঁ ভুল করিয়াছিলেন। শত্রুর অল্প সংখ্যা দেখিয়া তিনি প্রতারিত হইয়াছিলেন। মহেশডাঙার আশে পাশে বহু গোরা সিপাহী মোতায়েন ছিল, তিনি জানিতেন না। সেদিন প্রবল শত্রুর আক্রমণের মুখে কারো তিষ্ঠানো সম্ভব ছিল না। যুদ্ধে ওহাবীরা কেহই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই।

বন্দুকের আওয়াজ বহুবার মুনশী আরিফউদ্দীনের কানে গিয়াছিল। তিনি শুধু নিশি-গ্রস্ত বজ্রাহত ব্যক্তির মত দাঁড়াইয়াছিলেন। তখনই সংবাদ আসিবে—হয়ত কোন অমোঘ সংবাদ আসিবে—বৃদ্ধ বয়সে যা তার সহনশীলতার আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে।

দুই ঘণ্টার মধ্যে আবার বনভূমি নিঃস্তব্ধ হইয়া গেল। ক্যাপ্টেন হ্যারিংটন লণ্ঠনের আলোয় চারিদিক পরীক্ষা করিতে লাগিল। হিন্দুস্থানী রণ-নীতি তার কলা-কৌশলের কাছে পর্যুদস্ত! এই বিজয়-গর্বে প্রায় চারি শত গোরা সিপাহী পরিবৃন্দ হইয়া হ্যারিংটন বলিল, জখমীদের এখানেই ফাঁসি দেওয়া হউক। First lesson for the blackies. Exemplary punishment. কালো চামড়াদের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ক্যাপ্টেন চলিয়া গেল।

পরদিন গ্রামবাসীরা আসিয়া দেখিল পঁচিশ জন ওহাবী শহীদ হইয়াছেন। পনরজন গাছে ফাঁসি লট্‌কানো অবস্থায় ঝুলিতেছেন।

সকলের আগে এই পথে আসিয়াছিলেন মুনশী আরিফউদ্দীন। সড়কের মুখে পড়িয়াছিল তাঁর পুত্র। মুখের উপর দিয়া গুলি চলিয়া গিয়াছে। আজ তাঁর পুত্র বলিয়া কেহ সনাক্ত করিতে পারিবে না। তিনি শুধু চেনেন ওই হাত, ওই মুখ। শরিফউদ্দীনের মাতা পনর বছর এন্তেকাল করিয়াছেন। নিজ হাতে এই নয়নের মণি তিনি লালন করিয়াছিলেন। বুকের উপর কালো দাগেই শরিফউদ্দীনকে চেনা যায়। বৃদ্ধ কোন আহাজারী করেন নাই। শুধু ভাবিয়াছিলেন সালেমার কথা। সালেমা তাঁর কন্যা। ষোড়শী যুবতী অবিবাহিতা। সে কিরূপে ভ্রাতার এই সংবাদ গ্রহণ করিবে ?

সকালে গ্রামবাসিদের সাহায্যে ফাঁসি লট্‌কানো শহীদদের নীচে নামানো হইল। ইহারা সকলেই সামান্য আঘাত পাইয়াছিল মাত্র। কারো

পায়ে বুলেটের দাগ। কারো হাতে। জীবনের সমস্ত আশাই ইহাদের ছিল। সামান্য চিকিৎসায় ফিরিয়া পাওয়া যাইত। ক্যাপ্টেন হ্যারিংটনের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই প্রণালীর কথা মুনশী আরিফউদ্দীন জানিতেন না।

একই কবরে পনের জন শহীদকে দাফন করা হইল। সালেমা ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিল না। আরিফউদ্দীন সাহেব কন্যাকে বলিয়াছেন, শরুফ কাবুলে চলিয়া গিয়াছে। সেইদিন রাত্রে তিনি আবার গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পার হইয়া শহীদগণের কবর-গাহে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অশ্রু তখন কোন বাধা মানে নাই। মূর্চ্ছিত হইয়া অনেকক্ষণ পড়িয়াছিলেন তিনি এই-কবর-গাহে। চেতনা পাইয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সালেমা ভাই-জানের খবর জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তরই পাইয়াছিল পরদিন।

আরো চারদিন পর আসিলেন মজ্‌হার খাঁ। তেমনই গভীর রাত্রি।

"আব্বাজান", ডাক দিয়াছিলেন মজহার খাঁ।

মুন্‌শী আরিফউদ্দীন দহলিজের দুয়ারে পা দেওয়া মাত্র মজহার খাঁ তাঁর পা জড়াইয়া কাঁদিয়াছিল; "আব্বাজান, মাফি মাংতে হেঁই। আব্বাজান"—

পাঠান যুবকের চোখেও সেই রাত্রি অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল।

সিপাহীদল গ্রাম তোল-পাড় করিয়া গিয়াছে। এই গাঁয়ের কোন লোক এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। মুনশী সাহেবের পুত্র কেবল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, কোথায় কেউ জানেনা।

আর দহলিজে নয়। মুনশী সাহেব আলী মজহার খাঁকে একদম লইয়া গেলেন অন্দর মহলে। যে কোন সময় সিপাহী আসিতে পারে। মুনশী সাহেবের অশ্রু-প্লাবিত নেত্র। ধরা-কণ্ঠে মজহার খাঁ বলিয়াছিলেন, "আব্বা, মঁাই আপকা লাড়্‌কা।"

বৃদ্ধ সেদিন চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন এই পাঠান যুবকের মুখ। শরিফউদ্দীনকেই যেন চুম্বন করিতেছিলেন তিনি।

মজহার খাঁ এইখানে বহুদিন আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

আরিফউদ্দীন সাহেব দু'মাস পরে তাহাকে বলিয়াছিলেন, "বেটা খুন্‌কা পেয়াস আওর নেহি।"

—মেরা আস্‌হাব, কওমকে ভাইয়্‌ঁকা খুনকা বদ্‌লা। মেরা ভাই শরিফউদ্দীন—

নেহি, বেটা। আওর খুন্‌কা পেয়াস নেহি।

আর রক্ত তৃষ্ণা নয় ? রক্তের পিপাসা কি মিটিয়া গিয়াছে।

ছয় মাস পরে গভীর রাত্রে সালেমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল্। নওসা আলী মজহার খাঁ। কাজী স্বয়ং আরিফুদ্দীন সাহেব। প্রতিবেশীরা বহুদিন পরে এই বিবাহের সংবাদ পাইয়াছিল।

আলী মজহার খাঁর বুক ভরিয়া ছিল দিগন্তের তৃষ্ণা। কুফর শাসক-পীড়িত হিন্দুস্থানের মজলুম ভাই আর বোনের মুখ ছিল তার চলা-পথের দোপালাক। একটী হৃদয়ের আহ্বানে কি সেই তৃষ্ণা মিটিয়া গেল ? একটী নারীর কাঁকনের কণকণ ধ্বনির স্রোতে কি জিন্দানের সহস্র কোটী জিঞ্জীরের আওয়াজ স্তব্ধ করিয়া দিল ?

নীড়ের বন্ধন স্বীকার করিলেও আলী মজহার খাঁর দিগন্তের পিপাসা কোন্ দিন নিবৃত্ত হয় নাই। সে অন্য কাহিনী। ইংরাজ সিপাহীর সঙ্গে আবার তাহার মোকাবেলা ঘটে। শহিদী কবরগাহেই তাঁর শেষ সমাধি খোদিত হইয়াছিল।

আলী মজহার খাঁর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ আলী আম্‌জাদ খাঁ বাছুর খুঁজিতে আসিয়া শহিদী কবর গাহের সম্মুখে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। আনমনা সে এই পথে চলিয়া আসিয়াছে।

চারিদিক আগাছা আর খেজুরের জঙ্গল। আলী মজহার খাঁ এইখানে শুইয়া আছেন। তারই পূর্বপুরুষ। রক্তে ছিল যার সিংহের বিক্রম, বুলেটের আঘাতে তাঁর শহীদ রুহ্ এইখানে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। আলী আম্‌জাদ খাঁ তা জানে না। আলী মজহার খাঁর রুহ্ কোন দিন মাগ্‌ফেরাৎ প্রার্থী নয়। গিধড় অধস্তন বংশধরদের ধিক্কার ও অভিশাপ দেওয়ার জন্য অন্ততঃ তাঁর মাগ্‌ফেরাতের * কোন প্রয়োজন হইবে না।

মাগ্‌ফেরাৎ—আত্মার মুক্তি।

১

প্রহর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ।

উঠানের উপর রান্না-শালা। উপরে কোন খড়ের ছাউনী নাই। কয়েকটী বাঁশের খুটী ও কঞ্চির ছায়া-রেখা আগুনের ঝলকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। আরো একটী রান্না-শালা আছে উঠানের দক্ষিণে। গ্রীষ্মের দিনে কুঁড়েঘরের ভেতর রান্নার কাজ কষ্টকর। আজহার খাঁ তাই দরিয়া-বিবির জন্য উঠানের উপর চাল-হীন রান্না-শালা তৈরী করিয়াছিল। কয়েকদিন আগেকার ঝড়ে তাল-পাতা উড়িয়া গিয়াছে। শুধু চালার ফ্রেমটী এখন অবশিষ্ট।

দরিয়া-বিবি চুলায় জ্বাল দিতেছিল। হাঁড়ির ভিতর চিড়চিড় শব্দ ওঠে। দম্‌কা বাতাসে আগুনের হল্কা বাহির হইয়া আসে। দরিয়া-বিবির মুখ দেখা যায়। কপালের চারিপাশ ঘামিয়া উঠিয়াছে।

আমজাদ মার পাশে বসিয়া রান্না দেখিতেছিল। অন্যদিকে খড় কুঁচাইতেছিল আজহার খাঁ।

—আম্‌জাদ।

—কি আব্বা?

এক আঁটি খড় বঁটির মুখে রাখিয়া আজহার একবার কপালের ঘাম মুছিবার চেষ্টা করিল।

—অনেক দূর খুঁজেছি, আব্বা। ভারী-বজ্জাত। গাই-ও তেম্নি। বাছুর হারায়।

কঞ্চির ঝুড়ির ভেতর আজহার কুঁচানো খড় রাখিতেছিল। প্রায় পূর্ণ ঝুড়িটী দম্‌কা বাতাসে হঠাৎ আড় হইয়া গেল। কুঁচো খড় হাওয়ায় উড়িতে থাকে। আজহার বঁটি ছাড়িয়া বলে, "আম্জু, ধর বাবা ধর—"।

আমজাদের কচি মুঠি নাগাল পায় না। দরিয়া-বিবি স্বামীর সাহায্যে

অগ্রসর হয়। তার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। ছু-হারা বাঁধন শরীরের। গোল-গাল মুখটী গাম্ভীর্যে টুইটুম্বুর।

আমজাদ কুঁচো খড়ের পেছনে এদিক-ওদিক দৌড়ায়।

—ঐ ছাখো আব্বা, উড়ে যাচ্ছে।

খড়-কুটো বাতাসের বেগে উপরে উঠিতে থাকে।

দরিয়া-বিবি ভারী শ্রান্ত হইয়া বলে, "কি ছিরি, তোমার কাজের"?

দরিয়া-বিবি স্বামীর দিকে তাকায়।

আজহার শান্তকণ্ঠে জবাব দিল: আচম্‌কা হোয়ে গেল। আর কোন দিন এমনটা হোয়েছে?

বাতাসে দরিয়া-বিবির চুল এলোমেলো, হঠাৎ এক মুঠো খড় হাতে সে ডাকে, আমু এদিকে আয় ত বাবা, আমার চোখে কি পড়েছে ছাখ্‌।

দরিয়া-বিবি ততক্ষণ বসিয়া পড়িয়াছে। আমজাদ মার কাছে ছুটিয়া যায়।

এই খড়গুলো ঝুঁড়ির ভেতর রেখে আয়।

আমজাদ এক মিনিটে মার আদেশ পালন করিল।

—ভারী কর্‌কর্‌ করছে চোক্‌টা।

দরিয়া-বিবি কাপড় খোঁটে মুখের ভাপ দিতে থাকে।

—ভাল হোলো, মা?

—দাঁড়া। বাবা, খামাখা বকাস্‌নি।

আমজাদ ফালি লুঙ্গি পরিয়াছিল। মার দেখাদেখি সে-ও লুঙ্গির খোঁট মুখের ভেতর ঢোকায়।

—তরকারীটা বুঝি পুড়ে গেল।

দরিয়া-বিবি এবার লাফ দিয়া চুলার কাছে পৌঁছাইল।

—আমু, একটু পানি দে, বাবা।

আম্‌জাদের সাহায্য-চাওয়া বাতুলতা।

দরিয়া-বিবি দৌড়িয়া ঘরের দিকে ছুটে। কলস ত সেখানেই।

এক মাল্‌সা পানি হাঁড়ির মধ্যে ঢালিতে ঢালিতে বলে, বাপ-বেটায় এক হুজুগ নিয়ে এলো। চোক্‌টা এখনও কর্‌কর্‌ করছে।

আজহার একটী খড়ের বিড়ার উপর বসিয়াছিল। হাতে নারকেলী হুঁকা।

—দরিয়া-বিবি, চুলোতে আগুন পড়েছে ?

চুলোর মুখে বসিয়া দরিয়া-বিবি এলোচুল বিন্যস্ত করিতেছিল।

— আগুন পড়বে না ? কত সিঁদ্‌রে কাঠ জ্বালাচ্ছি।

আজহার দরিয়া-বিবির দিকে তাকায়। তার ফর্সা রং, মুখে এখনও শ্রান্তির ছায়া আঁকা। স্বামীর উৎসাহ নিভিয়া আসে। কল্‌কেটা আজহার খামাখা মাটীর উপর ঘুরাইতে থাকে।

—তুমি জানো, পাতার আগুন। এতে আবার ভাল আগুন পড়ে ? কাঠ-পোড়ানো নসীবে লিখেছে আল্লা ?

— ঐ আগুন-ই দাও।

— তা দিচ্ছি। পাতা ঝেঁটোনারও হাঙ্গামা কত। ও-পাড়ার সাকেরের মা বলে, আমাদের গাছের পাতা আর ঝেঁটিয়ো না, খাঁয়ের বৌ। খড় সব বেচে দিলে ?

আজহার ভারী তামাক খায়। তার নেশা চটার উপক্রম, আর ধৈর্য থাকে না, নিজেই কল্‌কে হাতে দরিয়া-বিবির সম্মুখে দাঁড়াইল।

—খড় না বেচলে, খাজনা দেওয়া হোলো কোথা থেকে ?

—বেশ ভালই করেছ। থাক্‌লে গরু-বাছুর খেয়ে বাঁচত। পোয়াল-টা পুড়োনো চলত। যা জ্বালানীর কষ্ট।

স্বামীর দিকে চাহিয়া দরিয়া-বিবি ঘোম্‌টা টানে। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। নিঃশব্দেই সে আজহারের হাত হইতে কল্কে গ্রহণ করিল।

—বাবা আমু, একটা খাপ্‌রা নিয়ে এসো।

আজহার জিজ্ঞাসা করে, খাপ্‌রা কি হবে ?

ভারী মোলায়েম কণ্ঠ এবার দরিয়া-বিবির।—বাতাসে ফিন্‌কী ছুট্‌লে আর রক্ষে আছে! আগুন লেগে যাবে।

সাবধানে কল্কের মুখে আগুন দেওয়ার পর দরিয়া-বিবি খাপ্‌রাটা উপরে চাপ দিয়া বসাইল।

—যা দম্‌কা বাতাস, গাছের পাতাপুতি আর ওস্থল হবে না। চুলোর হাঙ্গামা পোয়াতেই অস্থির।

ফুড়ুক-ফুড়ুক শব্দ হয়। চক্ষু বুঁজিয়া আজহার হুঁকা টানে।

—দরিয়া-বৌ, পুকুর-পাড়ে ক'টা গাছ আছে, কাট্‌লে হয় না? কয়েক মাসের জ্বালানের জন্যে আর ভাবতে হয় না।

—না, ওসব কাট্‌লে তারপর? কোন কাজকর্ম নেই আর? ছেলেদের বিয়ে শাদী নেই?

আমজাদ মার পাশে বসিয়াছিল। সে বলে, কার বিয়ে হবে মা?

—আমার। বলিয়া দরিয়া-বিবি মৃদু হাসে। গম্ভীর মুখাবয়বে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলিয়া যায়।

পরে সে আজহারের দিকে চাহিয়া বলে, ছেলেটা কোন কথা বল্‌তে দেবে না। ঘর-কন্নার কথার সময় কিছু ভাল লাগে না।

—তোর আব্বার বিয়ে হবে, আমু।

আজহার নিঃশব্দে তামাক খায়। কয়েক বিঘা জমি সে আজ নিজেই হাল করিয়াছে। দরিয়া-বিবির কথা তাঁর কাছে পৌঁছায় না। তন্দ্রার নেশা জমিতেছিল তার তামাকের ধোঁয়ায়।

সুপ্তোত্থিতের মত সে বলে, কার বিয়ে দিচ্ছ?

—তোমার, আমার, গোটা গাঁয়ের।

দরিয়া-বিবি হাসে। আজহার তার মুখের দিকে একবার তাকাইল মাত্র। আবার গুড়ুক টানার শব্দ হয় উঠানে।

আজহার খাঁ স্বভাবতঃই নিরীহ। দৈনন্দিনতার সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু তা-কে সহজে স্পর্শ করে না!

দরিয়া-বিবি পার্শ্বে উপবিষ্ট পুত্রকে বলে, তোর বাবাকে ডাক্। জেগে আছে ত?

—বাবাজী!

আজহার জবাব দেয়, কী আমু।

দরিয়া-বিবি স্বামীকে অনুরোধ করে, এখনি রান্না শেষ হবে। আমুর সাথে গল্প করো।

—মা!

—কি রে!

—ছাখ না গোয়াল-ঘরে, বাছুরটা এসেছে ত।

ভারী মনে করে দিলি, বাপধন। ওগো, বাছুটা দেখো না।

আজহার খাঁ বাছুরের জন্য কোন সন্দেহ প্রকাশ করে না।

—দেখো, কাল সকালে ঠিক আসবে।

আমজাদ দরিয়া-বিবিকে চুপিচুপি বলে, এখন গোয়ালে দেখে আসতে বলো না।

—এখন যাও না একবার গোয়াল-ডাঙায়।

—থাক আজ।

সাদা বাছুর। আমজাদের ভারী প্রিয়। মার কাছে ফরিয়াদের আর অন্য কোন কারণ নাই।

—মা, বাছুরটাকে যদি শেয়ালে ধরে!

—অত বড় বাছুর আবার শেয়ালে ছুঁতে পারে? আজহার খাঁ আবার সন্দেহ প্রকাশ করে।

—আজকালের শিয়াল।

—আজকালের শিয়াল ত, একবার যাও না। কৃত্রিম রাগান্বিত হয় দরিয়া-বিবি।

—আম্মু, বাছুর খুঁজতে তুমি কতদূর গিয়েছিলে?

—মাঠের দিকে গিয়ে কত ডাকলুম। কবরস্থানের কাছে—

দরিয়া-বিবি একটা হাঁড়ি নামাইয়া রান্নাশালের দিকে গেল। উঠানের পশ্চিম দিকে দু-খানি খড়ো-ঘর। ছিটে-বেড়ার তৈরী। শোয়া-বসা চলে দুই ঘরে। পাশে রান্নাঘর। হাঁড়িকুঁড়ি তৈজসপত্র এইখানে থাকে।

রান্নাঘরে হাঁড়ি রাখিয়া দরিয়া-বিবি ফিরিয়া আসিল।

—তুই গিয়েছিলি পুরাণো কবর-স্থানের দিকে?

শহিদী কবরগাহের নাম পুরাতন কবরস্থান। হাল-আমলের অন্য গোরস্থান আছে।

—বারবার করে মানা করব, তবু আমার কথা ত শুন্‌বি নে।

—আমাকে ভয় লাগেনি ত, মা।

—নেই লাগুক। দাঁড়া, একটু বড়পীরের পানী-পড়া আনি।

দরিয়া-বিবি একটা বোতল ও মাটির পেয়ালা সঙ্গে আনিল।

আজহার খাঁ অন্ধকারে ঝিমাইতেছিল। শরীর খুব ভাল নয় তার। এতক্ষণ সে মাতা-পুত্রের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখে নাই।

—কি আন্‌লে, দরিয়া-বৌ।

—বড়পীরের পানি-পড়া, এক ছেলেটাকে খাওয়াব।

আজহার খাঁ তীর বেগে ছুটিয়া আসিল তাহাদের নিকট।

—কর কী, দরিয়া-বৌ! এ-সব কী?

—কেন, কী হয়েছে?

—এ-সব কী। পানী-পড়া খাওয়াচ্ছ? ওহাবীর ঘরে এ-সব বেদাৎ। লোকে কী বলবে?

দরিয়া-বিবি বাজ-খাঁই গলা করে।—বসো, তোমার বেদাৎ তোমার কাছে থাক।

—ভাল কথা নয়, দরিয়া-বৌ।

আজহার শান্ত স্বরেই জবাব দিল।

—এসব নিয়ে কেন গোলমাল বাধাও। ছেলেদের রোগ-দেড়ী আছে। আমি খাচ্ছি নাকি? দরিয়া-বিবির হাতের কামাই নাই। পেয়ালার পানীতে এতক্ষণ আমজাদের কণ্ঠ ভিজিয়া গেল।

আজহার খাঁ সাধারণতঃ বেশী কথা বলে না। সে গুম হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

দরিয়া-বিবির উপর কোন কথা চলে না।

আজহার আবার হুঁকা হাতে নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল।

দরিয়া-বিবি অনুভব করে, স্বামী রাগান্বিত। পরিবেশ আবার স্বাভাবিক করা দরকার। আমজাদকে বলে, তোর আব্বার কাছে গিয়ে একটু গল্প কর। চুলোর আঁচটা দেখি।

আমজাদ ইতস্ততঃ করে।

গুড়ুক টানার আওয়াজ হইতেছিল। আজহার খাঁ নিস্তব্ধ। আমজাদ পিতার নিকট গিয়া ধূলোর উপর বসিল।

আজহার খাঁ এইবার কথা বলে, ধূলোয় বসলি আমু? আয়, আমার কোলে বস্।

দরিয়া-বিবি চুলোর নিকট হইতে জবাব দেয়ঃ আমিও যাব নাকি।

—এসো না, আম্মা।

আজহার খাঁ পুত্রকে কোলে বসাইয়া গুড়ুক টানে।

—থাক বাবা, আমার গিয়ে দরকার নেই। আজহার খাঁ দেখিতে পাইল, দরিয়া-বিবি তরকারীর নুন চাখিবার জন্য হাতের তালু পাতিয়াছে। মুখে পুঞ্জ হাসি রেখায়িত।

চুলার আগুন নিভিয়া আসিতেছে। রান্না প্রায় শেষ। দরিয়া-বিবির মুখ আর চোখে পড়ে না। কানে তার হাসি ভাসিয়া আসে।

—সারাদিন খেটে-খুটে চুপচাপ সবাই। দুঃখ ত চিরকাল। ছেলেটাকে নিয়ে একটু গল্প করো না।

আজহার খাঁ মাঝে মাঝে অতীতের বংশ-কাহিনীর কথকতায় মত্ত হয়। সব দিন নয়। আজ সে কোন জবাব-ই দিল না। নিঃশব্দে তামাক সেবন করিতেছিল, তার কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

সারা উঠান-ময় নিস্তব্ধতা। পুত্র পিতার কোলে আসীন। মা হাঁড়ী লইয়া ব্যস্ত।

চুলা প্রায় নিভিয়া গিয়াছিল। সামান্য কাজ বাকী আছে। দরিয়া-বিবি আবার একরাশ পাতা আনিয়া চুলার মুখে জড়ো করিল।

অশথের কাঁচা পাতা সহজে ধরে না। ধোঁয়ায় উঠান ভরিয়া গেল। বাঁশের চোঙা দিয়া দরিয়া বিবি ফুঁ দিতে থাকে। একটু পরে চুলা জ্বলিতে লাগিল। পাছে আবার নিভিয়া যায়, নিঃশঙ্ক হওয়ার জন্য দরিয়া-বিবি আরো পাতাপুতি গুঁজিয়া দিল। দাউদাউ শিখা, আবার উঠানের চারিদিকে তার আলো পৌঁছায়।

প্রাঙ্গণের উপর একটা অতর্কিত ছায়া পড়িল। ছায়ার কায়া দেখা গেল কয়েক মুহূর্ত পর। একটা তিন বছরের উলঙ্গ মেয়ে ধীরে ধীরে

অগ্রসর হইতেছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চোখে পিঁচুটী-ভরা। সে ভালরূপে চোখ মেলিতে পারিতেছে না। অভ্যাসের সাহায্যে চেনা উঠানের খবরদারী করিতে বাহির হইয়াছে যেন।

তার উপর প্রথম দৃষ্টি পড়িল আজহার খাঁর।

—এসো মা, এসো। এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

সকলের নজর পড়ে মেয়েটীর উপর।

আমজাদ চীৎকার করে: ঐ ভূত-বুড়ি এসেছে।

দরিয়া-বিবি পিছন ফিরিয়া হাসিয়া উঠিল: বুড়ি, এতক্ষণে ঘুম ভাঙল? আজহার খাঁ ডাকে, নঈমা এদিকে এসো।

দরিয়া-বিবির ছোট মেয়ে নঈমা। সন্ধ্যার সময় কাজের ঝামেলা থাকে। বড় বিরক্ত করে তখন নঈমা। কান্না জুড়িয়া দেয় রীতিমত। আজ বিকালে তা-কে ঘুম পাড়াইয়াছিল দরিয়া-বিবি নিজে।

নঈমা আজহার খাঁর নিকট গেল না। সোজাসুজি মার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল!

—একটু দাঁড়া, মা।

দরিয়া একটী হাঁড়ি চুলার উপর হইতে নামাইয়া নঈমা-কে কোলে লইয়া বসিল, আঁচলের খোঁট দিয়া চোখের পিঁচুটী মুছাইয়া দিল।

কোন কথা বলে না নঈমা। হাই ওঠে তার, ঘুম যেন গা-মত হয় নাই।

—কিরে, আরো ঘুমোবি, মা?

নঈমা কথা বলে না। মার বুকে মুখ গুঁজিয়া সে আরাম পায়।

—আর একটু সবুর কর, মা? তারপর তোর আব্বাকে ভাত দেব, তোর আমু-ভাই খাবে, তুই খাবি।

ভাতের কথায় নঈমা উস্‌খুস করে মার কোলে।

—এশার নামাজ তবে পড়ে এসো। আর দেরী করে লাভ নেই, নঈমার চোখে এখনও নিঁদ্‌ রয়েছে।

আজহার খাঁকে লক্ষ্য করিয়া দরিয়া-বিবি কথা ছোঁড়ে।

স্বামী জবাব দিল, এদিকে আমুরও ঘুম পেয়েছে। আমার কোলে শুয়ে বেশ নাক ডাকাচ্ছে।

বিড়ার উপর বসিয়া আমু ঢুলিতে থাকে। দুই চোখ ভরিয়া গোটা রাজ্যের ঘুম আসিয়াছে।

দরিয়া-বিবি এক বদ্না পানি আনিয়া দিল।

—এক কাজ করো, উজু করতে একটু ডান ধারে সরে যাও। কতগুলো ছাঁচি কদুর বীজ পুঁতেছিলাম, কড়ে আঙুল-টুক গাছ বেরিয়েছে। পানী ত রোজ দিই। আজ একটু উজুর পানী পড়ুক। আর হুজুরের কদম-ধোওয়া পানী।

আজহার খাঁ কোন কথা না বলিয়া উঠানের দক্ষিণ দিকে ওজু করিতে বসিল। দরিয়া-বিবির এত হাসি তার ভাল লাগে না।

রান্না শেষ। চুলার ভেতর পাতার আগুন। দরিয়া-বিবি একটা হাঁড়ি চুলার মুখে বসাইয়া দিল, পাছে বাতাস না ঢোকে। রাত্রির মত দরিয়া বিবির কাজ চুকিয়াছে।

আর এক লোটা পানি আনিল সে। আমু খোঁয়ারে ঢুলিতেছিল। তার মুখে পানীর ছিটা দিয়া দরিয়া-বিবি বলিল: একটু হুঁস কর বাবা, আর দেরী নেই। আজ ত একটু পড়্তেও বস্লিনে।

নঈমা এখনও খুঁতখুঁত করিতেছে।

—একটু সবুর কর মা। ঘাট থেকে মুখ ধুতে পানী দিয়ে আসি।

আজহার খাঁর নামাজ পড়া শেষ হইয়াছিল। ছেঁড়া নামাজের পাটি গুটাইতে লাগিল সে।

অন্ধকারে নামাজ পড়া ভাল দেখায় না। দরিয়া-বিবি আগেই একটা টিনের ডিপা জ্বালিয়াছিল চুলার নিকট। নামাজের পাটির দুর্দশা আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়।

দরিয়া-বিবি বলে, নূতন নামাজের পাটি আর কেনা হোল না? সব কাজেই খোদা-কে ফাঁকি।

—হোলো কই! মেলায় গেলাম। একটা পাটি দেড় টাকা চায়।

দরিয়া-বিবির তর্ক শেষ হইয়া যায়। তবু সহজে সে দমে না।

—ছেঁড়া পাটি। সেজদায় যাওয়ার সময় মাথায় ধূলো লাগুক। কপাল ক্ষওয়া দেখলে লোকে বল্‌বে, খুব পরহেজগার!

পাটি গুটানো শেষ করিয়া আজহার খাঁ মুখ খোলে, "আল্লাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে আজহার খাঁ নামাজ পড়ে না। আমার পর-দাদা আলী আমজাদ খাঁর নাম সবাই জানে। সেই বংশের ছেলে আমি।"

—পর-দাদা লেখা-পড়া জানা মৌলবী মানুষ। আমার আর লেখা-পড়ার দরকার আছে? দরিয়া-বিবি টিপ্পনী কাটিল।

আজহার খাঁ বংশের খোঁটা সহ্য করিতে পারে না। নিরীহ ভাল-মানুষটী থাকে না তখন আজহার খাঁ। আজ আপাততঃ চুপ করিয়া গেল সে।

—তুমিও ত ঐ পাটিতে নামাজ পড়ো। তোমারও পরহেজগার হওয়ার সখ আছে।

—তা আছে বৈকি! তোমাদের পায়ের তলায় আমাদের বেহেশ্‌ত। তুমি যদি ঐ পাটি ব্যবহার করো, আমার জন্য বুঝি তা খুব দোষের ব্যাপার।

আজহার খাঁ এই মুহূর্তের জন্য অন্ততঃ উষ্মা প্রকাশ করে।

—আর কোন জিনিষ চেয়ো না। পাটি একটা, যত দাম-ই হোক কিনে আনব।

—অত রাগের কাজ নেই। নামাজের পাটিতে কপাল ক্ষয়ে গেল, একটা পাটি কেনার তওফিকও আল্লা দিলে কৈ?

আজহার খাঁ চুপ করিয়া থাকে। দরিয়া-বিবির কথা তার বুকের ভেতর তোলপাড় তোলে। এমন নাফরমান (অবাধ্য) বান্দা সাজিতেছে সে দিন-দিন। তৌবাস্তাগফের পড়িল আজহার খাঁ তিনবার। তারপর গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—ছেলেদের দিকে দেখো, আমি ঘাট-কূল থেকে আসি।

দরিয়া-বিবি চলিয়া গেল। সারাদিনের পর অবকাশ মিলিয়াছে। চৈত্রের বাতাস বহিতেছিল ঝিরিঝিরি। বাস্তুর নীচে আগাছা-জঙ্গলে নাম-হীন কুসুম ফুটিয়াছে কোথাও।

খুব তাড়াতাড়ি দরিয়া-বিবি পুকুরঘাট হইতে ফিরিয়া আসিল।

আজহার ছেলেদের লইয়া উঠানে বসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করে সে, এত তাড়াতাড়ি এলে?

দরিয়া-বিবির অবয়বে ব্যস্ততার ছাপ।

—বক্‌রীটার বাচ্চা হবে বোধ হয়। ভারী ভ্যাবাচ্ছে, রাত বেশী হয়নি। ঘরে এনে রাখি।

—না, না, দেরী আছে।

আশঙ্কিত দরিয়া-বিবি বলে, না, থেকে-থেকে ভারী ভ্যাবাচ্ছে। রাত্রে যদি বাচ্চা হয়, যা দুঁদে বাছুর রয়েছে, লাথিয়ে কচি বাচ্চা মেরে ফেল্‌বে।

বাড়ী-সংলগ্ন ছোট উদ্বাস্তু। তারপর পুকুর আর পুকুর-ঘাট। পশ্চিম-উত্তর কোণে গোয়াল-ঘর। গরু-বাছুর-ছাগল এক-ই জায়গায় রাখা হয়। পাড়ের দুপাশে বুনো-ঘাস। সাপের আড্ডা। আজহার খাঁর তাই কাজের কোন চাড় ছিল না।

দরিয়া-বিবি বাক্যালাপ না করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। ব্যঞ্জন-আদি পেয়ালায় পরিবেশনের সময় সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল! ছাগলের ডাক ঘম ঘন শোনা যাইতেছে।

—এবার ছেলেদের নিয়ে এসো। ডাক দিল দরিয়া-বিবি। কণ্ঠস্বরে ক্ষুব্ধ ক্রোধ চাপা রহিয়াছে।

নঈমা নিজের হাতে খায় না। দরিয়া-বিবি সকলের খাবার দেওয়ার পর তাকে কোলে তুলিয়া লইল। তার ঘুম যেন সম্পূর্ণ ভাঙে নাই। মার আঙুলের অন্ন সে নিঃশব্দে খাইতে লাগিল।

দরিয়া-বিবির কান সদা-সর্বদা খাড়া রহিয়াছে। ছাগলের চীৎকার মুহূর্তে শোনা যায়। অভাব-ছোঁওয়া সংসারে এই মূক পশুরাই তাহাদের সম্বল। গত বছর গোয়াল ঘরে ছাগলের বাচ্চা হইয়াছিল। দুটী-ই গরুর গুঁতোয় মরিয়া যায়। তার পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে। সেই ছানা দুটী থাকিলে এই বছর চড়া দামে বিক্রী হইত। ব্যাপারীরা সেদিনও খোঁজ লইয়াছিল।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলেও দরিয়া-বিবির অবসর অত সহজে আসে না। আকাশে মেঘ জমিয়াছে। ভোর রাত্রে যদি বৃষ্টি নামে। উঠানের পশ্চিম কোণে ঘুঁটে মেলা আছে। আজ ভিজিয়া গেলে কাল আর চুলা জ্বলিবে না। গাছের ঝরা পাতা লইয়া পাড়ায় মেয়েদের কোন্দল বাধে। দরিয়া বিবি ঝুঁড়িতে ঘুঁটেগুলি তুলিবার জন্য ছুটিয়া গেল। হাত পা

ধুইয়া আসিয়াছিল, আবার ঘুঁটে ছুঁইতে হইল। দরিয়া-বিবি সহজে পরিশ্রান্ত হয় না। তবু আজ খারাপ লাগে তার।

আমজাদ মার কাছে শোয় না। তার আসর অন্য ঘরে। আজহার খাঁর দূর সম্পর্কীয় এক বুড়ি খালা আছে। আসেক্জান। সে চোখে ভাল দেখে না, শ্রবণ-শক্তিহীন। তার আর কোন আশ্রয় নাই। এখানেই কোনরূপে মাথা গুঁজিয়া থাকে। ঈদ-মোহর্‌রম ও অন্যান্য পর্বের সময় গ্রামের অবস্থাপন্ন মুসলমানেরা খয়রাৎ করে, জাকাত দেয়—তারই আয়ে কোন রকমে দিন চলে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে ঘরে ঢোকে আর বাহির হয় না। খাওয়ারও কোন হাঙ্গামা নাই তার। আম্জাদ তার পাশে ঘুপ্টী মারিয়া শুইয়া থাকে। বড় পাতলা ঘুম আসেক্জানের। দৃষ্টিশক্তি অল্প বলিয়া আম্জাদের খবরদারী সে করিতে পারে না। দরিয়া-বিবি তাই বহু রাত্রে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসে। কামরার সংলগ্ন ছিটেবেড়ার ঘর। মাঝখানে একটী বাঁশের চোরা-টাঁটি আছে। যাতায়াতের কোন অসুবিধা নাই। আম্জাদের শোয়া খারাপ। গড়াইতে-গড়াইতে হয়তো ধূলোর উপর শুইয়া থাকে। ডিপা হাতে আজও দরিয়া-বিবি আম্জাদকে দেখিতে আসিল। না, সুবোধের মত সে ঘুমাইতেছে।

পা-তালির শব্দে আসেক-জানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

—কে, আজহার?

—না, আমি দরিয়া, খালা।

—এত রাত্রে কেন, বৌ!

—এম্নি এলাম।

—সারাদিন কাজ। যা ঘুমোগে, বাছা।

—আচ্ছা, যাই।

—আসেক্জান আবার সাড়া দেয়ঃ বৌমা, এলে যখন একটু পানি দাও না মা। বুড়ো-মানুষ, আঁধারে হাতড়ে মরব।

আসলে আসেক্জানের খুব কষ্ট হয় না অন্ধকারে। দুই ঘরে ডিপা জ্বালানোর কেরোসিন-ব্যয় এই সংসারের পক্ষে দুঃসাধ্য। আসেক্জান

পীড়াপীড়ি করে না। সব তার অভ্যাসের কাছে পোষ মানিয়াছে। আঁধারে আঁধারে সে পুকুর ঘাট পর্যন্ত যাইতে পারে।

দরিয়া-বিবি কলসের পানি ঢালিয়া দিল।

—বৌমা, কাল একটু ও-পাড়া যাব। কেউ যদি একটা কাপড় দেয়। সেই আর বছর ঈদে কখন মোস্‌লেম মুন্‌শী একখানা দিয়েছিল। আল্লা, তার ভাল করুক।

দরিয়া-বিবি মাঝে মাঝে ভারী কঠিন হয় বুড়ীর উপর। এত রাত্রে আর গল্পের সময় নাই। দরিয়া-বিবির অন্তর্ধানে আবার ঘরটী অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। শব্দের ভারসাম্য রাখিতে পারে না আসেক্‌জান, নিজে বধির বলিয়া। সে চেঁচাইয়া বলিতে থাকে: মড়ার দিন-কাল কী হোলো? একটা একটাকা পাঁচ-সিকের কাপড়ও লোকের সত্যেয় ওঠে না। আখেরী জমানা! দজ্জাল আসতে আর দেরী নেই। চৌদ্দ সিদির আমল, কিতাবের কথা কি আর ঝুট্‌ হবে?

অনেকক্ষণ পরে আসেক্‌জান বুঝিতে পারে, ঘরে কেহ নাই। তখন নিজেই স্তব্ধ হইয়া যায়। সাদা চুলের উকুন বাছিতে বাছিতে আসেক্‌জান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

অখ্যাত পল্লীর নিভৃতে মানুষের আহাজারী-বুকে নৈশ বাতাস একটানা বহিয়া যায়।

দরিয়া-বিবির আশঙ্কা অমূলক নয়। নিশুতি রাত্রে আবার ছাগলের অবিশ্রান্ত চীৎকার শোনা গেল।

দরিয়া-বিবির পক্ষে বিছানায় পড়িয়া থাকা মুশ্‌কিল। যদি সত্যই ছাগলটীর বাচ্চা হয়। সে একা সামাল দিতে অপারগ। স্বামীকে জাগাইতে হইল।

—ঐ শোনো। ছাগলটা আকুলি-বিকুলি করছে। আজহার খাঁ উঠিয়া পড়িল।

—না, গিয়ে দেখাই যাক। ডিপাটা জ্বালো।

দরিয়া-বিবি স্বামীর আদেশ পালন করিল।

টাঁটি খুলিয়া আজহার খাঁ দেখিল, আকাশে দ্রুত মেঘ জমিতেছে। দম্‌কা বাতাস হু হু শব্দে বহিতেছে।

— দরিয়া-বৌ, ডিপা নিয়ে যেতে পারবে ? খুব বাতাস।

ঘরের কোণায় একটী ধুচ্‌নী ছিল। ডিপাটী তার মধ্যে রাখিয়া স্ত্রী জবাব দিল : চলো, আমি বাতাস কাটিয়ে কাটিয়ে যেতে পারব।

পুকুরের পাড়ের পথ তত সুবিধার নয়। দু-পাশে ঘন জঙ্গল। সাবধানে পা ফেলিতে হয়। ধুচ্‌নীর ভিতর ডিপা। আলো তাই স্পষ্টভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে না। ছাগলের চীৎকার আর যেন থামা জানে না।

জোর ঝড় উঠিতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। পুকুরপাড়ের গাছপালা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নিশুতি বনভূমির প্রেতাত্মা খল খল হাস্যে উন্মাদ নৃত্য-তাণ্ডবে মাতিয়াছে যেন। চারিদিকে গোঙানির শব্দ ওঠে।

দরিয়া-বিবি ভয় পায় না। ডিপা হাতে সাবধানে পা ফেলে সে।

— না, এবার থেকে গোল'ঘর সরিয়ে আনব ভিটের কাছে।

আজহার খাঁ বলিল। কথার খেই সে আবার নিজেই অনুসরণ করে : জায়গা পাব কার ? তবু রায়েদের ভাল-মানুষি যে পুকুর পাড়ে গো'ল করতে দিয়েছে।

দরিয়া-বিবি ডিপা সামলাইতে ব্যস্ত। কোন কথা তার কানে যায় না। পাড়ের উপর শেয়াকুলের ঝোপ আড় হইয়া পড়িয়াছিল। আজহার ভাঙা পিঠুলির ডাল দিয়া কোনরূপে পথ পরিষ্কার করিল। অতি সন্তর্পণে পা-ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না। কাঁটা-কুটিতে পথ বোঝাই হইয়া গিয়াছে।

আরো দম্‌কা বাতাস আসে। গাছপালাগুলি যেন মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে আর কী। এইখানে পথ বেশ পরিষ্কার। দরিয়া-বিবি দ্রুত পা চালায়।

গোয়াল-ঘরের সম্মুখে আসিয়া তারা হাঁফ ছাড়ে। ছাগ-মাতার চীৎকারও আর শোনা যায় না।

গোয়ালের টাঁটি খোলা-মাত্র একটা সাদা বাছুর সম্মুখের তালবন হইতে ছুটিয়া আসিল।

—হতভাগা, কোথা ছিলি সাঁঝবেলা ?

আজহারের গা ঘেসিয়া বাছুরটী লেজ দোলায়। মানুষের ভৎর্সনা বোধ হয় তাদের আদারের পূর্ব লক্ষণ। দরিয়া-বিবি বাছুরের গলায় দড়ী পরাইয়া দিতে বলিল। নচেৎ সব দুধ শেষ করিয়া ফেলিবে।

প্রথমে গরুর কুঠ্‌রী। ছাগলের কুঠ্‌রী একটেরে। ওই দিকটা আরো অন্ধকার। গোয়ালের চালে ঝড় খুব কম লাগে। চারিদিকেই প্রায় ঘন চারা তাল গাছের সারি। বাতাস এই দুর্গ সহজে ভেদ করিতে পারে না।

দরিয়া-বিবি ডিপা লইয়া ছাগলের কুঠ্‌রীতে ঢুকিল। আনন্দে তার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। অসহায় ছাগ-মাতা দণ্ডায়মান। সম্মুখে দুইটী কালো ছাগ-শিশু। পশু-মাতা গা লেহন করিতেছে শিশু দু'টীর।

এখনও ফুল পড়ে নাই। দরিয়া-বিবি তাই বলিল, এক কাজ করা যাক, ফুলটা আমি ফেলে দিই, না-হলে বাচ্চাগুলোর কী দশা হবে যদি ফুল খেয়ে বসে থাকে ? দুধ কিনে বাচ্চা বাঁচানোর পয়সা আছে আমাদের ?

দরিয়া-বিবি আর বিলম্ব করে না। ধাত্রীর কাজ সে নীরবেই সম্পন্ন করিল।

—চলো, আরো ঝড় উঠ্‌তে পারে। তুমি ধাড়ীটাকে কোলে নাও। আমি বাচ্চা দুটো আর ডিপা নিই।

আজহার ইতস্ততঃ করিতেছিল। সদ্যপ্রসূত ছাগীর সংস্পর্শ তার ভাল লাগে না।

—অত বাবুয়ানী যদি করতে চাও করো। ছেলেদের মানুষ করবে, না নিজের মত গরুর লেজ-মলা শেখাবে ?

—যাক না রাত্রের মত। খালি বাচ্চা দুটো নিয়ে যাই।

দরিয়া-বিবির কণ্ঠস্বর ঝঙ্কৃত হয়ঃ নাও তুমি বাচ্চা দুটো, আমি ধাড়ীটা কোলে নিচ্ছি।

দরিয়া-বিবির অবয়বের বাঁধন ভাল। ছাগলটীকে সে সহজেই বহন করিতে সমর্থ হইবে। আনন্দে তার কর্ম্ম-ব্যস্ততা আরো বাড়িয়া যায়।

কয়েক কাঠা জমি অগ্রসর হওয়ার পর মুশ্‌কিল বাধিল ডিপা লইয়া। আজহার খাঁর বুকে ছাগ-শিশু দুইটী। ডিপা আবার ধুচ্‌নীর ভিতর সাবধানে না রাখিলে চলে না। একটু হাত কাঁপিলে বাতাসে নিভিয়া যাইবে।

ভয়ানক রাগিয়া উঠিল দরিয়া-বিবি। শেয়াকুলের ঝোপ পার হওয়ার পর দম্‌কা বাতাসে ডিপা নিভিয়া গেল।

—ঐকাজ তোমাকে দিয়ে হয়! বাচ্চা দুটো আমাকে দিতে কি হোয়েছিল?

আজহার খাঁ আর জবাব দেয় না। অন্ধকারে কোন রকমে দু'জনে অগ্রসর হয়।

কালো মেঘের পঙ্গপাল হুড়ুম-দুড়ুম শব্দে গ্রামের উপর ভাঙিয়া পড়িতেছে। বৃষ্টি নামিলে দুরবস্থার আর অন্ত থাকিবে না।

অন্ধকারে দরিয়া-বিবি বারবার আল্লার নাম করে। নঈমা একা ঘরে শুইয়া রহিয়াছে। পচা ছিটে বেড়ার ঘর। দরিয়া-বিবির সমস্ত রাগ আজহার খাঁর উপর। চোখে তার জল আসে। এমন অবোধ মানুষ-কে লইয়া তার সংসার।

—দরিয়া-বৌ, আর বেশী দেরী নেই।

বিদ্যুতের আলোকে পথ দেখা গেল। পুকুর-পাড় শেষ হইয়াছে।

এইবার নামিল ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি। চেনা সরল পথ। আজহার খাঁ দৌড় দিল। ভারী ছাগ দরিয়া-বিবির কোলে, সে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় সন্তর্পণে চলিতে লাগিল।

উঠানে আসিয়া দরিয়া-বিবি দেখিল, টাঁটি বাতাসে খুলিয়া গিয়াছে। ইন্তার পাতাপুতি ঢুকিতেছে ঘরে। নঈমা অন্ধকারে হাউমাউ জুড়িয়াছে। আসেক্‌জান চেঁচাইতেছে। তার কথার কোন হদিস নাই।

ছাগলটীকে মাটীর উপর রাখিয়া দরিয়া-বিবি ধূলার উপর উপবেশন করিল। জায়গার বাচ-বিচার নাই তার। বড় শ্রান্ত সে।

আজহার খাঁ ডিপা জ্বালাইয়া মাদুরের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল। তেল-চিটা দাগ-লাগা বালিশের একপাশ হইতে কালো তুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া পড়িল আজহার খাঁ।

ক্লান্ত দরিয়া-বিবি করুণ দৃষ্টিতে বার বার স্বামীর মুখ অবলোকন করিতে লাগিল।

২

এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল রাত্রে। আজহার সকালেই লাঙল কাঁধে মাঠে চলিয়া গিয়াছে। এক মাইল দূরে তার জমি। দুপুরের রৌদ্রে বাড়ী ফিরিয়া খাওয়া-দাওয়া করা যায়; কিন্তু আবার মাঠে ফিরিয়া আসা পণ্ডশ্রম। এই জন্য আমজাদ দুপুরের ভাত মাঠে লইয়া যায়। দরিয়া-বিবি তা পছন্দ করে না। আমজাদের মখ্‌তব যাওয়া হয় না। লেখা-পড়া নষ্ট! অন্য উপায়-ও নাই। দরিয়া-বিবি গৃহস্থালীর কাজ করিতে পারে। পর্দানশীনা মেয়েদের মাঠে যাওয়া সাজে না।

আমজাদের কিন্তু এই কাজ খুব ভাল লাগে। দহলিজের এক্‌-টেরে বসিয়া থাকা ভারী কষ্টকর। মাথা ধরে হাই উঠে, তবু মৌলবী সাহেব ছুটীর নাম করেন না। এখানে ইচ্ছামত দেদার মাঠে ঘুরিয়া বেড়ানো, তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে পৃথিবীতে!

ঠিক মাঝামাঝি দুপুরে আমজাদ মাঠে পৌঁছিতে পারে না। দরিয়া বিবি তাড়াতাড়ি করে। রান্না শেষ হইলে আমজাদ নিজে খাইতে বসে। ছেলে-মানুষের বিশ্রাম প্রয়োজন হয়। কোন কোন দিন দুপুর ঢলিয়া যায়।

আজহার অবশ্য তার জন্য রাগ করে না। আমজাদ মাঠে পৌঁছাইলে হাসি মুখেই সে বলে, আমু এত দেরী কেন, ব্যাটা?

—রাঁধতে দেরী। আর আমি জোরে হাঁটতে পারি না। আজহার গামছায় ঘর্মাক্ত কর্চি মুখ মুছাইয়া বলে, থাক তার জন্যে কি হোয়েছে। আমার ভারী পিয়াস পেয়েছে, একটু পানি আনো তো নদী থেকে।

জমির পাশেই নদী। দরিয়া বিবি আমুর হাতে একটা ছোট বদ্‌না দিতে ভুলে না। অন্য সময়, আজহার আঁজলা করিয়া পানি খায়। খাওয়ার সময় এই হাঙ্গামা পোষায় না।

আমজাদ পিতার আদেশ পালন করে। দুপুরের চড়া রোদ। সেও কম ক্লান্ত হয় না। মক্‌তবের জেলখানা হইতে সে রেহাই পাইয়াছে, এই আনন্দে নিজের শ্রান্তির কথা ভুলিয়া যায়।

কয়েত বেলের গাছের ছায়ায় আজহার খাইতে বসে।

বন্যার সময় দু-টী কয়েত চারা ভাসিয়া আসিয়াছিল পাঁচ বছর আগে। আজহার নিজের হাতেই বান-ভাসি চারা দুটী রোপণ করিয়াছিল। ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় অন্যান্য বিশ্রান্ত কিষাণদের গুলজার মজলিস বসে। জমির আর এক কোণে বুনো কলার গাছ। ভাল কলার গাছ রোপণ বৃথা। রাত্রে চুরি হইয়া যায়। এই জন্য মাঠে কেউ ভাল কলার গাছ লাগায় না। পূর্বে কলাপাতার ছায়ায় আজহার মধ্যাহ্ন ভোজন করিত। গাঁয়ের আরো কিষাণ মাঠে আসিয়া বাস করিতেছে। তারা সকলেই বাগ্‌দী, তিওর শ্রেণীর। আজহারও মাঠে বসবাস করিতে চায়। ফসলের খবরদারী ভাল হয়, ইচ্ছামত পরিশ্রম করা যায়। দরিয়া-বিবি রাজী হয় না। বেপর্দা জায়গায় ইজ্জত রাখা দায়। তার উপর পুষ্করিণী নাই। নদীর তট এইদিকে উঁচু। গ্রীষ্মকালে পানী ঢালু তটের দিকে সরিয়া যায়। মুমিনের ঘরের মেয়ে এতটুকু বেপর্দা হইতে পারে না। বাগ্‌দী তিওরেরা কোন অসুবিধা ভোগ করে না। মার সঙ্গে উলঙ্গ কুঁচো ছেলের দল দুপুরে স্নান করিতে যায়। মাঝে মাঝে বন্যা হয়। ভিটা খুব উঁচু না করিলে দুর্দশার সীমা থাকে না। রসিক বাগ্‌দীর দুটী ছেলে কয়েক বছর আগে বন্যার সময় ভিটার উপর হইতে স্রোতে পড়িয়া গিয়াছিল। তাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ভিটে-ত্যাগের কথা উঠিলে দরিয়া-বিবি এই কাহিনী খুব ফলাও করিয়া বলে, আজহার খাঁর উৎসাহ থাকে না আর।

আমজাদ এক বদ্‌না পানী পিতার সম্মুখে রাখিয়া বলে, পানী তেতে উঠেছে। কাল থেকে সকালে বদ্‌না এনে রেখো।

আজহার খাঁ এক লুক্‌মা ভাত গালে তুলিয়াছে, চোয়াল নাড়িতে নাড়িতে জবাব দিলঃ হোক, ক্ষতি নেই বাপ। আজ ভুক লেগেছে জোর।

এক আঁটি খড়ের উপর বসে আমজাদ বাবার আহার-পদ্ধতি নিরীক্ষণ করে। তরকারী ভাল নয় আজ। সামান্য ডাল আর চুনো মাছের শুরুয়া।

আমজাদ মাঠের চারিদিকে তাকায়। ধূ ধূ করিতেছে দূরের মাঠগুলি। নদীর দুই পাশে সবুজ রবি-ফসলের ক্ষেত। সেখানেও রঙ বিবর্ণ। চৈত্রের বাতাস ঝমাল তোলে। বালু ধূলি-কণা অন্য গাঁয়ের দিকে উড়িয়া যায়। পাতলা এক খণ্ড রঙীন ধোঁয়া যেন পাড়ি জমাইয়াছে গ্রামান্তরে।

এই বছর আজহারের লাউ ছাড়া অন্য রবি-ফসল নাই। কুমড়ার লম্বা ডগা সাপের মত জড়াজড়ি করিয়া রৌদ্রে ঝিমাইতেছে। মাটীর ঢেলার উপর একটী কুমড়া দেখা যায়। সবে-মাত্র পাক ধরিয়াছে। হলুদ ধূসর এক রকমের রং চোখ-ঝল্‌সানো আলোয় আরো স্পষ্ট হইয়া ওঠে আমজাদের চোখ বার বার সেই দিকে আকৃষ্ট হয়।

—আব্বা!

আজহার খাঁ মুখ তোলে। রৌদ্রে মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। তার উপর কালো এক গোছা দাড়ী! কয়েকটা ভাত লাগিয়া রহিয়াছে ঠোঁটের এক কোণে। সেদিকে চাহিয়া আমজাদের হাসি আসে।

—ঐ কুমড়াটা পেকেছে?

—খুব পাকেনি।

তুমি সেবার বল্‌লে, ঘরে তুলে রাখলে পেকে যায়।

আজহার খাঁ মুখে এক গাল ভাত তুলিল। একটু থামিয়া সে বলে, পাক্‌বে না কেন?

পুত্রের জিজ্ঞাসার হেতু আজহার খাঁ উপলব্ধি করে।

—কুমড়াটা ঘরে নিয়ে যেতে চাও?

—হ্যাঁ খুব লজ্জিত হয় আমজাদ, যেন সে কত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে।

—না, এখন থাক, বাবা। সাম্‌নে হপ্তায় এক শ' কুমড়া গঞ্জে দেওয়ার কথা আছে। কিছু বায়না নিয়েছি।

পুত্রের মুখের দিকে চায় এবার আজহার খাঁ। কচি শিশুর মুখের উজ্জ্বলতা নিভিয়া গিয়াছে।

আরো কয়েক মুঠি ভাত থালায় পড়িয়া রহিল। আজহার খাঁ বিষণ্ণ হইয়া যায়। এক শ' কুমড়া এই সপ্তাহে জমি হইতে উঠিবে কি-না সন্দেহ, হয়ত অন্য চাষীর নিকট হইতে কেনা ছাড়া উপায় থাকিবে না। ছেলেদের সামান্য আব্দার রক্ষা তার ক্ষমতার বাহিরে। পাইকার আসিয়াছিল গত সপ্তাহে। অগ্রিম বায়না লইয়াছে সে। ওয়াদা-খেলাফ খাঁ পছন্দ করে না। নচেৎ খুব ক্ষতি হইবে তার। অন্য সময় মাঠে কুমড়া পচিতে থাকিবে, পাইকার ছুঁইয়া দেখিবে না পর্যন্ত।

আজহার ছেলের মুখের দিকে তাকাইতে সাহস করে না। মুখ নীচু করিয়া বলে, ওদিকের মাঠে তরমুজ হোয়েছে খুব। তরমুজ খাবে ?

হাসিমুখে আমজাদ পিতার মুখের দিকে চায়। তরমুজের নামে তার ঠোঁটে মুখে আনন্দ রেখায়িত হয়।

—আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি নদী থেকে। বসো, বাবাজী!

নদীর পাড়ের নীচে আজহার ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। পিতার বিলীয়মান ছায়া-মূর্ত্তির দিকে আমজাদ চাহিয়াছিল, সেই দিকেই দৃষ্টি মেলিয়া দিল। মাঠে বাতাস আছে, তাই দারুণ গ্রীষ্মে কোন রকমে সহ্য করা যায়। গাভীদল নির্বিবাদে মাঠে চরিতেছে। দূরে একটী কুঁড়ের পাশে পাকুড় গাছের তলায় কতকগুলি ছেলে খেলা করিতেছিল। তাহাদের হল্লা আমজাদের কানে গেল। আবার চোখ ফেরায় সে। একটু পরে সে শুনিতে পাইল, কে যেন শীস দিতেছে। কোন পাখীর ডাক, বোধ হয়। আমজাদের চেনা পাখী নয়। অদ্ভুত ধরণের শীস। আমজাদ এদিক-ওদিক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

হঠাৎ শীস থামিয়া গেল।

—কা'দের ছেলে রে !

চমকিয়া উঠে আমজাদ। কলা গাছের আড়াল হইতে হঠাৎ একটা লোক বাহির হইয়াছে। যাক, ভয়ের কিছু নাই। লোকটার মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কালো কুচ্‌কুচে গা। হাতে একটী কাস্তে ও নিড়েন-দেওয়া দাউলী।

আবার শীসের জোয়ার ছোটে। এই লোকটী শীস দিতেছিল তা-হলে? ডাগর চোখ তার ঘন-কালো। লম্বা-চওড়া জোয়ান। ভয় করে আমজাদের।

তার দিকে চাহিয়া সে বলে, কাঁ'দের ছেলে? তরমুজ চুরি করতে বেরিয়েছ, না?

ভয়ে জড়সড় হইয়া যায় আমজাদ। আজহার কাছে নাই। নদীতে বৃথা বিলম্ব করিতেছে সে।

—চুরি করতে বেরিয়েছ?

—না। আমি ভাত এনেছি।

লোকটা অকারণ হাসিয়া উঠিল, আবার শীস দিতে দিতে সে গান গায়ঃ

শর্ষে ক্ষেতের আড়াল হোল চাঁদ,
চোখে তার মানুষ-ধরা ফাঁদ
ও উদাসিনী লো—

মাথার বাব্‌রী চুল্‌ গায়কের বাতাসে উড়িতেছিল। গান থামিল কয়েক কলি দোহারের পর।

—ভাত এনেছো?

আমজাদ ম্রিয়মান বালকের মত উত্তর দিলঃ—আব্বা সব খেয়ে ফেলেছে।

—তা হোলে আমার জন্যে রাখোনি কিছু। বাহ্।

মুখ সামান্য নীচু করিয়া আমজাদের দিকে সে দুষ্টুমির হাসি হাসে আর তাকায়। ঠোঁট বাঁকাইয়া সে চোঁচোঁ শব্দ করে।

—একটু ভাত রাখলে না বাপ-ব্যাটা মিলে। হি-হি।

শর্ষে ক্ষেতের আড়াল হোল চাঁদ,
চোখে তার মানুষ-ধরা ফাঁদ
ও উদাসিনী লো—

আমজাদের ভ্যাবাচাকা লাগে। হয়ত লোকটা পাগল। এইবার সে কোমরের উপর বাম হাত রাখিয়া একটু বক্রভাবে দাঁড়াইল।

তারপর ঠোঁটের একপাশে অন্য হাত চাপিয়া লোকটা জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল ঃ এই—তরমুজ ক্ষেতে কে ?

আমজাদ নদীর আশে-পাশে জমির দিকে তাকায়। সেই ছেলেগুলি খেলা করিতেছে। মাঠে জনপ্রাণীর আভাস নাই। গরুগুলি জাবর কাটিতে ছায়ার আশ্রয় সন্ধান করিতেছে। তবু লোকটা চীৎকার করে।

অদৃশ্য উদাসিনীর উদ্দেশ্যে, বোধ হয়, একটি চুম্‌কুড়ি দিয়া সে ছায়ায় বসিয়া পড়িল। একদম আমজাদের পাশে। তাড়ির গন্ধ উঠিতেছে মুখে। আমজাদ একটু সরিয়া বসে।

—অরে লক্ষ্মী, সব ভাত খেলে, আর চাচার জন্যে—তারপর সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উঁচু করিল।

আজহার-কে নদীর পাড়ের উপর দেখা গেল। হাত-মুখ, থালা ধোওয়া শেষ হইয়াছে।

নূতন উৎসাহ পায় লোকটা। আরো জোরে গান ধরে সে। কুমড়া ক্ষেতের ও-পাশে আজহার-কে দেখিয়া সে জোরে ডাকে ঃ ও ভাই, খাঁ।

নিকটে আসিল আজহার ঃ কে, চন্‌দর ?

লোকটা মহেশ-ডাঙার চন্দ্র কোটাল। মাঠেই বসবাস করে সে। ভাঁড়-নাচের দল আছে তার। ভিন-গাঁ হইতে পর্যন্ত ডাক আসে পূজা-পার্ব্বণের সময়। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক কম। জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া কয়েক বছর আগে সে পল্লী পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রতিবেশীর নিঃশ্বাস তার ভাল লাগে না। কিন্তু মাঠে সকলের সঙ্গে তার সদ্ভাব খুব। কয়েক বিঘা জমি দূরে তার কুঁড়ে। স্ত্রী এলোকেশী আর একটী মেয়ে সংসারের সম্বল। বহু ঝড়-আপদ গিয়াছে তার উপর দিয়া। বসন্তে একই মাসে দুটী মেয়ে মারা গেল পাঁচ বছর পূর্বে। চন্দ্র কোটাল স্ফূর্ত্তিবাজ দিলখোলা লোক। কুঁড়ের পাশে কয়েকটী তাল গাছ। আজহারের জমির প্রাঙ্গণ হইতেও তালসারি দেখা যায়। বাঁশ আর তাড়ির ভাঁড় সারা বছর ঐই গাছে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্মের দিনে চন্দ্র কোটালের মরশুম পড়ে।

—ও খাঁ, শিগ্‌গীর এসো।

চন্দ্র আমজাদের দিকে ফিরিয়া বলে, বুড়ো দাড়ীওয়ালা কে ?

—আমার আব্বা।

—কি করে জানো ?

চন্দ্র গোঁফে আঙুল চালায় আর মুচ্‌কি হাসে।

—আমার আব্বা তো। আমি জানি নে !

দূর হইতে সংলাপ কানে যায় আজহার খাঁর। নিকটে আসিয়া বলে ; চন্দর আজ কষে হারাম গিলেছ। খুব যে গান ধরেছিলে। তৌবা !

—এই তো খাঁ-ভাই, তুমি-ও গাল দেবে ?

আজহার খাঁ-কে চন্দ্র সমীহ্ করে। সজ্জন ব্যক্তি। তা-ছাড়া খাঁয়েদের প্রাচীন বংশ-মহিমার কাহিনী এই গাঁয়ের সকলের পরিচিত। তার দাম চন্দ্র-ও দিতে জানে।

—মাছ কেমন ধরছ ?

চন্দ্রের কুঁড়ের সম্মুখে দুটী খালের মোহনা। বারো মাস পানী থাকে। বর্ষাকালে চন্দ্র চাষের দিকে ভাল মন দেয় না। মাছে খুব রোজগার হয় তখন। কাঠি-বাড় দিয়া খালের মোহনা ঘিরিয়া রাখে সে।

না ভাই, দিন-কাল ভাল নয়। একটু তামাক দাও।

আজহার খাঁ বাসন-লোটা নীচে রাখিল। কয়েত বেলের গাছে ঠেস দিয়া সে নারিকেলী হুঁকা রাখিয়াছিল। হাতে তুলিয়া লইল।

—আচ্ছা, তামাক খাওয়াচ্ছি, ছেলেটা-কে একটা তরমুজ দাও। এ-বছর আমার ক্ষেতে নাদারাৎ।

চন্দ্র কোটাল আমজাদের কচি থুৎনী হাতের তালুর উপর রাখিয়া জবাব দিল ঃ আরে ব্যাটা এতক্ষণ আমাকে বলিস্‌নি কেন ?

উঠিয়া পড়িল চন্দ্র। বিঘে দুই জমির পাড়ি। আবার শীস দিতে লাগিল সে। আনুসঙ্গিক গান-ও রেহাই পায় না।

জমি বেচে দুয়োর বেচে
        গড়িয়ে দেব গয়না।
ডুমুর তলার হলুদ পাড়
        আমারে হায় চায় না।

আজহার খাঁ আমজাদ-কে বলে, পাগল চন্দর। পুত্র পিতার মন্তব্যে হাসে।

—আমাকে এতক্ষণ বল্‌ছিল, সব ভাত শেষ করলে আমার জন্যে রাখলে না ?

—তুমি কি জবাব দিলে ?

—কিছু না। চুপচাপ বসেছিলাম। ভয় পেয়েছিল।

আজহার খাঁ হাসে, পাগল চন্দর-কে ভয়ের কিছু নেই ? আচ্ছা, আসুক।

ফিরিয়া আসিল চন্দ্র কোটাল। শীস দিতে দিতে দু'টী বড় তরমুজ মাটীর উপর রাখিল। আমজাদের দুই চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

আজহার খাঁ বলে, দুটো বড় তরমুজ আন্‌লে কেন ?

—তা'তে কী।

—আজ বাদ্ কাল গঞ্জ। এবার চালান দেবে না ?

চন্দ্র ঘাম মুছিতেছিল।

—না, এবার চোরে চোরে শেষ। এই হাট ফাঁক গেল।

দুটী তরমুজ বেশ বড়। একটীর রং ঘন সবুজ। অপরটী সাদা। মাঝে মাঝে কালো ডোর-টানা, যেন চিতা বাঘের গা।

চন্দ্র কোটাল আঙুলের টোকা দিয়া তরমুজ দুটী পরীক্ষা করিল।

—এই সব্‌জে রঙের তরমুজটা খুব পেকেছে। এখনই কাজ চল্‌বে।

চন্দ্র কাস্তের নখ তরমুজের উপর বসাইতে গিয়া থামিয়া গেল।

—তোমার নাম কী, চাচা।

—আমজাদ।

—রাগ করো না। আর একটু দাঁড়াও, চাচা।

—চন্দ্র আবার উঠিয়া পড়িল। নদী-পথের দিকে তার মুখ। বাধা দিল আজহার। সে জিজ্ঞাসা করে, কি হোলো, চন্দর।

—সারাদিন রোদ পেয়েছে, তরমুজ খুব গরম। খেয়ে আবার ছেলেটার শরীর খারাপ করবে।

আজহার ঈষৎ বিরক্ত হয়।

এখন তবে কী করবে ?

—নদীর হাঁটু-জলে বালির তলায় পাঁচ মিনিট রাখলেই, ব্যস। একদম বরফ। —ব-র-ফ।

আজহার দ্বিরুক্তি করে না। চন্দ্র জমির আল ধরিয়া নদীর দিকে চলিয়া গেল।

আজহার পুত্রের দিকে তাকায়।

—দেখলে, চন্দরটা পাগল।

এবার পিতার কথায় আমজাদ সায় দিতে পারে না। সে নদীর দিকে চাহিয়া থাকে। বড় ভালো লাগে চন্দ্র কোটাল-কে তার। সাদা ডোরা-টানা তরমুজের দিকে সে আর একবার লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

দুই বছর গাছে কয়েত বেল ধরে না। রোজগারের এই একটী পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আজহার খাঁ আফসোস করে।

—মাঠে এলে, বাবা! দু'টো বেলও গাছে হয়নি।

আমজাদ এই কথায় কোন সাড়া দেয় না। সে চন্দ্র কোটালের প্রতীক্ষা করিতেছে। সময় যেন আর শেষ হয় না।

সূর্যের কিরণে দহন-সন্তার নাই। পড়ন্ত বেলার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। ঈষৎ-শীতল বায়ু কয়েত বেলের বনে মর্মর তোলে। গাভী দল দোদুল কোকুদে আবার ঘাসের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।

—এই, তরমুজ ক্ষেতে কে ?

নদীর পাড়ে দণ্ডায়মান চন্দ্র একবার হাঁক দিল। হাতে নদী-স্নাত তরমুজ। টপ্ টপ্ পানি পড়িতেছে। আমজাদ আশ্বস্ত হয়।

আজহার তামাক সাজিতেছিল। চন্দ্র নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। এইবার শুরু করা যাক। ফিকফিক হাসে চন্দ্র।

—অমন হাঁক্‌ছিলে খামাখা। তোমার ক্ষেতে ত লোক নেই।

—রাত্রেও মাঝে মাঝে হাঁক্‌তে হয়। লোক নেই, চোর জুটতে কতক্ষণ।

হুঁকার মাথা হইতে কল্কে লইয়া চন্দ্র এলোপাথাড়ি টান আরম্ভ করিল।

—তুমি তরমুজটা কেটে দাও ছেলেকে।

আমজাদ বিছানো খড়ের উপর বসিয়াছিল। তার পাশে বসিল

চন্দ্র। ভক্‌ভক্‌ গন্ধ বাহির হয় মুখ হইতে। আমজাদ্‌ অস্বোয়াস্তি বোধ করে। একটু সরিয়া বসে।

চন্দ্র বলে, ভয় পেয়েছ বাবা ?

—না।

আজহার অভয় প্রদান করে।—ভয় কি। তোর চন্দর কাকা, আমু।

—আমু চাচা, শুরু করো।

আজহার তরমুজ কাটিয়া দিল। লাল-দানা সাদা শাঁসের ভিতর দিয়া উঁকি মারে। তরমুজ খুব পাকা।

— তুমি একটু নাও, চন্দর।

— না, না। আমি একটু রসটস গিলেছি, আর না। চন্দ্র ধোঁয়া ছাড়ে। —আমু-চাচা, খেতে পারবে সব ?

— পারব, চন্দ্র কাকা।

— বেশ কথা বল্‌তে পারে ত।

চন্দ্র আমজাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

— বড় কষ্ট হয় আজের-ভাই। বড় মায়া দেয় মুখগুলো। কিন্তু খামাখা।

আজহার কোটালের কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না। বলে, কি বলছ ?

— এই ছেলেপুলের কথা। বড় মায়া দেয়। কিন্তু সারা জীবন ত খেটে-খেটে বিনি-আহারে বিনি-কাপড়ে যাবে আমাদের মত। চাষীর ছেলে !

—কেন ?

— এখনও বুঝ্‌লে না, আজের-ভাই। মানুষ কল্লা সাধ্যিতে কুলোবে ? কথাটা আজহারের মনঃপূত হয় না। পুত্রের জীবন সম্বন্ধে সে এত নৈরাশ্য পোষণ করে না।

— খোদা নসীবে লিখে থাকে মানুষ হবে !

— ফের কপালের কথা তুলেছ। এই দ্যাখো, আমার সঙ্গে পাঠশালে সেই যে হরি চক্কোত্তির ছেলেটা ছিল, একদম হাবা, কত কান মলে দিয়েছি মানসঙ্ক পারত না, সেটা হাকিম হোয়েছে। গাঁয়ে ত আর আসে না। সেটা হোলো হাকিম ! আর আমি ? পাঠশালের সেরা ছেলে মজাই তাড়ি আর নেশা, মাঠে মাথার ঘাম পায়ে—

অমঙ্গলের ছায়া উঁকি মারে আজাহার খাঁর মনে। আমজাদের কানে এই সব কথা যায় না। সে আনন্দে তরমুজ খাইতে ব্যস্ত।

—ওর বাবা শহরে ছেলেকে নিয়ে গেল। পেটানো গাধা একদম মানুষ। হাকিম

চোখের তারা উপরে তুলিয়া কল্কে হাতে চন্দ্র ভ্রূভঙ্গী করে।

—তুমি বলো নসীব—কপাল! ছো-ছো। হরি চক্কোত্তি বছর বছর জমির খাজ্‌না সাধতে আসে। আমার বাবাকে না খাজ্‌না দিতে হোত— আমাকে না খাজনা দিতে হয়, আয়-উপায় বাড়ে, দেখি কোন দিকের জল কোন দিকে গড়ায়। কার কপাল কত চওড়া দেখা যাক।

আজহার চন্দ্রের কথা মন দিয়া শোনে। কোন উত্তর দিতে পারে না। এই ধরণের কথা বলে দরিয়া-বিবি। কারো সঙ্গে আজহারের মিল নাই। এদিকে আমজাদের তরমুজ খাওয়া পুরোদমে চলিতেছে। পুত্রের ভবিষ্যৎ একবার মাত্র উঁকি দিয়া গেল আজহারের মনে। চকিত ছোঁয়াচ মাত্র। উল্টা-পাল্টা কথা তার ভাল লাগে না। উঠিয়া পড়িল আজহার।

চন্দর এবার কল্কেটা দাও। এখনও বিঘে খানেক জমি মই দিতে বাকী।

দুইবার টান দিয়া কল্কে ফিরাইয়া দিল আজহার।

কয়েত বেলের গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা বলদ দুইটী চোখ বুঁজিয়া রোমন্থন করিতেছিল। আজহারের আগমনে উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পশু দুইটী যেন সর্ব্বদা সচেতন।

মই জুড়িয়া আজহার জমির উপর নামিল। জমিতে শকরগঞ্জ আলু দিবে এইবার আজহার খাঁ।

আমজাদের তরমুজ খাওয়া সমাপ্ত। সে হাত-মুখ গামছায় মুছিয়া ধন্যবাদ জানাইল, "তোমার তরমুজ খুব ভাল, চন্দ্র কাকা।"

—ওই তরমুজটা নিয়ে যেয়ো তোমার মায়ের জন্য। ভাবী আজ কি রেঁধেছিল?

আমজাদের বয়স সাত বছর। সাধারণ দীন ব্যঞ্জন। লোকের

কাছে তা প্রকাশ করিতে নাই। বালক সে-বিষয়ে সচেতন। কোন জবাব দিল না সে।

—বেশ, আমায় একদিন নিমন্তন্ন করো।

অস্ফুট 'আচ্ছা' শব্দে জবাব দিল আমজাদ।

—আজের-ভাই, ছেলে আমার তরমুজ ক্ষেত দেখে আসুক, তোমার ত বাড়ী যেতে দেরী আছে ?

—আচ্ছা, যাক। দেরী করো না, আমু।

—দেরী করব না, বাবাজী।

চৈত্রের বৈকাল। আকাশে খণ্ড মেঘেরা মন্ত্রণারত। সমগ্র প্রান্তর আবার কর্ম্ম-কলরবে জাগিয়া উঠিতেছে। ঝড় না উঠিলে সন্ধ্যা পর্যন্ত রবি-ফসলের ক্ষেতে কাজে কামাই নাই। শুক্লা সপ্তমী। চাঁদের আলোয় খরা-ভীত কিষাণেরা বহুক্ষণ মাঠ গুল্‌জার করিয়া রাখিবে আজ!

অবাক হইয়া চারিদিকে তাকায় আমজাদ। মাঠের নিবিড়ে সে কোনদিন প্রবেশ পথ পায় নাই। চেনাশোনা সড়ক ছাড়া। আজ চন্দ্র কাকার সঙ্গে জলা জাঙালের পথ ভাঙিতে লাগিল সে।

পটল-বাড়ীর মাঝখানে তামাকের গাছ উঠিয়াছে। হাত দুই দীর্ঘ। শাদা ফুল ফুটিয়াছে তামাক গাছে। আমজাদ সেদিকে চায় না। পটল ক্ষেতের ধারে লঙ্কা গাছ অনেক। একটা গাছের কাছে আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। এমন লঙ্কা সে আগে দেখে নাই। লাল রঙের লঙ্কা আকাশের দিকে পা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তারই মত ডিগবাজী দিতেছে যেন। চন্দ্র আগে-আগে ছিল। পেছনে তাকায় সে।

—আরে আমু চাচা, দেখছ কি ?

—এগুলো কী লঙ্কা, চন্দ্র কাকা ?

অবাক হয় কোটাল।

—চাষীর ছেলে হোঁয়ে এই লঙ্কা চেন না ? সুজজু-মুখী লঙ্কা। তুলে নাও কতগুলো।

আমজাদ ইতস্ততঃ করে! পরের জমি।

চন্দ্র নিজেই কতগুলি লঙ্কা আমজাদের হাতে তুলিয়া দিল। নীল

পাতা ভেদ করিয়া লাল রঙের ফুট্‌কী, সূর্যমুখী ছাড়া আর এমন কী গাছ আছে? অবাক হইবারই কথা! আমজাদ লঙ্কাগুলি লুঙ্গীর এক দিকে বাঁধিয়া রাখিল; কিন্তু ফসলের উপর হইতে চোখ সে সহজে ফিরাইতে পারে না। পরদিন মাঠে আসিলে সে এই ক্ষেতের কথা বিস্মৃত হইবে না।

ঝিঙে-বাড়ীর চারপাশে চাষীরা বাব্‌লা কাঁটা দিয়াছে। ইতঃক্ষিপ্ত কাঁটারও অভাব নাই। আমজাদ চন্দ্র কোটালের পেছনে সন্তর্পণে হাঁটিতেছিল। চন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—দাঁড়াও, আমু।

দুই জনের মধ্যে এক-ফালি জমির ব্যবধান। এখানে তামাকের ক্ষেত খুব ঘন। আমজাদ চন্দ্র কাকার সমগ্র অবয়ব দেখিতে পায় না। কোটালের কথা মত সে থামিয়া দাঁড়াইল।

আমজাদের কানে যায়, চন্দ্র বলিতেছে: জমিটা হারান মাইতির, তাই এত কাঁটা, যেম্নি প্যাঁচালে লোক। দূর করে দিতে ইচ্ছা করে।

এক মুহূর্তে চন্দ্রকে আমজাদের পাশে দেখা গেল।

—বেশ করেছো। তোমাকে আর হাঁটতে হবে না।

আমজাদকে আর কোন কথা বলিতে দিল না চন্দ্র, তাকে কাঁধে তুলিয়া লইল সটান।

আমজাদ প্রথম অস্বোয়াস্তি বোধ করিতেছিল, এখন ভাল লাগে তার। চন্দ্র কাকাকে ভয় নাই কিছু। কাঁধে চড়িয়া দূরের গ্রাম আর কিষাণ পল্লী অপরূপ দেখায়।

ক্ষেত পার হইবার পর বুনো-ঘাসের পথ। ফড়িং উড়িতেছে চারিদিকে। চন্দ্র আন্‌মনে চলে। নির্বিকার, নিঃশঙ্ক। শীসের জোয়ার আসে আবার

—আমার মাথাটা আঁকড়ে ধরিস, বাবু। পড়বার ভয় করো না। ইহার পর কল্পিতে একটা বাঁশী দুই হাতে ধরিয়া চন্দ্র শীস দিতে লাগিল। আমজাদের ভয় লাগে। তাল সাম্‌লানো দায় তার পক্ষে।

দম ভরিয়া শীস দেয় চন্দ্র। বোধ হয় গান মনে ছিল না, তাই মেঠো সঙ্গীতের রেশ ওঠে না কোথাও।

আমজাদ নীচের দিকে চাহিয়া দেখে, বুনো ঘাসের সীমানা আর শেষ হয় না। তার প্রতি চন্দ্র-কাকার অনুকম্পার কারণ এখন বুঝিতে পারে।

আমজাদ তাদের জমির দিকে চাহিয়া দেখিল, আব্বা আর চোখে পড়ে না। কতগুলি তাল গাছের আড়াল হইয়া গিয়াছে সব। ক্ষীয়মান সূর্যরশ্মি চিক্‌চিক্‌ করিতেছে তালের পাতায়।

চন্দ্রের শীস এই মাত্র থামে।

—চাচা, কাঁধে চড়ে কষ্ট হচ্ছে না ত।

— না।

সংক্ষিপ্ত জবাব আমজাদের।

চন্দ্র আবার কল্পিত বাঁশী ঠোঁটে রাখিয়া আঙ্গুল নাচাইতে নাচাইতে হঠাৎ থামিল।

—ঠিক চাচা, কাঁধে ভালই লাগে। দুনিয়ার রংই ফিরে যায়। জমিদার সেজে বসে থাকো, চাচা।

আমজাদ চন্দ্র কাকার হেঁয়ালি বুঝিতে পারে না। উঁচু নীচু মাটীর উপর পা ফেলিতেছে কোটাল। তাই তার ঝাঁকড়া চুল আরো কষিয়া ধরে আমজাদ।

—ঐ যে আমার কুঁড়ে দেখা যায়।

চকিতে চোখ ফিরাইল আমজাদ। দুই ছোট নদীর মোহনা। নদী নয়, একটু বড় খাল। আরো কয়েকটা কুঁড়ে পাশাপাশি। সম্মুখে বড় বালির চাতাল। উঁচু ঢিবির উপর ঘরগুলি। সম্মুখে যোজন-যোজন অভিসারযাত্রী প্রান্তর। ওয়েসিসের মত চোখে পড়ে মাটীর সন্তানদের আবাস-ভূমি।

আমজাদের কৌতূহল বাড়ে। চাতালের উপর কতগুলি ছেলেমেয়ে হল্লা করিতেছে, কয়েকজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ঢিবির উপরে। চন্দ্রকাকা শীস দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছেলেদের ভেতর কলরব আরো বাড়িয়া যায়।

সাদা চত্বরের নিকট আসিয়া চন্দ্র জোর গলায় ডাক দিল—এলোকেশী —এলোকেশী!

ছেলেদের মাঝখানে চন্দ্র কোটাল। ঝট্‌কা স্তব্ধতা আসে একবার।

চন্দ্র হাঁকে, এলোকেশী।

ভিড়ের ভেতর হইতে একটা ছেলে বলিল, চন্দ্রকাকা আজ আবার মাতাল হোয়ে এসেছে।

টিবির উপর হইতে একটী মাঝ-বয়সী মেয়ে বাহির হইল। চাষী গেরস্থ ঘরের মেয়ে। ঈষৎ স্থূল-তনু। রোগ-শোক-দীর্ণ মুখ। পরণে ময়লা ন'হাতি কাপড়।

চন্দ্র এইবার সঙ্গীত পরিবেশন করে। ক্রীড়া-রত শিশুদের মধ্যে স্তব্ধতা আরো বাড়িয়া যায়। কয়েকজন মুচকিয়া হাসে।

এলোকেশী চন্দ্রের স্ত্রী। নীচে নামিয়া আসিল।

—কাঁধে কার ছেলে গো ?

—আমার। যাও যাও শিগ্‌গীর। মুড়ি-টুড়ি আছে ?

আমজাদের পা ও ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়া ছোট শিশু-দোলানোর মত চন্দ্র এক ভঙ্গী করিল। একটী শীষ 'সুইৎ' শব্দে থামার সঙ্গে সঙ্গে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল আমজাদ। ভিড় জমে চারপাশে। নদীর ওপারের ছেলেরা এইখানে খেলা জমায় প্রতিদিন। জোয়ারে হাঁটু জল হয় না, তাই পারাপারের কোন অসুবিধা নাই।

—খোকা, এসো আমার কাছে।

এলোকেশী দুই হাত বাড়াইল।

৩

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল নবমীর।

আমজাদ পিতার অনুসরণ করে। বলদ দু'টী তারও আগে। লাঙলের আবছায়া পড়ে মাটীর উপর।

পৃথিবী ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে। মাঠে গ্রাম-ছাড়া হতভাগা বহু মানুষ বাস করে; কিন্তু তারা এমন মানুষ, আমজাদ কোনদিন জানিত না। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মা তাকে মিশিতে দেয় না। রাখাল ছেলেরা অনেক দূর মাঠে মাঠে গো-চারণে যায়। আমজাদের সে সৌভাগ্য হয় না। অবোধ শিশু-মনের পাশে অপূর্ব্ব পুলকের সাড়া পড়ে। চাঁদের আলো আরো উজ্জ্বল হইতেছে। দিগন্তে খাড়া বনানীর রেখা, রবি ফসলের প্রান্তর স্বপ্নের বার্ত্তা বহিয়া আনে। কিসের স্বপ্ন? আমজাদ হদিস করিতে পারে না। মার উপর হঠাৎ বিক্ষোভ জাগে তার। পাড়ার ছেলেরা বদ, তাদের সহবৎ ভাল নয়, তাই দূরে-দূরে থাকিতে হয় তা-কে। মক্তবের পর মার কাছে হাজিরি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

আমজাদের মনে পড়িল এলোকেশীর কথা, চন্দ্র-কাকার কথা। আর এক জগতের মানুষ তারা। তাদের ঘর-দোর, খাওয়া-পরা, চাল-চলন অনেক খানি সে দেখিয়া আসিয়াছে অল্প সময়ের মধ্যে।

এলোকেশী মুখ ভার করিয়া বলিয়াছিল, "খোকা এমন অদিনে এলে ঘরে মুড়ি ছাড়া আর কি আছে, বাবা!"

আমজাদ মুড়ি খাইয়াছিল। চন্দ্র কাকার মেয়ে ধীরা সম্মুখে দাওয়ায় দাঁড়াইয়া তার খাওয়া দেখিতেছিল। ধীরার চোখে দুনিয়ার বিস্ময়।

—গরীব চাচা, ঘরে কিছু নেই আমু। মার কাছে বদনাম করো না।

চন্দ্র-কাকা হাসে আর কথা বলে। চোখ পিটপিট করিয়া পা

নাচাইতেছিল সে। লাজুক আমজাদ মাথা নীচু করিয়া মুড়ি ঠোঁটে তুলিতেছিল।

— খাঁয়েদের বাড়ীর ছেলে, না?

এলোকেশীর জিজ্ঞাসা।

— হ্যাঁ। আমার বাড়ীরই ছেলে বলতে দোষ কী?

— দোষ আর কী!

— এই বংশের কত গল্প যে শুনেছি ঠাকুরমার কাছে। কি হোলো কলিকালে!

আমজাদ এলোকেশীর চোখের দিকে চায়। পাছে ধরা পড়ে, দৃষ্টি নামিয়া আসে সেই জন্য।

— আর নূতন খাঁয়েদের কাহিনী শোননি?

মহেশ-ডাঙা বর্ত্তমানে দুই জমিদারের অধীন। ছ'আনি আর দশআনি জমিদার। ছয়-আনার মালিক হাতেম বখশ্ খাঁ। দশ-আনির অধিকারী রোহিনী চৌধুরী। ছয়-আনির মালিকেরা সংখ্যায় তিন-চারিটী পরিবার। একটী নূতন পাড়ার পত্তন করিয়াছে ইহারা। গ্রামের লোকের কাছে তারা নূতন-খাঁ নামে বিদিত।

—আরে দুর ছাই। কিসে আর কিসে। রহিম খাঁয়ের বাবা-কে কে না জান্ত? সুদখোর। সুদের পয়সায় জমিদার—।

চন্দ্র কোটাল বাধা দিয়াছিল এই সময়ঃ তোমরা জান না, গরুর গায়ে ঘা হোলে ন'টা সুদখোরের নাম লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিতে হয়। পোকা পড়ে যায়। আগে পেরতম নাম লিখত জায়েদ খাঁর—রহিমের বাবার! তোমাদের গরু কটা ঠিক আছে ত, চাচা?

সংলাপের গুঞ্জন ওঠে আমজাদের চারপাশে। চন্দ্র-কাকার হাসির মাদকতা বাতাসে ভাসিয়া আসে। আজকের পথ-চলা বড় আনন্দদায়ক। থাক তরমুজের বোঝা। তবু। বড় তরমুজ আমজাদের পক্ষে বোঝা বিশেষ। বার বার হাত ফেরী করিতেছিল সে। পিতার পদক্ষেপ দ্রুত নয়, এই টুকু যা' সুবিধা।

আমজাদ শেষে মাথায় তুলিল তরমুজটী।

এক ফালি মেঘ পাতলা আবরণে হঠাৎ চাঁদের মুখ ঢাকিয়া দিল। প্রান্তরের উপর ঈষৎ ম্লানিমা। মাকড়া অন্ধকার জমিয়া ওঠে সড়কের উপর।

আজহার খাঁ আজ খুব ক্লান্ত। চন্দ্র কোটাল আমজাদকে সন্ধ্যার আগে পেঁছাইয়া দেয় নাই। অপেক্ষা করিয়াছিল কিছুক্ষণ আজহার খাঁ। খামাখা বসিয়া থাকা আর তামাক ধ্বংস করা তার ধাতে পোষায় না। তাই সে আবার কাজে লাগিয়াছিল। জমির টুকিটাকি কাজে অনেকক্ষণ কাটিয়াছে। তারপর আসিল চন্দ্র আর আমজাদ। সুতরাং আরো বিলম্ব হইয়াছিল। চন্দ্র কোটাল কত কথাই না বলে। নেশা কাটিয়া গিয়াছে তার। সুখ-দুঃখের কথায় রাত্রি বাড়ে। জোৎস্না রাত্রি, আজহার খাঁর কোন তাড়া ছিল না। চন্দ্র আজ আর বাড়ী ফিরিবে না। তরমুজ ক্ষেত পাহারায় তার রাত্রি কাবার হইয়া যাইবে।

—ছেলেটা-কে আবার মাঠে এনো, আজহার-ভাই।

শীস দিতে দিতে মাঠে নামিয়াছিল চন্দ্র। তার অপরূপ চলার ঢুল্‌কী ভঙ্গী আমজাদের সাম্‌নে স্পষ্ট। পিতার উপর আবদারের জোরটা এবার বিফলে যাইবে না—কোটাল-কাকার মত মুরুব্বী রহিয়াছে যখন।

আবার চাঁদের মুখ দেখা যায়। মেঘেদের নেকাব খুলিয়া গিয়াছে। সড়কের উপর উজ্জ্বল দিনের আলো ঝরে যেন। আমজাদ গ্রামের প্রবেশ পথে একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। দিগন্তের মেঘ্‌লা আলো-অন্ধকার প্রান্তরের বিবাগী সীমানা আঁকিয়া দিতেছে। রবি ফসলের ক্ষেত্রের উপর বহু বাঁশ-ডগালির ছায়া-রেখা উঁচানো। পেঁচকের দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার উপর বসিতেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় মেঠো ইঁদুরশীকার দেখা যাইত। আর একটা কৌতূহলের উঁকি আমজাদের মনে। দিনের আলোয় অন্ধ পেঁচা ইঁদুরের মত চতুর প্রাণী শীকার করিতে পারে, তার বিশ্বাস হয় না। চন্দ্র কাকার কাছে সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইবে।

অবোধ বালকের পশ্চাতে প্রান্তরের ইশারা মাথা কুটিতে থাকে।

গ্রামের সরু সড়ক। আশে পাশে প্রতিবেশীদের ঘর। জনপদের

জীবনে এখনও কোলাহল থামে নাই। প্রথমেই পড়ে নূতন খাঁয়েদের পাকা দহ্‌লিজ। ছেলেরা হল্লা করিয়া পড়িতেছে। আরো কল-গুঞ্জন। চাষীদের দরবার চলিতেছে বোধ হয় হাতেম খাঁর সম্মুখে। জমিদারী সেরেস্তার কারখানায় নায়েব পাইকেরা কোন মন্ত্রণায় মাতিয়াছে। মহ্‌বুব মির্দ্দার মুদীখানায় এখনও খরিদ্দার আছে। টিমটিম আলো জ্বলিতেছে। মহ্‌বুব বসিয়া আছে একটা চৌকীর উপর দাড়ি-পাল্লা হাতে। সন্ধ্যার পর গ্রামের চাষী মজুরদের সওদা আরম্ভ হয়। একপয়সার তেল, আধ পয়সার লঙ্কা, পৌন পয়সার নুন। ছোট খুদীখানা, তার খরিদ্দারগণের চাহিদাও অল্প। দিনের বেলা ফরসুৎ থাকে না কারো। অবেলা সন্ধ্যায় সওদা শুরু হয়। মহ্‌বুবের মুদিখানায় এখনও আলো জ্বলিতেছে, তা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

আজহার খাঁ লাঙল মাটীর উপর নামাইয়া রাখিল।

ঝিরঝির বাতাস দিতেছিল। সে মাটীর উপর বসিয়া গামছা দোলাইতে লাগিল। আজহার খাঁ রীতিমত ঘামিতেছে।

—হাউ।

বদল দুইটী অগ্রসর হইতেছিল! আজহার খাঁর ডাকে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

—বাবা আমু, তরমুজটা রাখ। একবার দোকানে যা।

আমজাদ পিতার আদেশ-মত তরমুজ সাবধানে মাটীর উপর রাখিল, হাতে ফসকাইলে চৌচির হইয়া যাইবে।

—এই নে বাবা দুটো পয়সা। আমি একটু জিরোই। লাঙলটা দিন দিন ভারী হোয়ে যাচ্ছে।

—কি আন্‌বো, আব্বা?

—দুটো পয়সা। দেড় পয়সার বিড়ি আর আধ পয়সার দেশলাই।

তারপর একটী খালি দেশলাইয়ের খোল আজহার লুঙ্গির ট্যাঁক হইতে বাহির করিল।

—এই নে খোল্‌টা। গোটা কুড়ি কাঠি দেবে। গুণে নিস, বাবা।

পয়সা হাতে লইয়া আমজাদ ইতস্ততঃ করে।

— দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

—আমি যাব না, আব্বা।

—কেন ?

—আধ-পয়সার দেশলাই, লজ্জা লাগে।

হঠাৎ ক্লান্তি-জনিত বিরক্তি বোধ করে আজহার খাঁ।

—এই জন্য মনে করি আর মক্তবে পাঠাব না তোকে। গরীবের ছেলে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মিশে মেজাজ এম্নি হোয়ে যায়।

আমজাদ দোকানে এক পয়সার লজেঞ্চস কি কড়ি-বিস্কুট কিনিতে আসে। গেরস্থালির সওদা কোন দিন করে না। প্রথম দিনের কর্ত্তব্য বোঝা ঠেকে তার কাছে।

—যা'। মোলায়েম নয় কণ্ঠস্বর আজহার খাঁর।

—যার যেমন পয়সা তেমন কেনে, লজ্জা কিসের ?

পিতার শেষ বাক্য আমজাদের কানে প্রবেশ-পথ পায় না, সে দোকানের দিকে অগ্রসর হইল।

বলদ দু'টী সম্মুখে। লেজ দোলাইয়া মশা তাড়াইতেছে। আজহার খাঁ আর একবার হাঁকিল, হাউ।

ফিরিয়া আসিল আমজাদ। কাচু-মাচু মুখ।

—আব্বা, দেশলাই ফুরিয়ে গেছে! মোটে দশটা কাঠি আছে। আর সিকি-পয়সার নুন দেবে, দোকানী বললে।

—যা, তাই নিয়ে আয়।

এইখানে, কাঠা-দুই ফাঁকা খামার। চারপাশে পাড়ার গাছপালা। বাতাস আসে না বেশী। আজহার খাঁ প্রতীক্ষা করে।

—এই নাও, আব্বা।

আজহার খাঁ কাঠি গণিয়া দেখিল। নুনের প্যাকেট, দেশলাই, বিড়ি গামছার খোটে বাঁধিয়া বলিল, চল, বাবা।

তরমুজ যেন ভারী হইয়াছে দশগুণ। আমজাদের মনে বিস্বাদ জমিয়া ওঠে। মাঠে বিচরণের আনন্দ উবিয়া গিয়াছে তার। পিতার দিকে চাহিয়া তার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। দু'টী বলদের সঙ্গে

আর একটী পশু যেন হাঁটিতেছে লাঙল কাঁধে। ঘৃণার সর্পিনীরা ক্রুদ্ধ-শ্বাস ফেলিতেছে কচি বুকের ভেতর।

মুখ ভার করিয়া পিতার পেছনে পেছনে চলে আমজাদ।

খাঁয়েদের সড়ক আরো সংকীর্ণ। দুপাশে বেত আর হেলঞ্চ গাছের ঝোপ ঘন। চাঁদের আলো গাছের ফাঁক দিয়া সন্তর্পণে মাটীর উপর নামে। ভালরূপে সড়ক দেখা যায় না। লাঙলের ফলক পাছে লতায় জড়াইয়া যায় আজহার খাঁ পদক্ষেপ তাই আরো শ্লথ করে।

—বাবা, আমু, আমার ঠিক পেছনে আয়।

আমজাদ বাবার কণ্ঠস্বর চেনে। আশঙ্কা স্নেহ-বাৎসল্য রসের প্রস্রবনরূপে জ্যোৎস্নার মতই ঝরিতেছে যেন।

আমজাদ ভয় পায়। পিতার নিকটে আসিয়া সে স্বোয়াস্তি অনুভব করে। বুক হাল্কা হইয়া যায়।

—আমু।

—আব্বা।

—রাগ করেছিস আমার উপর?

আমজাদ হঠাৎ জবাব দিতে পারে না। পিতা কী তার মনের গতিবিধি বোঝে?

—না, আব্বা।

লাঙলের ফলা হেলঞ্চ-লতায় জড়াইয়া গিয়াছিল। আজহার-কে দাঁড়াইতে হয়!

—এক হাতে লতা-টা সরিয়ে দাও, বাবা!

আমজাদ অতি-কষ্টে লতা-মুক্ত করিল ফালটী। আরো সাবধানে পা ফেলে আজহার।

কুঞ্চিত চাঁদের মুখ। বন-রাজ্য ভেদ করিয়া স্পষ্ট আলো এ-দিকে আসে না।

আজহার খাঁ বলে, গরীব বলে মন খারাপ্ করতে নেই। সব আল্লার ইচ্ছা। না-হলে খোদা নারাজ হন।

আমজাদ কোন জবাব দিল না। সে শুধু শোনে।

ঝিল্লীস্বর বিজন গ্রাম-ভূমির উপর প্রহর-কীর্তন করিতেছে। বড় বকুল গাছে চাঁদের আলোয় হনুমান-দল এখনও জাগিয়া রহিয়াছে। ছানাগুলোর কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ শোনা যায়। লাফালাফির হট্টরোল ওঠে বকুল-ডালে।

এই পথে একা-একা চলা আমজাদের সাহসে কুলায় না। পীরের মাজার রহিয়াছে বকুল-তলায়। গাঁয়ের লোকেরা প্রতি জুম্মার রাত্রে মানৎ শোধ করিয়া যায়। আজ্‌দাহা সাপের পিঠে আরোহণ করিয়া দরবেশ সাহেব গভীর রাত্রে গ্রাম-ভ্রমণে বাহির হন। বড় মেহেরবান পরলোকগত এই দরবেশ, শাহ্‌ কেরমান খোরাসানী। সকলের দুঃখের পশরা তিনি একাকী বহিয়া বেড়ান। সামান্য অসুখ বিসুখে পীরের মাজার একমাত্র আশ্রয়।

কুড়ি-হাত বেড় মোটা বকুলের গুঁড়ির দিকে চোখ পলক মাত্র নিবদ্ধ করার সাহস হইল না আমজাদের।

গুঁড়ির উপরে মোটা দুইটী ডাল। তা'র মাঝখানে একটী বিরাট গহ্বর। আজ্‌দাহা সাপ দিনে এইখানে বাস করে। মাঝে মাঝে দিনে বাহির হয়। কিন্তু কাউ-কে কিছু বলে না।

কিংবদন্তীর অন্ত নাই। কত কাহিনী না দরিয়া-বিবির কাছে আমজাদ শুনিয়াছে। গা ছমছম করে তার।

জাগ্রত দরবেশ। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই মানৎ করে এই মাজারে।

টুপ্‌টাপ পাকা বকুল ফল পড়িতেছে। আমজাদ এই শব্দ চেনে। কাল খুব ভোরে বকুল কুড়াইতে আসিবে সে।

পড়ো-ভিটে সম্মুখে। বর্ষা-স্নাত ঘরের দেওয়াল এখনও খাড়া রহিয়াছে। আলো-অন্ধকারে বিজন, বেত আর বন-তুলসীর ঝোপে ভয়াবহ, প্রতিবেশীদের আবাসভূমি মহাকালের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আর সামান্য পথ। এই সুড়কটুকু শেষ হইলে দহলিজে পৌঁছাইবার রাস্তা।

আমজাদের মন আনন্দে নাচিয়া ওঠে। সাদা-কালো রেখা-সমন্বিত

তরমুজের দিকে সে বারবার চায়। মা আজ খুব খুশী হইবেন। গুমোট মনের আবহাওয়া এতক্ষণে কাটিয়া যায়।

নবমীর চাঁদ পশ্চিম গগনের সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে দিকমেখলার দিকে অবতরণ করিতেছে। আকাশের এই কোণটা সাদা মেঘের আলিঙ্গনে দিঘীর মত মনে হয়।

দহলিজের সড়কে আসিয়া আমজাদ আর পিতার পেছনে পড়িয়া থাকে না। পাশ কাটাইয়া অগ্রবর্ত্তী হইল সে। এই সব জায়গা তার মুখস্থ। বন-জুয়ানের ছোট তরুলতা কোথায় ফুটিয়া আছে, তাও সে চোখ বুঁজিয়া বলিতে পারে।

দহলিজের প্রাঙ্গণে আসিয়া আমজাদের ভয় লাগে। একটা ছায়া-মূর্ত্তি যেন সরিয়া গেল তার সম্মুখ হইতে।

বাবার কাছে কোন আভাস দিল না সে। একবার মাত্র থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার পশ্চাদ্বর্ত্তী আমজাদ।

আজহার খাঁর দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে। পুত্রের গতিবিধি সে লক্ষ্য করে নাই।

—একটু দাঁড়া, আমু। লাঙল আর বলদ দুটো নিয়ে যা দেরী।

আমজাদ তরমুজ দহলিজের দাওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাখিল। বাবাকে ভয় করে সে। নচেৎ ঘরে ঢুকিয়া মাকে অবাক করিয়া দেওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এমন সুন্দর বড় তরমুজ, কে কবে আনিয়াছে এই সংসারে ?

খড়ো দহলিজ। এক পাশে মাচাঙে বর্ষার সময় খড় তুলিয়া রাখা হয়। লাঙল-কোদাল চাষের যন্ত্রপাতি থাকে এক কোণে। কোন মেহ্‌মান আসিলে বাকী দুই কোণ দখল করে।

আজহার খাঁ লাঙল কোণে দাঁড় করাইয়া ফিরিতেছে। তাহার মনে হইল কে যেন দহলিজের কোণ হইতে পূর্বদিকে চলিয়া গেল একদম দাওয়ার পাশে।

—কে গো !

কোন জবাব আসে না, ছায়া-মূর্ত্তি অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—কে গো!

আমজাদ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিল, ভয় পায় সে। জ্বীন্ আসিয়াছে দহলিজে! মার কাছে জ্বীনের গল্পও শুনিয়াছে সে। দহলিজে কোরান শরীফ আছে একখানি। রাত্রে তাহারা নাকি কোরান মজীদ পড়িতে আসে।

আজহার খাঁ ছেলেদের নিকট এই গল্প করিলে খুব চটিয়া যায়। তারও মনে খট্‌কা লাগিয়াছিল।

জোরেই হাঁকিল সে, কে গো! দাওয়া হইতে সে প্রাঙ্গণে লাফাইয়া পড়িল পাঁচন-বাড়ি হাতে।

ছায়া-মূর্ত্তি এবার ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

আজহার আমজাদকে ডাকেঃ এখানে আয়, আমু।

— কে গো!

উলঙ্গ একটী ছোট মেয়ে। আব্ছা আলোয় আজহার চিনিল, তারই মেয়ে নঈমা।

—নমু, তুই এখানে?

কোন জবাব দিলো না সে। তার ফোঁপানি বাড়িয়া যায়।

—এত রাত্রে তুই এখানে?

আমজাদ জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথা?

দহলিজে আজহার খাঁ শোরগোল তোলে।

অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিল দরিয়া-বিবি।

— এত গোলমাল কিসের?

আজহার খাঁ স্ত্রীর সম্মুখীন হইয়া বলে, দুধের মেয়েটা এই রাত্রে অন্ধকারে—কোন খোঁজ রাখা দরকার মনে করো না?

—খুব দরকার মনে করেছে।

দরিয়া-বিবি এইবার নঈমার দিকে চড় তুলিয়া অগ্রসর হয়।

—দাঁড়া, হারামজাদি! তিন বছরের মেয়ে মুখে 'রা' নেই। কলহোন্মুখ স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইল আজহার খাঁ।

—কি হোয়েছে, খুলেই বল না।

—এত বড় ধাড়ী মেয়ে ফালি-কাপড়টা হারিয়ে এল।

আজহার জিজ্ঞাসা করে, কোন্ ফালি-কাপড়টা ?

—সেদিন যেটা গঞ্জ থেকে কিনে আন্‌লে।

—ইশ্ ! আজহার অস্ফুট শব্দ করে।

—আর এমন হাবার ঘরের হাবা, কি করে হারাল বল্‌তে পারে না।

আজহার কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে।

—তার জন্যে খুব মার মেরেছ বুঝি ?

দরিয়া-বিবি ঝঙ্কার তোলে: আমি জানি, আমার হাত জানে আর জানে ওর পিঠ।

আজহার নঈমাকে কাছে টানিয়া পিঠের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

—করেছ কি ? এত দাগ !

—মারবে না। সংসার নিয়ে আমি বুঝি অভাবের তাড়না। আর ওরা শুদ্ধ আমাকে জ্বালাবে।

আজহার খাঁর রাগ বাড়ে প্রতিবেশীদের উপর।

—এমন চোরের পাড়া। হয়ত ছোট মেয়ে সব সময় কাপড় পরে না। কোথাও ফেলেছিল, বাস্ আর কী চোর ত সব।

দরিয়া-বিবি যোগ দিল: সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। কারো মুখে 'না' ছাড়া 'হাঁ' শব্দ নেই।

—যাক্ আর উপায় কী। নঈমাকে কোলে নাও।

আজহার বাথানে বাঁধিয়া বলদ দুটীকে কয়েক আঁটি খড় দিল।

নঈমা পিতার সঙ্গ ছাড়ে না। দরিয়া-বিবি তাকে কোলে তুলিয়া লওয়া মাত্র সে ফোঁপাইয়া কান্না জুড়িল। মা মেয়ের মুখে চুম্বন করিয়া বলিল, কে ফালিটা নিল, মা ?

নঈমা কাঁদে শুধু।

—ঘরে চলো। আর দাঁড়িয়ে লাভ কী। আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি।

আমজাদ তরমুজ হাতে মার সঙ্গে চলে। এতক্ষণ সে কারো

চোখে পড়ে নাই, বড় দুঃখ তার। গর্বের আনন্দ আজ মাঠে মারা গেল।

ঘরে ঢুকিয়া আমজাদ মার সম্মুখে তরমুজ রাখিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বলিল, মা, তরমুজ।

দরিয়া-বিবির চোখে মুখে হাসির ঝিলিক খেলিয়া যায়।

—আরে আমু-চাচা, কে দিল রে এত বড় তরমুজ?

—উই মাঠের চন্দ্র-কাকা।

—বেশ পাকা তরমুজ ত। দরিয়া-বিবি আমজাদের দিকে চাহিয়া হাসে।

এতক্ষণে ভাল লাগে আমজাদের সব কিছু।

দরিয়া-বিবি নঈমাকে বলিল, ঐ ছ্যাখ, কাল তরমুজ খাবি। কয়েকটা টোকা মারিল দরিয়া-বিবি তরমুজের উপর।

—খুব পাকা নয়, বাবা। দুদিন ঘরে রাখতে হবে।

নঈমার মুখেও হাসি ফোটে।

—মা, আমি খা-আ-বো।

—হ্যাঁ, তুমিও খাবে।

পা মেলিয়া দরিয়া-বিবি মাদুরের উপর বসিয়া আমজাদকে সে তারই পাশে উপবেশন করিতে বলিল। আমজাদ মাঠের কাহিনী বর্ণনা করে মার নিকট।

—কিন্তু মাঠে এত দেরী ভাল নয়। তোমার পড়া হোলো না কিছুই। আজ একটু পড়ে নাও।

দরিয়া-বিবি মাটীর ডিপা আর করঞ্জা তেল আনিল। কেরোসিন সব সময় কেনার পয়সা থাকে না। দরিয়া-বিবি খুব ভোরে উঠিয়া করঞ্জা ফল কুড়াইয়া আনে। তা-ই কলুর ঘানি হইতে তেল হইয়া ফেরে।

—পড়ে নাও, বাবা। তোরা সকালে যাস্ খেজুর পাড়তে, বকুল কুড়োতে। চাট্টি করঞ্জা কুড়িয়ে আনতে পারিস্ না?

নঈমা বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছে সে।

—আজ মার খেয়ে পেট ভরল। আর রাত্রে খাবে, ওর যা ঘুম!

আমজাদের ভাল লাগে না এত রাত্রে পড়া। মার সামনে কোন

অভিযোগ চলে না। টিম্‌টিম্ ডিপার আলোয় সে পড়িতে বসিল। দরিয়া-বিবি গৃহস্থালীর কাজে উঠিয়া গেল।

পাড়ার আরো কয়েকজনের কাপড় চুরি গিয়াছিল। কেবল ছেলেদের কাপড়-চুরি যায়। দরিয়া-বিবির বড় লাগিয়াছে আজ। মাত্র বার গণ্ডা পয়সার জিনিষ। তার বহু পরিশ্রমের ফল, উপলব্ধি করে সে।

দরিয়া-বিবি সহজে দাগটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না।

নৈশ-ভোজনের পর আজহার গুড়ুক ফুঁকিতেছিল দাওয়ায় বসিয়া। আমজাদ একপাশে নিজের কল্পনা লইয়া ব্যস্ত। শিমুল তূলার দানা বাছাই করে দরিয়া-বিবি।

—দ্যাখো, এমন সব চোর, খালি ছেলেদের কাপড় চুরি করবে।

—আর কার কাপড় চুরি হোয়েছে?

প্রশ্ন-কর্তা আজহার।

—মতির ছেলের ধুতি, সাকেরের মেয়ের ছোট শাড়ী, আরো অনেকের।

এক রাশ ধোঁয়া ছাড়িল আজহার খাঁ।

—একদম ছোট লোক ইতরের পাড়া হোয়ে যাচ্ছে। খাঁয়েদের নাম-ইজ্জৎ আর থাকবে না।

দরিয়া-বিবি ঈষৎ ঠোঁট বাঁকায়। আজহার তা লক্ষ্য করে না।

আজহার বলিতে থাকে, হাল-ফিল যারা পয়সাওয়ালা, তাদের চাল-চলন আর বনেদী-বংশের চাল-চলন দ্যাখো।

দরিয়া-বিবি স্বামীকে আজ চটাইতে রাজী নয়। সে পাঁজ করিয়া তূলা একটী কুলোর উপর রাখিতেছিল।

—থাকবে কি করে বংশের ইজ্জত, গরীব যে সবাই।

দরিয়া-বিবি হঠাৎ যেন কথাটী ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে এমন ভাব করে মুখের।

—খালি পয়সা থাকলেই বংশের ইজ্জত থাকে না। মহেশ-ডাঙার খাঁয়েদের নাম এখনও দশ-বিশ খানা গাঁয়ে পাওয়া যায়।

—তা পাওয়া যায়।

দরিয়া-বিবি সায় দিল।

—কিন্তু পায়সা না থাক্‌লে ইজ্জতও আস্তে আস্তে সরে পড়ে। এইবার চুপ করে আজহার খাঁ।

স্বামীর আচমকা নীরবতা দরিয়া-বিবি পছন্দ করে না। কথার সূত্র সে অন্য টানা-পোড়েনের মধ্যে রাখে।

—কাপড়-চোর আমার হাতেই ধরা পড়বে দেখো।

—কত কষ্টে কাপড় কেনা, আর চোর শয়তানেরা এমন দাগাবাজি করবে।

দরিয়া-বিবি ডাকিল, আমু।

—কি মা?

—দেখো কাপড়-চোপড় হারিয়ো না, বাবা।

—না মা।

আমজাদ শিমুল-তূলার ছিন্ন অংশ বাতাসে ফুঁ দিয়া উড়াইতেছিল।

—না, মা আমার কাপড় হারায় না।

আসেক্‌জান বেলাবেলি ঘরে ঢোকে। আজ তার ব্যতিক্রম হয় নাই। কানে সে কম শোনে। মাঝে মাঝে পরের কথা সে এমনভাবে বুঝিতে পারে, মনে হয় না সে বধির। অনেকের কাছে বুড়ি তাই শেয়ান-কালা নামে পরিচিত।

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন তার কানে গিয়াছিল। ভরাসাঁঝে বিছানার আশ্রয় লইলেও বুড়ির ঘুম হয় না। চোখ বুঁজিয়া রোমন্থন-রত গাভীর মত অতীত-জীবনের জট খোলে সে। ভোর রাত্রির দিকে আসেক্‌জান কয়েক দণ্ড ঘুমায় মাত্র।

হঠাৎ আসেক্‌জান বাহিরে আসিল। দাওয়ার উপর খালাকে দেখিয়া আজহার জিজ্ঞাসা করিল —কি হোলো, খালা?

বৃদ্ধা খালার উপর আজহারের মমতা বেশী। শুধু একটা ঘর দখল করিয়া আছে, নচেৎ কি আর এমন খবরদারী করে সে। তারই সংসার অচল হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে।

— এই এলাম, বাবা। বলিয়া আসেক্‌জান দাওয়ার উপর বসিয়া

পড়িল।

তারপর কথা পাড়ে আসেক্‌জান।

—তোমাদের সংসার কি ছিল সাবেকী আমলে। না-হোলে আমার এত কষ্ট। দরিয়া-বৌ ত সংসার চালাচ্ছে, লক্ষ্মী মেয়ে।

যার উদ্দেশ্য প্রশংসা বর্ষিত হইতেছিল, সে একবার ভ্রূক্ষেপও করিল না।

—তোমাদের কষ্ট আমি নিজের চোখে দেখছি।

দরিয়া-বিবি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এইবার। স্বামী-স্ত্রী সংসার লইয়া হাজার-মন্তব্য করে। কিন্তু অপর কেউ সংসারের বে-আব্রু এলাকা লইয়া আলোচনা করুক, দরিয়া-বিবি তা আদৌ পছন্দ করে না।

আসেক্‌জানের বক্তব্য শেষ হয় নাই। সে পুনরায় বলে : আজকাল দীন-ঈমানও ঠিক নেই। দীন-দুঃখীদের দিকে কেউ চায় না!

- বৌ-মা—।

দরিয়া-বিবির জবাব সংক্ষিপ্ত : কী।

—তোমার কাপড়ের টানাটানি! দু-টো কাপড় পেয়েছিলাম।

আসেক্‌জান তারপর আঁচল-ঢাকা দু'টী কাপড় বাহির করিয়া বলিল, দু'টো কাপড় তুমি পরো। আমার যা আছে চলে যাবে।

দরিয়া-বিবির কণ্ঠস্বর চাঁচাছোলা : কোথা থেকে পেলে শুনি?

—ও-পাড়ার ইজাদ চৌধুরীর মা ইন্তেকাল করেছিল, কাল মিশ্‌কান খাওয়ালে আর কাপড় জাকাত দিলে।

—জাকাত—জাকাত। দরিয়া-বিবি হঠাৎ আগুন হইয়া উঠিয়াছে। দাঁত চাপিয়া সে আবার উচ্চারণ করিল, জাকাত!

জাকাত! আমি নেব জাকাতের কাপড়। আমার স্বামী বেঁচে নেই? ছেলে নেই? মুখে তোমার আট্‌কালো না?

লাথি দিয়া এক জোড়া কাপড় দরিয়া-বিবি দাওয়ার নীচে ফেলিয়া দিল।

আজহার হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করিতে পারে না। কাপড় দুটী দাওয়ার নীচ হইতে সে কুড়াইয়া আনিল।

—খবরদার! এমন কথা মুখে আন্‌বে না। বের করে দেব আমার ঘর থেকে। তোমার কাপড়ের মাথায় সাত পয়্‌জার।

ধর্ম্ম-ভীরু আজহার খাঁ এমন কটু-বাক্য পছন্দ করে না।

—দরিয়া-বৌ, ক্ষেপে গেলে নাকি! এ সব কী বকছো?

—চুপ করো। যারা জাকাত নেয় তারা আর মানুষ থাকে না। জানোয়ার হইনি এখনও! আল্লা আমার হাত-পা দিয়েছে। মড়ার পেটের জন্যে হাত পাত্‌বো না কোনদিন।

নিরীহ আজহার-ও বেশ চটিয়া যায়।

—কাল থেকে তা হোলে লাঙল ধরো মাঠে।

—দরকার হোলে তাও ধরব।

আজহার খাঁ চুপ করিয়া গেল। দরিয়া-বিবি সমস্ত সংসার ঠিক রাখিয়াছে। অনিপুণ গৃহিণী ঘরে থাকিলে সে সংসার ছাড়িয়া দরবেশ হইয়া যাইত এতদিন।

—তোমাকে ভাল মুখে বলছি, খালা, এ সব কথা কোনদিন মুখে এনো না। আমরাও গরীব। দু মুঠো যা' হোক করে চলে যাচ্ছে তোমার দরকার নেই? জানো না, তোমার জাকাতের চাল আমরা পয়সা দিয়ে কিনে নিই।

আসেকজান স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে পাষাণ-মূর্ত্তির মত। ধূলা-লাগা কাপড় দুটী বুকে করিয়া সে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

আমজাদের হাই উঠিতেছিল। সে ঘুমাইতে চায়।

হাতের তূলায় দ্রুত পাঁজ দিয়া দরিয়া-বিবি বলিল, ও ঘরে শুতে যাসনি। আমার কাছে শো'।

আমজাদ আর পা বাড়াইল না। আজহার খাঁ চুপচাপ বসিয়া রহিল। অকস্মাৎ দমকা ঝড় বহিয়া গিয়াছে যেন দাওয়ার উপর।

মাঝ-রাত্রে দরিয়া-বিবির ঘুম ভাঙিয়াছিল। তার পাশে আমজাদ নাই। শয্যা শূন্য। কোথায় গেল আমজাদ?

ডিপা জ্বালিয়া সে আসেকজানের ঘরে অতি সন্তর্পণে প্রবেশ

করিল। আমজাদ তার পরিচিত জায়গায় মাদুরের উপর অঘোরে ঘুমাইতেছে।

আর আসেক্‌জান উবু হইয়া বসিয়া গিয়াছে। হাঁটুর উপরে অবনত মুখ। শণের মত সাদা চুল সম্মুখে-পেছনে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ফোঁপানি শব্দ উঠিল। কাঁদিতেছে বৃদ্ধা আসেক্‌জান? দরিয়া-বিবি সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দারিদ্র্যের নারী-প্রতীক যেন ওই গৃহকোণে আশ্রয় লইয়াছে। আল্লার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জীবন। এই তার পরিণতি! দরিয়া-বিবি অস্বোয়াস্তি অনুভব করে। দারিদ্র্যের দাবানলে সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ জীবনের সমগ্র ঐশ্বর্যসম্পদ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। লোল-চর্ম্ম কোঁঠর-গত চক্ষু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মানুষের আত্মার দিকে চাহিয়া আছে মাংস-লোভী কুকুরের মত।

দারিদ্রের উলঙ্গ রূপ দরিয়া-বিবির চোখে যেন এই প্রথম ধরা দিল। সে কেন এখানে আসিয়াছে স্বর্ণপুরী হইতে নির্বাসিত রাজনন্দিনীর মত? সে কেন এখানে আসিয়াছে? পোড়া ক্ষতের জ্বালা অনুভব করে সে। তার চোখেও অশ্রুর প্লাবন নামে।

ফুৎকারে ডিপা নিভাইয়া দরিয়া-বিবি অন্ধকারে আসেক্‌জানের কাছাকাছি আসিয়া ডাকিল, খালা!

৪

গোধূলি বেলা।

উঠানে নঈমা ছাগল-ছানা লইয়া খেলা করিতেছিল। আজ বেলাবেলি আজহার মাঠ হইতে ফিরিয়াছে! অবসর সময়-টুকু এইখানে কাটে তার। বড় নিঃসঙ্গ আজহার! অন্যান্য প্রতিবেশীদের মত তাস-পাশা খেলিয়া সে সময় অপব্যয় করিতে জানে না। সাংসারিক কথাবার্তা হয় দরিয়া-বিবির সঙ্গে। যখন কোন কাজ থাকে না, এক-মনে সে গুড়ুক ফোঁকে। আমজাদ দহলিজে থাকিলে কথা বলিবার কোন ছুতা পাওয়া যায় না। নঈমার সঙ্গে বাক্যালাপের কোন বিষয় নাই।

ফুটফুটে ছাগল-ছানা। কালো মিশমিশে গায়ের উপর অস্তমিত সূর্যের লালিমা পড়িতেছে। রঙের পিণ্ড যেন সঞ্চরণ-শীল। ধাড়ী ছাগলটী খড়ের উপর শুইয়া রহিয়াছে। নঈমা তাই ব্যস্ত।

আরো চঞ্চল ছানা দুইটী। একবার মার কাছে ছুটিয়া যায়। দুধের বাঁট টানে কিয়ৎক্ষণ. তারপর ম্যা-ম্যা শব্দে প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়ায়। [illegible] ছোটে নঈমা। হয়ত সহজে ধরা দিল না। রাগে সে মার কাছে অভিযোগ করে। তখন কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। নঈমা আনমনা অন্যদিকে চাহিয়া একটী ছানার উপর জোরে হাত রাখে। ভীত চীৎকার ক্ষণিক। তারপর আদরে গলিয়া যায় ছাগ-শাবকেরা। নঈমা ছানা বুকে করিয়া গায়ের উপর নরম হাত বুলাইতে থাকে। ছাগ-মাতা ছুটিয়া আসিলে নঈমা সরিয়া যায়।

আজহার খাঁ মেয়ের লীলা-চপল ভঙ্গী দেখে। গুড়ুকের ধোঁয়ায় চোখ ফ্যাকাশে। কোন মন্তব্য তার ঠোঁটে আসে না। দরিয়া-বিবি গেরস্থালীর অন্যান্য কাজে ব্যস্ত।

একটু পরে আসিল আমজাদ। বগলে একগাদা তালপাতা। মক্তব হইতে এই-মাত্র সে ছুটী পাইয়াছে। দিনের আলো থাকা পর্যন্ত

মৌলবী সাহেব ইলেম-দানে কার্পণ্য করেন না। চপল-মতি বালকেরা এই সময় খুব কষিয়া নামতা পড়ে।

অনেকক্ষণ পূর্ব্বে আসিত আমজাদ। ছুটীর পর তাল-পাতা ধোয়া —আর এক কাজ। রোজ রোজ তালপাতার দপ্তর হারাইলে মা বড় বিরক্ত হয়। কালির দাগ সহজে ছাড়ে না। ডোবার পানী ভাল নয়। এম্নি দেরী হইয়া যায়। শুধু ভয়ে আমজাদ কোন প্রতিবাদ করে না। মক্তবে যারা কাগজে লেখে তাঁদের সঙ্গে ইদানীং নিজের তুলনা করিতে শিখিয়াছে আমজাদ।

মন বিষণ্ণ। তাই উঠানে আসিয়া সে চুপিচুপি আজহার খাঁর পাশে বসিয়া পড়িল। মার সঙ্গে কোন বাক্যালাপ হইল না। কিন্তু নঈমার খেলা দেখিয়া সে সব ভুলিয়া যায়। নিজে-ও এই খেলায় সানন্দে যোগ দিল।

এইবার ছাগ-শিশুরা ভীত। আমজাদের সঙ্গে দৌড়পাল্লায় তারা অক্ষম। ম্যা-ম্যা শব্দ করে শুধু। ভাই-বোনে উঠান মাৎ করিয়া রাখে।

বোধ হয় ফুরসৎ পাইয়াছিল দরিয়া-বিবি। সেও বাতাসে আসিয়া বসিল।

—আমু!

—কি মা? জবাব দিল আমজাদ!

—বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিস্নি, হ্যাটা হোয়ে যাবে বাচ্চা দুটো।

—না মা, আমি ত বেশী ছুঁইনি।

নঈমা প্রতিবাদ করে: মা, আমি তো খেলা কচ্ছি।

—হ্যাঁ, খেলা করো।

সন্ধ্যা নামিতেছে ধীরে ধীরে। উঠানে অন্ধকার ঘন হইয়া আসে। দরিয়া-বিবি চুল মেলিয়া দিল বাতাসে। সারাদিনের ক্লান্তি ঘামে আর পরিশ্রমে। হাওয়া লাগুক একটু গায়ে।

উঠানে অন্ধকার। নঈমা ও আমজাদের মাহেন্দ্রক্ষণ। এখন ইচ্ছা মত বক্রী ছানাকে আদর করা চলে। যতই জোরে পিঠে দমক্ দাও না কেন, মার চোখে পড়িবে না কিছু-ই। কিন্তু ছানাগুলো যা, বজ্জাত,

আদরের নামে একটু জোরে কোথাও টিপ দিলে বড় ম্যা-ম্যা শব্দ করে। ধমক দিতে বিলম্ব হয় না।

দরিয়া-বিবি বলে, আরে বাবা চৌদ্দপুরুষ, একটু আস্তে ছুটোছুটি কর।

—মা, ভারী ডরুক ছানা দুটো। কাছে গেলেই ম্যা-ম্যা।

ছাগলের ডাক অনুকরণ করিতে লাগিল আমজাদ। অন্ধকারে আজহার খাঁ নীরবে হাসে। তার অস্তিত্ব সবাই বিস্মৃত হইয়াছে। ঘরের দাওয়ায় ডিপা জ্বলিতেছিল। অস্পষ্ট আলো উঠানে সামান্য পৌঁছায়। ছায়া-মূর্ত্তির উপনিবেশ। কেউ কারো মুখ দেখিতে পায় না।

উঠানের নীচে আগাছার বন। খুব ঘন নয়। প্রতিবেশীদের কলা-গাছের ঝাড়, তারপর কয়েক-কাঠা জুড়িয়া। আজহার খাঁ সামান্য সরু পথ পৈঠার সাহায্যে অতিক্রম করে। এই দিকে বিশেষ কোন কাজ থাকে না। বর্ষার দিনে কতগুলি ডোবায় রাত্রে মাছ ধরিতে যাওয়ার খুব সুবিধা। সেই জন্য পথটুকু।

ছাগল-ছানারা শ্রান্ত। যা' দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। দরিয়া-বিবি চুপচাপ বসিয়াছিল। আজহার খাঁ নিজেই ডিপা হইতে কয়লা ধরাইয়া আনিল। সে ফরমাশ-করা ভুলিয়া গিয়াছে নাকি? হাসে দারিয়া-বিবি অন্ধকারে।

পরক্ষণে বড় বিরক্তি লাগে তার ছেলেদের হল্লা।

—এই চুপ কর্ তোরা।

আমজাদের কোলে একটা ছাগল ছানা চীৎকার করিতেছিল। ভয়ে সে বাচ্চা মাটীর উপর ফেলিয়া দিল। নূতন প্রাণ পায় ছাগ-শাবক, মার কাছে এক দৌড়ে ছুটিয়া গেল।

দরিয়া-বিবির পাশে ভাই-বোন শান্ত হইয়া বসে। অন্ধকার থমথম্ করে।

মা কোন কথা বলে না, আমজাদ আরো ভয় পায়। ক্ষুণ্ণ-স্বরে সে ডাকে, মা।

—কি?

মার কোলে মাথা রাখিয়া সে উঠানে পা ছড়াইয়া দিল। জবাব দেওয়ার কিছু-ই ছিল না। আমজাদ চুপ করিয়া থাকে।

উঠানে নিঃস্তব্ধতা।

পাঁচ মিনিট পরে দরিয়া-বিবি আমজাদ-কে প্রশ্ন করে, ঘুম পায় নি ত?

—না, মা।

—তোর আব্বা-কে ডেকে দেখ্‌ত, জেগে আছে? ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠে কথা বলে সে।

—আব্বা! আমজাদ হাঁকে।

—কি আব্বা?

—জেগে আছো তুমি?

—হ্যাঁ।

দরিয়া-বিবি পিতা-পুত্রের সংলাপ শোনে।

আর একবার জিজ্ঞেস কর, শিমুলে গিয়াছিল বিকেলে? শিমুলিয়া গ্রামের নাম।

—আব্বা, তুমি শিমুলে গিয়েছিলে বিকেল-বেলা?

জবাব দিল আজহার খাঁ, না।

এইবার দরিয়া-বিবি সোজাসুজি স্বামীর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল।

—বাচ্চা দুটোর যা হয় করো। পাঁটা না হোয়ে যায়। খুন্‌কারদের ডেকে এনো।

—পাঁটা হবে কেন, ভারী-তেজী বাচ্চা।

—খবরদার বেচে ফেলো না যেন মাঠ থেকে। দু-জন ব্যাপারী তোমার খোঁজ করছিল।

—না।

আজহার খাঁর কণ্ঠস্বর উত্তাপহীন। তামাকের নেশায় ঝিমোয় সে।

নঈমা ঘুমে ঢুলিতেছিল, দরিয়া-বিবির লক্ষ্য পড়িল তার উপর। ছাগল-ছানা দুটী উঠানে দৌড়াদৌড়ি করে। আমজাদের লোভ হয়, মার ভয়ে সে চোরা-চাউনী ছোঁড়ে। আর একটু খেলতে পেতাম, মা

ভারী বজ্জাত। ঠোঁট বাঁকায় আমজাদ।

উঠানের কিনারায় ছানা-দুটী কয়েকবার থম্‌কিয়া দাঁড়ায়। কেউ লক্ষ্য করে না।

একটু পরে হঠাৎ একটি লাল জন্তুর ছায়া পড়ে। এই সময় ম্যা শব্দে সকলে চমকিত হইয়া উঠিল।

হতভম্ব হইয়া আজহার চীৎকার দিতে থাকে, শেয়াল, শেয়াল। আ—তু-আ—তু।

কুকুর ডাকে সে প্রাণপণে। একটী ছানা ধাড়ীর কোলে ফিরিয়া আসিল।

পলকে কি ঘটিয়া গেল, দরিয়া-বিবি সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। পাড়ার দুটী কুকুর ছুটিয়া আসিল। কয়েক বার মাটী শোঁকার পর তারাও উঠানের নিম্নবর্ত্তী জঙ্গলে উধাও হইয়া গেল।

—শেয়ালে নিয়ে গেল ছানাটা? দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসা করে।

—লাঠি দাও, আমি পুকুর-পাড় দেখে আসি।

উঠানে বাঁশের টুকরা পড়িয়াছিল। আজহার অন্ধকারে আড়াল হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ মাত্র। ডিপার আলোয় দরিয়া-বিবি বার বার দেখিতে লাগিল। নঈমা আমজাদ তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বড় বিরক্ত হয় দরিয়া-বিবি: সরে যা। হাঁ করে কি দেখ্‌ছিস সব!

তারপর মা খেদোক্তি আরম্ভ করে। শিয়ালের বংশ উদ্ধার হয় গালি-গালাজে। ধাড়ীর পাশে যে ছানাটী ফিরিয়া গিয়াছে, সে-টা কৃশ। আরো আফ্‌শোস্‌ করে দরিয়া-বিবি। ভাল খাসী-ছানাটাই মড়ার শেয়ালের চোখে পড়ল।

আজহার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, পাতি-পাতি করে খুঁজেছি। ছোট ছানা। মুখে করে দৌড় মেরেছে শেয়াল।

—এত কষ্টই সার হোল। আর বছর চার-পাঁচ টাকার মাল হোতো। খামখা গতরের মেহ্‌নত।

নঈমা কান্না জুড়িয়া দিল।

দরিয়া-বিবি তার দিকে আদৌ ফিরিয়া চাহিল না।

—ছেলেগুলোই বদ। রোজ বিকেল-বিকেল তুলে দিই। আজ ভাবলাম ছেলেরা খেলা করছে, থাক এখন।

আরো কাল্পনিক সম্ভাবনার কাহিনী আওড়ায় দরিয়া-বিবি। শ্রান্ত আজহার ধোঁয়া-সেবনে বসিয়া পড়িল পুনরায়।

ছোট ছাগল-শিশু। তবু কারো মনে আনন্দ নাই এই পরিবারে।

নৈশ-আহারে আরো বিলম্ব হইল। দরিয়া-বিবির মেজাজ বড় কড়া। আমজাদ পর্যন্ত খাওয়ার কথা উত্থাপন করিতে ভয় পাইল। নঈমার কপালে রাত্রে ভাত জোটে না প্রায়-ই। আজও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

ছাগ-মাতা উঠানে চীৎকার শুরু করিয়াছে।

দরিয়া-বিবি খড় খাওয়াইতে লাগিল ছাগলটীকে। অনেকক্ষণ আন্‌মনা কাটিয়া যায়। দরিয়া-বিবির মুখ গম্ভীর। চোখের পাতায় ঢাকা অবনত চোখ দৃষ্টির অগোচরে।

আমজাদ মার কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। বক্তব্য মুখ হইতে বাহির হয় না। সে-সাহস নাই তার। হাই তুলিয়া সে করুণ চোখে মার দিকে চাহিয়া রহিল।

—তোর ঘুম পেয়েছে? চল্ ভাত দিই।

আজহার খা এই সুযোগে সান্ত্বনা দিলঃ আল্লার কাছে শোকর, দুটো নিয়ে যায়নি।

দরিয়া-বিবি ব্যঙ্গস্বরে বলে, ওই মুখে ফুল-চন্দন দিতে ইচ্ছে করে!

দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল আজহার খাঁ। কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করিল না।

অপর ছানাটীর গায়ে দরিয়া-বিবি হাত বুলাইতে লাগিল। কল্পনা রঙীন হইয়া উঠিল তার।

এমন আন্‌মনা বসিয়া-থাকা দুঃখ-উপশমের ভাল পথ। শুধু আমজাদের জন্য দরিয়া-বিবি ছাগল ও ছানা লইয়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

রাত্রে ঘুম আসে না দরিয়া-বিবির। সারাদিনের ক্লান্তি, তবু চোখে ঘুম নাই এক-ফোঁটা। আজহার খুব অল্প সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

শৃগাল-ভুক্ত ছাগল-ছানার কথা দরিয়া-বিবি সহজে ভুলিতে পারে না। হারাম হইয়া গেল এত মেহনতের ফল! একটা বক্না গরু দু'বছর টানা হইতেছে। তার বাছুরের সঙ্গে কোন দেখা নাই। কোন-দিন মাঠ হইতে চুরি হইয়া গেলেই বা কি—কোনো চারা আছে তার? আরও আশঙ্কার জাল দরিয়া-বিবি নিজেই বোনে। লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত সংসার, সে-ও ভাল ছিল। দুঃখের অকূল পাথারে নিমজ্জনের আনন্দ দরিয়া-বিবি এই মুহূর্তে অনুভব করে। ঘুমের ঘোরে নঈমা হাত পা ছুঁড়িতেছে। বাম-হাতের কনুই মায়ের বুকের উপর পড়ে। অন্যদিন হইলে সাদরে ধীরে ধীরে সে হাত সরাইয়া দিত। আজ দরিয়া-বিবি জোরে কচি কনুই ও-পাশ করিয়া দিল। কারো প্রতি কোন দয়া নাই তার। জানোয়ারের মত ঘুমাইতেছে আজহার। স্বামীর বিছানার আর এক প্রান্তে সরিয়া আসিয়াছে দরিয়া-বিবি। আনমনা সে নঈমার কনুইয়ে আবার হাত বুলাইতে থাকে। মেয়ের ঘুম ভাঙে না।

আমজাদ আসেক্‌জানের কাছে চলিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বড় হয় না কেন গরীবের ছেলেরা? সংসারের দুঃখ ঘুচিবে সত্বর। আমজাদের মক্তবের পড়া কবে যে শেষ হইবে! শেষ হইলেও ভাবনার দায় হইতে রেহাই নাই। কাছে কোন স্কুল নাই। চার মাইল হাঁটিয়া এই দুখের বাচ্চারা ইলেম অর্জন করিবে? নঈমা বড় বাড়ন-সার। গরীবের মেয়ের পক্ষে যা' বিপজ্জনক। বিবাহের বয়সের আগেই আবার বিবাহের হাঙ্গামা। দরিয়া-বিবি বিভীষিকার পুতুল ভাঙে আর গড়ে।

বাইরে আদিগন্ত অন্ধকারের নৈরাজ্য।

দরিয়া-বিবি একবার বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। আমজাদ ঠিক-মত ঘুমাইতেছে কী? আলস্য বশ্যতা মানে না। আবার শুইয়া পড়িল দরিয়া-বিবি।

স্মৃতির রোমন্থন—আর কোন সান্ত্বনার প্রলাপ নাই অন্ধকারে।

হঠাৎ প্রথম স্বামীর কথা মনে পড়িল দরিয়া-বিবির। শুধু কী প্রথম স্বামীর কথা? মোনাদির—মোনাদির-কে সে ভুলিয়া গিয়াছে? মোনাদির হোসেন খাঁ। স্বামী পুত্রের বড় লম্বা-চওড়া নাম রাখিয়াছিল। আকিকার সময় দরিয়া-বিবি এই নাম পছন্দ করে নাই। তবু শেষ পর্যন্ত নামটা বড় ভাল লাগিয়াছিল।

দরিয়া-বিবির দীর্ঘচোখে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু জমিতে থাকে। মোনাদির চাচার আশ্রয়ে এখনও কি সাদরে প্রতিপালিত হইতেছে? নিজের সন্তান, তবু এতটুকু অধিকার রহিল না তার!

সঙ্গতিপন্ন কৃষকের পুত্রবধূ। তিনখানা লাঙল চলে। লাখেরাজ জমি অল্প ছিল না। ভাতের অভাব পরিবারে উপলব্ধি করা কারো পক্ষে মুশ্‌কিল। একান্নবর্ত্তী সংসারে কাজ সব সময় লাগিয়া থাকিত। সারাদিন পরিশ্রমের পর তবু সেখানে বিশ্রামের আনন্দ ছিল। জোওয়ান স্বামীর মুখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে দরিয়া-বিবির সম্মুখে। সংসার-রচনার কত কল্পনাই না জমা হইয়াছিল বুকে। বর্তমানে ভবিষ্যৎ শুধু অন্ধকার ছাড়া কিছু চেনে না।

—তোমার কোন কষ্ট নেই ত, দরিয়া?

—না।

—চাষিবাসীর সংসারে ঝঞ্ঝাট বেশী।

—তা থাক।

—খোকাটা বড় ঘুমায় ত, দরিয়া।

—কাঁদে ভুক পেলে। ঘুমায় ত, বাপের মত। মাথা কুটলেও সাড়া থাকে না!

অন্ধকারে হাসির ঝঞ্ঝনা বাজিয়াছিল সেদিন।

—বড় হোক ছেলেকে আমি শহরে পাঠাব লেখা-পড়া শিখতে। মানুষ হোক, আর কিছু চাইনে। আল্লার কাছে দিন-রাত দোয়া মাগি।

—শহরে কত খরচ!

—তা হোক। এখানে বাজে-খরচা সব কমিয়ে দেব। তিন বছরের

শিশুকে লইয়া এত কল্পনা।

—ভাবীদের সঙ্গে তোমার বনে না এই যা’ মুশ্‌কিল।

—ওরা বড় ছোট-মন। সারাদিন কত কাজ করি, তবু মার কাছে গিয়ে লাগাবে, তোমার বউ পটের বিবি হয়ে শুয়ে থাকে।

—বলুক। তা নিয়ে ঝগড়া ভাল নয়।

স্বামীর কণ্ঠ অন্ধকারে এখন-ও বাজে। সে-ই শেষ রাত্রি। পরদিন সে গঞ্জে গিয়াছিল। পথে সর্প-দংশন। বাড়ী পৌঁছাইবার পূর্বেই গ্রামের হাটতলায় তার শেষ নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল। প্রাণবান স্বামীর মৃত্যু কোন বজ্রাঘাত সূচনা করে নাই। মোনাদির বক্ষে ছিল বলিয়া সব সহ্য করিতে শিখিয়াছিল দরিয়া-বিবি। শ্বশুর তখন-ও জীবিত, তাঁর স্নেহ-মমতার আশীষ ছিল সান্ত্বনার আর এক দিক। বৃদ্ধ জবেদ হোসেন মোনাদির-কে মাটীতে নামাইতে দিতেন না। মৃতপুত্রের শোকাগ্নি নিবারণের শেষ উপায়। কিন্তু তিনি-ও এক ভুল করিয়া গিয়াছিলেন জীবনে। তারই প্রায়শ্চিত্ত দরিয়া-বিবি এখনও বহন করিতেছে। শাশুড়ী জীবিত থাকিলে কোন বিপত্তি দেখা দিত না। দুই মাসের মধ্যে তিনি-ও জবেদ হোসেনের পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। এক বছর পরে রুক্ষ শক্ত ভূমিতে দাঁড়াইতে হইয়াছিল দরিয়া-বিবি-কে। যৌথ-সম্পত্তি বণ্টন হইতেছে ভাইয়ে-ভাইয়ে। কিন্তু এক কানা-কড়ির-ও অধিকার নাই তার। স্বামী পিতার কোলে ইন্তেকাল করিয়াছেন। শরিয়ৎ-মত শ্বশুরের সম্পত্তির উপর তার বা মোনাদিরের কোন অধিকার নাই। স্বামীর অন্যান্য ভ্রাতাদের নিকট দরিয়া-বিবি শেষ আবেদন জানাইয়াছিল, মোনাদিরের ভরণ পোষণ কিরূপে নির্বাহ হইবে। কর্ণপাত করে নাই তারা। দরিয়া-বিবি মরহুম শ্বশুরের অজ্ঞতার উপর হাজার লানৎ বর্ষণ করিয়াছিল। তিনি জীবিত-অবস্থায় এই বণ্টন-ব্যবস্থা করিয়া গেলে পথের ভিখারিণী হইত না সে।

তার কয়েক দিন পরেই দরিয়া-বিবি স্বামীর ভিটা পরিত্যাগ করিয়াছিল। দাসী-বৃত্তির জীবন তার জন্য নয়। অন্যান্য ভাশুর এবং দেবরেরা তখন চণ্ডালের মত ব্যবহার করিয়াছিল। মোনাদির-কে তাহারা জোর করিয়া

ছিনাইয়া লইল। সেদিনের মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দরিয়া-বিবির চোখে অগ্নি-সহ বিদ্যুতের মত খেলিয়া বেড়ায়। সারা দুপুর তুমুল কলহের পর সে এক বস্ত্রেই পুত্রসহ স্বামীর ভিটা পরিত্যাগে প্রস্তুত ছিল। পাল্কীর কোন প্রয়োজন নাই তার। খাট যার ভাঙিয়াছে, ভূমিশয্যা ছাড়া তার আর কী গত্যন্তর আছে ?

মোনাদির-কে কোলে করিয়া সে পথে নামিয়াছিল।

একজন দেবর এই সময় ছুটিয়া আসে, "ভাবী—ভালো হচ্ছে না! আমাদের বংশের ইজ্জত নষ্ট করছ তুমি।"

—ইজ্জত? যাদের বিচার নেই, তাদের আবার ইজ্জত ?

—তুমি এখানে থাকো, কে তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে ?

—এমন করে আমার থাকার দরকার? তোমাদের বিবিজানদের বাঁদী হোয়ে থাক্‌বার কোন দরকার নেই। না খেয়ে দিন কাটবে ?

—তোমার খাওয়ার অভাব হবে না।

—পরের হাত তোলা খাওয়ার দরকার নেই আমার। রাস্তা ছাড়ো। আমার সম্পত্তি আছে ?

—কোরান কেতাবে যা হুকুম আছে, সেই মত কাজ করছি, আমাদের দোষ দাও কেন? বাপের কোলে বেটা মর্‌লে তার ওয়ারীশানদের কোন দাবী দাওয়া থাকে না।

—ও সব হাদিস কালাম আমার কাছে শোনাতে এসো না মানুষকে পথের ভিখেরী কর্‌তে আল্লা বলে দিয়েছেন ?

আরো কথা কাটাকাটি।

—তবে, ছেলে দিয়ে যাও।

—তোমাদের চাকরের অভাব আছে বোধ হয়।

—বড় ভাবীর ছেলে পুলে নেই সে মানুষ করবে।

—অত ছোট ছেলে ত চাকরের কাজে অক্ষম। তা মানুষ করতে হবে বৈকি!

তারই চোখের সাম্‌নে মোনাদির-কে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল। দরিয়া-বিবি আর মুখ পশ্চাতে ফিরায় নাই। অতীতের সমস্ত সম্বন্ধ

চুরমার হইয়া যাক। যেন কোন ক্ষোভ নাই তার।

—বংশের ইজ্জত। আপ্ত রমণীর মত দরিয়া-বিবি সেদিন গর্জ্জন করিয়াছিল।

ইহাদের মুখে চূণ-কালি দেওয়ার আর কোন পথ সে অনাবিষ্কৃত রাখিবে না। পাঁচ মাস পরে বিপত্নীক আজহার খাঁকে নেকাহ্ করিল দরিয়া-বিবি।

চোখ বুঁজিয়া নিস্তার নাই। দরিয়া-বিবির সম্মুখে অতীতের বিষধর ফণা-চক্র দোলাইয়া ভ্রূকুটী ছড়াইয়া যায়। কত মুখ ভাসিয়া আসে… জবেদ হোসেন…আহাদ হোসেন…মোনাদির।…মোনাদিরের কপালে একটা কালো দাগ ছিল জন্মাবধি। গৌর চেহ্‌রায় ভ্রূর উপরে গোল দাগ…চুম্বনে চুম্বনে মুছিয়া গিয়াছে কী দাগ? এখনও শ্মশান পাহারায় রত চণ্ডালের দল। অট্টহাস্যের মত অন্ধকারে ঝন্‌ঝনা বাজিয়া যায়।

নঈমার কচি মুখের উপর দরিয়া-বিবি তার অশ্রু-সিক্ত ঠোঁট চাপিয়া ধরিল। জ্বালা ধরে দুই চোখে। নিরবচ্ছিন্ন বিস্মরণ-পিপাসু পীড়িত হৃদয়…কোন মমতাময়ী শিয়রে জাগিয়া দাঁড়াক একবার। দরিয়া-বিবি তারই প্রতীক্ষা করে।…

৮

কয়েকদিন পরে দরিয়া-বিবি আসেক্‌জানের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল বুড়ি চুপচাপ বসিয়া আছে, জাকাতে পাওয়া কাপড় দুইটী নাড়াচাড়া করিতেছে। নিঃশব্দে আসিয়াছিল দরিয়া-বিবি। বুড়ি কিছুই টের পাইল না।

'খালা' ডাক শুনিয়া সে নিজের আঁচলের ভেতর কাপড় দুটী ত্রস্ত তুলিয়া লইল, যেন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে।

কোন জবাব দেওয়ার পূর্বেই দরিয়া-বিবি বলিল, খালা, রাগ করো না। একটা কাপড় আমাকে দাও। পরে দাম দিয়ে দেব।

বৃদ্ধাকে নিছক সন্তুষ্ট করিবার পন্থা মাত্র। দরিয়া-বিবি নিজেও জানে, ছয় মাসের পূর্বে আর সে দাম চুকাইয়া দিতে সক্ষম হইবে না।

ফোগ্‌লা দাঁতে হাসি ফোটে। আসেক্‌জান শশব্যস্ত কাপড় দুটী বাহির করিল।

—যেটা ভাল, সেটা বেছে নাও, মা। দেখো দিকি কোন্‌টার জমিন্ বেশ ভাল।

মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল দরিয়া-বিবি।

—খালা, তোমার শরীর ভাল ত ?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আসেক্‌জান।

—না, মা। দু-দিন থেকে বড় মাথা ধরেছে। চোখ ধোঁয়া-ধোঁয়া।

অনুতপ্ত হয় দরিয়া-বিবি। ইহা তাহারই নিষ্ঠুরতার পরিণতি, তা উপলব্ধি করিয়া বড় ব্যথিত হয়।

—তুমি বাইরে চলো, ঠাণ্ডা পানীতে মাথাটা ধুইয়ে দিই। আজ আর কোথাও বেরিয়ো না।

—ওপাড়ায় দাওয়াৎ ছিল। দুপুরে যাব কষ্ট করে।

—কিসের দাওয়াৎ !

—জলীল শেখের ওখানে। আজ ওর ছেলের চাল্লিশে কি না।

দরিয়া-বিবি জানে, জলীল শেখের রোজগারী জওয়ান ছেলে কিছুদিন আগে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ইন্তেকাল করিয়াছে। তার মুখটী মনে পড়িয়া গেল দরিয়া-বিবির। বলিল, আহা!

—অনেক লোক খাওয়াবে। আমজাদকে সঙ্গে নিয়ে যাব?

কে যেন বিছুটী চালায় দরিয়া-বিবির সর্ব্বাঙ্গে।

আজ কিন্তু ক্রোধের কোন চিহ্ন নাই তার মুখে।

শান্ত কণ্ঠেই সে বলে, না খালা, তার গিয়ে কাজ নেই। তুমিও আজ কোথাও যেয়ো না। এখানেই খাবে।

আসেক্‌জান প্রায়ই গাঁ হইতে এইরূপ দাওয়াৎ পায়। ধনীদের বাড়ীতে চব্য-চুষ্যের বহু আয়োজন হয়। আসেক্‌জান শুধু নিজের উদর পূর্ত্তি করিয়া আসে না। অনেক সময় নানা খাবার সঙ্গে আনে। অন্ধকার ঘরে তার অংশ গ্রহণ করে আমজাদ অথবা নঈমা। দরিয়া-বিবির চোখে কয়েকবার ধরা পড়িয়াছে তারা। আসেক্‌জানও তার জন্য তিরস্কার ভোগ করে।

পরলোকগত ব্যক্তির চাল্লিশার খাবার সঙ্গে করিয়া আনিতে আসেক্‌জানের কোন দ্বিধা নাই। দরিয়া-বিবি ছেলেদের অমঙ্গল চারিদিকে যেন দেখিতে পায়। খুব সাবধানী সে। আজ ঝগড়ার কোন সূত্রপাত দেখা গেল না।

দরিয়া-বিবি শুধু অনুরোধ করিল মাত্র, আজ কোথাও যেয়ো না, খালা।

জলীল শেখ পাটের ব্যাপারী নৌকা আছে তিন-চার খানা। বেশ অবস্থাপন্ন ঘর। সেখানের আয়োজন কল্পনাই করা চলে। আসেক্‌জানের লোভ হয় খুব। কিন্তু দরিয়াকে সে ভয় করে। চুপ করিয়া গেল সহজে। তার কল্পনা-নেত্র কিন্তু তারপর তৃষিত হইয়া উঠিতেছিল।

কাপড় দুটী দরিয়া-বিবি আধ অন্ধকারে বার বার তুলনা করিয়া বলিল, এই লাল সরু পাড়টা নিলাম, খালা।

—বেশ, বেশ! আমার কি আর এসবে মানায় মা! সাদা কাফন

পরে কবরে যেতে পারলেই ভাল।

—বাজে কথা কেন মুখে। এই সকালে আর কোন কথা মুখে আসে না বুঝি। চলো বাইরে। মাথাটা ধুইয়ে দিই।

দুইজনে দাওয়ায় আসিয়া পৌছিল।

দরিয়া-বিবি এক বদ্‌না পানী লইয়া বৃদ্ধার শনের মত সাদা চুলের উপর ঢালিতে লাগিল।

— চুপ্‌চাপ বসো। আরো তিন চার বদ্‌না ঢালতে হবে।

—বস্‌ছি, মা। একটু তেল দিয়ে দিস, বউ।

দরিয়া-বিবি চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া বদ্‌নার নল দিয়া ধীরে ধীরে পানী চোঁয়াইতে ব্যস্ত।

আসেক্‌জানের শরীর ভারমুক্ত হইতেছে। আহ্‌ শব্দে তার আনন্দ ধরা পড়ে।

নারিকেল তেল আনিল দরিয়া-বিবি। চুলের গুছির ভেতর বেশ চুক্‌চুকে করিয়া দিতে লাগিল।

—খালা, দশ ঝঞ্ঝাটে শরীরটা জ্বলে গেল। মেজাজ ঠিক থাকে? কখন যে কা'উকে কি বলি—হদিস থাকে না।

—মা, জান্‌টা আসান হোলো। অল্লার দোয়া লাগুক তোমার শরীরে।

তেল দেওয়ার অজুহাতে দরিয়া-বিবি আসেক্‌জানের মাথাও টিপিয়া দিল খানিক-ক্ষণ। কোরা কাপড় খানা একটী চটীর উপর পড়িয়াছিল। দরিয়া-বিবির চোখ সেদিকে বার বার আকৃষ্ট হইতেছিল।

— রান্না চড়িয়েছ বউ?

— সে আর বাকী আছে, মা? আমুর পেট খারাপ। আজ পান্তা খেতে দিইনি। মক্তব থেকে এসে একেবারে ভাত খাবে।

এমন সময় আমজাদের গলা শোনা গেল। ভিটের নীচে হইতে সে চীৎকার করিতেছে, মা—মা—।

দরিয়া-বিবি উৎকর্ণ হয়। না, এক পা বাড়ানোর পূর্ব্বেই স্বয়ং আমজাদকে উঠানে দেখা গেল।

—মা—

এক হাত উঁচু করিয়া সে আবার চীৎকার করে, মা!

দরিয়া-বিবির চোখে সূর্যের আলো পড়িয়াছিল। পুত্রের সর্ব্বশরীর চোখে পড়ে না।

—বাড়ীটা যে মাথায় তুলে চেঁচাস। কি—

—এই দেখো।

হাত তুলিয়া আমজাদ ধেই ধেই নৃত্য করে।

নিকটে পৌঁছান মাত্র দরিয়া-বিবি দেখিতে পায়, আমজাদের হাতে দশ-বারোটা বড় চিংড়ি মাছ। দাড়াগুলি তার মুঠার মধ্যে। লাল সরু সুঁড় রৌদ্রে চক্‌মক করিতেছে।

দরিয়া-বিবির ঠোঁটেও হাসি উপ্‌ছিয়া পড়ে।

—কোথা পেলে, বাপ?

—বল্‌ছি। বলিয়া আমজাদ এক লাফে দাওয়ার উপর উঠিল।

—মাঠের চন্দ্র-কাকা দিয়েছে। আমাদের মক্তবে গিয়েছিল। মৌলবী সাহেব তাই ত ছুটী দিলে।

—বেশ বড় চিংড়ি রে!

একটা ডাগর চিংড়ি বাহির করিয়া আমজাদ বলিল, এইটা আমার। যা লাল মগজ আছে ভেতরে!

দরিয়া-বিবির আনন্দ আর ধরে না। কচি শিশুদের মুখে খুব কম দিন-ই ভাল ব্যঞ্জন জোটে।

—খালা, আজ তোমারও ভালই হোল। ভাবছিলাম, খাওয়ার কষ্ট হবে।

আসেক্‌জান এতক্ষণ নির্ব্বিকার ছিল।

—কি বৌমা?

—আমু চিংড়ি মাছ এনেছে। দুপুরে খাওয়াটা ভাল-ই হবে। মাঠের কোটালরা দিয়েছে।

আমজাদ মার হাতে মাছগুলি সোপরদ্দ করিয়া বলে, তাড়াতাড়ি পান আর চুন দাও, কাকা দহলিজে বসে আছে।

—তবে এতক্ষণ বলিস্‌নি! দরিয়া-বিবি তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে

অগ্রসর হয়।

অন্যদিকে আসেক্‌জান আমুর সঙ্গে তখন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করে।

—নিয়ে যা, বাবা। তোর কাকা তামাক খায় ?

—আরে বাব্বা—তামাক খায় না ? তামাক ক্ষেত খেয়ে ফেলে।

দরিয়া-বিবি আবার তামাক সংগ্রহে ছুট দিল।

দলহিজে একটী বিড়ার উপর চন্দ্র কোটাল বসিয়াছিল। হাতের কামাই নাই। গোটা পান, চুন, সুপারী দিয়াছিল দরিয়া-বিবি। তাহাই সে সাজিয়া লইতেছিল্।

চন্দ্র কোটাল একটি খাটো ধুতি পরিয়াছিল মাত্র। কোমরে কাস্তে গোঁজা রহিয়াছে। পান-সাজার সঙ্গে-সঙ্গে সে মুখ খুলিল।

— তোমার বাপ কোথা, চাচা ?

—আজ তো কোথাও যায়নি। গাঁয়ে-ই আছে। বোধ হয় পাড়ার দিকে গেছে।

—দেখা করতে এলাম। কথা ছিল।

—একটু বসো না, কাকা।

চন্দ্র কোটাল চারিদিকে তাকাইল। আরো কয়েকবার সে খাঁ-পাড়ায় আসিয়াছে। বর্ষাকালে নদীর ধার হইতেই মাছ বিক্রয় হইয়া যায়। কালে-ভদ্রে পাড়ায় আসিতে হয়।

নূতন লোক-দেখা মেয়েদের সাধারণ কৌতুহল। দহলিজের খিড়কির দিকে ঘোমটার আবছায়া দেখিয়া চন্দ্র ঠিক অনুমান করিয়াছিল, আমজাদের মা আসিয়াছে।

মুখে পান গুঁজিয়া জোর গলায় বলে, চাচা, তোমার মা দুপুর বেলা খাওয়াবে ?

আমজাদ বাড়ীর ভিতর চলিয়া যাইতেছিল। দহলিজের পেছনেই দরিয়া-বিবি দাঁড়াইয়াছিল, হাত-ইশারায় পুত্র-কে আহ্বান করিল।

আমজাদ মার কাছে দাঁড়াইয়া জোর-গলায় বলে, গরীব মানুষ, ডাল-ভাত আছে।

চন্দ্র হাসে। আরো জোর গলায় বলিল, আমরা রোজ ঘোড়ার

মাথা খাই। ডাল-ভাত হোলে চলবে না। রোজ রোজ্ অশ্ব-মেদ জগ্‌গি করে চন্দ্র কোটাল।

তারপর প্রাণ-মাতানো হাসি। সমস্ত-দহলিজ গুঞ্জরিত হয়।

—চাচা, খাওয়ার আগে তোমার মা-কে তামাক দিতে বলো। নেশা চটে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে কল্কে আনিয়া দিল আমজাদ। কাঠ-কয়লায় বোঝাই। আমজাদের কচি হাতে উত্তাপ লাগে।

—শীগ্‌গির আমার হাতে দাও!

চন্দ্র দুই তালুর মাঝখানে কল্কে চাপিয়া তারপর দম দিতে থাকে। দুই চক্ষু বুজিয়া আসে নেশায়।

আমজাদ বিস্ময়ে এই লোকটির দিকে বার বার চায়। অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিতে হয়।

একটু পরে চক্ষু খুলিল কোটাল।

দহলিজের সম্মুখে দুটী নিম গাছ বাতাসে দুলিতেছিল। একটী চারা তালগাছ কোটালের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ছোট ছোট কচি মোচা বাহির হইয়াছে গাছটির।

কল্কে দাওয়ার উপর রাখিয়া চন্দ্র কহিল, চাচা, তালগাছটা তোমাদের?

আমজাদ মাথা দোলায়।

আহ্, খাসা মোচা বেরিয়েছে। বাঁশগাছ আছে তোমাদের?

—কত আছে। দুটো ঝাড়ে পঞ্চাশখানা বাঁশ, সেদিন বাপ্ গুণেছিল।

—তা হোলো বটে—তোমার বাপ বে-রসিক। কি মিঠে তাড়ি হয় এই গাছের চাচা। বাঁশ লাগিয়ে আগ-ডালে উঠে ভাঁড় বাঁধতে যা' মজা। কিন্তু তোমার বাপ—হতাশ্ হইয়া চন্দ্র মাথা দোলাইল।

—আমাদের যে তাড়ি খেতে নেই।

গোঁপে তাও দিয়া চন্দ্র ঠোঁটে 'হো' শব্দ করে।

—বড় হোলে খেতে আছে, বাবা। তোমার বাবা একটা আস্ত—

আমজাদ প্রতিবাদ করিল না।

আর একবার কল্কে তুলিয়া লইল চন্দ্র। তারপর এলোপাথাড়ি টান। আমজাদের চোখে ধোঁয়া লাগে। বিরক্ত হইয়া সে চোখ বুঁজিল।

—তোমার বাবা—

এইবার চোখ খুলিল আমজাদ।

—তোমার বাবা, আজ আর আসবে না।

বিশ্বাস হয় না আমজাদের।

শিশু-সুলভ কণ্ঠে সে বলিল, না, বাপ এবার কোথাও বিদেশে কাজে যাবে না। গাঁয়ে গেছে এখন-ই ফিরবে।

চন্দ্র কোটাল শীষ দিতে-দিতে গুন্‌গুন শব্দ করে। এক কালে সে ভাঁড় নাচের দলে ছিল। তার প্রহসন-লীলায় হাসির চোটে দর্শকদের নাকি দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইত।

চন্দ্র গান করে গুনগুন শব্দে।

আমজাদের কৌতুহলের অন্ত নাই। এই লোকটীকে তার ভয়ও লাগে। তবু সে নিঃশব্দে চন্দ্র কোটালের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

—চাচা।

উচ্চকিত আমজাদ জবাব দিল, কি চাচা ?

—তোমার বাবা ঘরে আছে ত ?

—হ্যাঁ। ভিন গাঁয়ে যায়নি, বল্‌ছি ত বারবার।

—তবে একটু অপেক্ষা করি। আর এক কল্কে সেজে আনো।

আমজাদ দ্বিরুক্তি করিল না।

যথা-শীঘ্র সে ফিরিয়া আসিল।

উল্লসিত হয় চন্দ্র। আবার পান সুপারি আনিয়াছে আমজাদ।

দুইজনে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আলাপের বিনিময়ে মশ্‌গুল।

এমন সময় আজহার আসিয়া উপস্থিত হইল।

চন্দ্র তামাক ফুঁকিতেছিল চোখ বুঁজিয়া। আজহারকে সে দেখিতে পায় নাই।

আমজাদ আনন্দিত হইয়া ডাকে, ঐ আব্বা এলো।—

—এসো, এসো, খাঁ সাহেব—

চন্দ্র আজ সম্মান দেখাইতে তৎপর। বিড়া ছাড়িয়া সে উঠিয়া পড়িয়াছে।

আজহার খাঁ হাসে।

—কি চন্দর, হঠাৎ কি মনে করে?

—কখন থেকে বসে আছি। ডুমুর ফুলের খোঁজ নেই।

আজহার চন্দ্রের নিকট হইতে কল্কে লইয়া টান দিতে লাগিল।

—ঘরে বসে থাক্‌লে চলে, ভাই? পেটের ধান্দায় সকাল থেকে ঘর-ছাড়া।

—কোথা গিয়েছিলে, শুনি।

—খাঁ সাহেব জমিদারদের বাড়ী। হাতেম বখ্‌শ খাঁ একটা কবর তৈরী করাবে নিজের। কত ইঁট চুন লাগবে—তাই ডেকেছিল।

—ওটা কী মরবে নাকি শীগ্‌গির।

কোন জমিদারের পেছনে এমন অসম্মান-সূচক কথা আজহার পছন্দ করে না। একটু বিরক্ত হয় সে।

—একটু খাতির রেখে কথা বলো। 'ওটা' কি বলছ।

যেন কত অনুতপ্ত, তারই ব্যঙ্গ-অনুস্যূত কণ্ঠে চন্দ্র বলে, হ্যাঁ, মুরুব্বী লোক পঞ্চাশ ষাট বয়স, খাতির করবে বৈকি। সত্যি মরবে।

—রাখো তোমার মস্‌করা। সবাই মরবে। আমি কি মরব না?

তুমি-ও তবে আগে থেকে কবর খুঁড়ে রাখো।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আজহার। সে-সৌভাগ্য তার নাই।

—বহুত টাকা খরচ করবে, ভাই। তিন দিকে ইঁট, একদিকে সাদা মার্বেল পাথর।

—তা ত করবেই। আমাদের বেঁচে খরচ করতে প্রাণ যায়, ওরা মরেও আমাদের জন্য খরচের রাস্তা তৈরী করে রাখে।

আজহার খাঁর মাথায় এত প্যাঁচ-ওয়ালা কথা সেঁধোয় না। নির্ব্বোধের মত সে বলে, প্রায় দু-হাজার টাকা খরচ। তারপর আবার বাগান হবে চারিদিকে। সে-ও আর এক হাজার।

বিস্মিত হয় চন্দ্র।

বিজ্ঞের মত জবাব দিল সে: আমার মণ খানেক কাঠ দরকার। ব্যস।

আর নদীর ধারে একটা দেশলাইয়ের কাঠি খরচ। যদি অপঘাতে মরি—তা-ও খরচ নেই। স্বজনদের মেহনত খরচ হবে খানিকটা।

—বাজে কথা রাখো। কেমন মাছ ধরছ জোয়ারে?

—সেই জন্যে ত এলাম। মাছ ধরে কী হবে? এবার বর্ষায় দেখবে খুব মাছ পড়বে। কিন্তু সব ত নিয়ে যাবে পাইকের। ওদের অবস্থা দেখো। আমরা মাছ ধরি, পেটে ভাত জোটে না, ওরা পাকা দালান তোলে।

—কি করতে চাও?

জিজ্ঞাসু নয়নে চন্দ্রের দিকে তাকায় আজহার।

—কিছু পুঁজি দরকার, ভাই। তা-হোলে আমি নিজেই রেল ইষ্টিশনে গিয়ে মাছ বেচে আস্তাম। পাঁচ সাত সের মাছ নিয়ে খরচ পোষায় না। আরো দশটা লোকের মাছ জড়ো করলে এক-মণ দু মণ মাছ নিয়ে বেশ লাভ পাওয়া যেত।

আজহারের মুখের উপর দিয়া কালো রেখা পড়ে।

—পুঁজি – পুঁজির কথা বলছ? সেই ত মুশ্কিল।

—বেশী টাকার দরকার নেই। পঞ্চাশটা হোলেই চলে। তুমি-ও কিছু দাও খাঁ-ভাই। ভাগে ব্যবসা করা যাক।

ভয়ানক উৎসাহিত চন্দ্র।

কয়েক মিনিট চুপচাপ বসিয়া রহিল আজহার। কোন জবাব নেই তার মুখে।

—কি খাঁ-ভাই, কিছু বল্ছ না যে—

একরূপ সন্দেহার্ত দৃষ্টি ফেলে চন্দ্র।

—কি আর বলব! পঁচিশ-তিরিশটা টাকা থাক্লে কি চুপ করে যাই? আমাদের অবস্থা দেখছ না? হাত জানে ত মুখ জানে না।

এইবার চন্দ্রও চুপ হইয়া যায়।

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে সে।

—আমার-ও ত ঐ দশা।

আজহার কথার সূত্র সংক্ষিপ্ত করে হঠাৎ।

—তোমার এই ঝোঁক ধরল কেন? চাষ করে আর ফরসুৎ পেলে মাছ ধরে বেশ ত দিন কাটছিল।

—তা আর হবার যো নেই। চাঁদমণি ফিরে এসেছে। চন্দ্রমণি কোটালের কনিষ্ঠ সহোদরা।

— তোমার এখানেই থাক্‌বে নাকি?

—আরে যা' ভাবছ তা নয়। স্বামী মরে গেছে। তিনটি ছেলে কোলে।

আজহার ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিত না। সহানুভূতিপূর্ণ দুই চোখে কারুণ্য ফুটিয়া উঠে।

— কি হোয়েছিল?

—জ্বর্‌-বিকার।

—ও। আজহার ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দ করিয়া চুপ করিল।

তাই ভাবছি। রোজগারের পথ ত দেখতে হবে। ঘর-ও একটা বেশী নেই যে মাথা গুঁজে থাকব। আচ্ছা চেষ্টা করে দেখ্‌তে পার না? ক'টা টাকা হোলে দু'জনেরই ভাগ্য-পরীক্ষে হয়।

—কে ধার দেবে, তাই ভাবছি। এত টাকা বিশ্বাস করবে কি?

—দেখো চেষ্টা করে। আমরা মাছ ধরি, পাইকেররা তা শহরে বেচে পয়সাওয়ালা। যত টাকা-পয়সা কি শহরে গিয়ে জমেছে?

—তাই ত দেখছি!

চন্দ্র মাথা দোলাইল: আমার কাছে একটা ধাঁধা মনে হয়। আমরা ফসল করছি, গতর পুড়িয়ে মাছ ধরব, সব সেরা জিনিষ শহরে ছুটছে। আমাদের পয়সা-ও হয় না, ভাল খাবার-ও জুটে না।

এই প্রশ্নের জবাব হঠাৎ আজহার খাঁর মাথায় খেলে: শহর থেকে যে কাপড় আসে, আরো কত জিনিষ আসে তা দেখছ না? গাঁয়ের ফসল যায় শহরে। শহরের জিনিষ আসে গাঁয়ে।

—তা ত বুঝলাম। কিন্তু তারা সুখে থাকে, আর আমাদের এই দশা কেন? আমরা কি মেহনৎ করি না? না গতর খাটাই না? আমরা যদি চাল না দিই, শহরের ব্যাটারা খাবে কী।

BANGLA BAZAR GOVT. GIRLS' HIGH SCHOOL
DACCA

আজহার উত্তেজিত চন্দ্রের দিকে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, তুমি তা হলে ন্যাংটা থেকো।

—ন্যাংটা থাকবো কেন? গাঁয়ে তাঁতীরা কাপড় বুন্‌বে।

—সেদিন আর নেই ভায়া। ঐ ত ক'ঘর তাঁতী আছে, তাদের কাপড় কেউ ছোঁয়? অবস্থা দেখছ না তাদের? সব কপালের ফের!

চন্দ্র চুপ করিয়া গেল। তার মাথায় ষ্টেশনের পাইকার রূপে মাছ বিক্রেতা হওয়ার স্বপ্ন তখন-ও মুছিয়া যায় না।

—শহরে-ই ত সব। গাঁয়ের জমিদার চেয়ে ঐ ব্যবসাদারদের-ই টাকা বেশী। তালেব চৌধুরী লোহার কারখানা করে দেখ্‌ছ ফেঁফে যাচ্ছে! হাতেম খাঁ-কে দশবার কিনতে পারে।

আজহার সায় দিল মাথা দোলাইয়া, কোন মন্তব্য করিল না।

দুইজনে নিঃস্তব্ধ। নীরবতার দুঃসহ শাসন কেউ যেন আর অবহেলা করে না।

আমজাদ এতক্ষণ দুইজনের কথোপকথন শুনিতেছিল, সে-ও কোন কথা বলিতে সাহস করে না।

হঠাৎ উঠিয়া পড়িল চন্দ্র। সে বলেঃ আমার অনুরোধটা ভেবে দেখো, খাঁ-ভাই। বেলা হয়ে গেল, যাই—।

নিরাশা-ক্ষুব্ধ কণ্ঠ চন্দ্র কোটালের। আজহার বহুদিন এমন দীনতা দেখে নাই তার। কোন জবাব দিল না সে।

আমজাদ নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। চন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া টান দিল, একটু এগিয়ে দাও চাচা।

গাঁয়ের সরু পথে ডোবার উপর বহু শেওলা ফুটিয়াছিল। চন্দ্র কয়েকটী আমজাদের হাতে তুলিয়া বলিল, এবার বাড়ী যাও, ভারী রৌদ্দুর উঠেছে।

আমজাদ বাড়ীর পথ ধরিল।

মাঠের সড়কে অগ্রসর হইতেছে চন্দ্র। আর শীষের শব্দে আমজাদ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, হেলিয়া-দুলিয়া মন্থর চালে চন্দ্র হাঁটিতেছে। বোধ হয় ফূর্ত্তিতেই শীষ দিতেছে। পৃথিবীতে যেন কোন কিছু ঘটে নাই।

৬

সকালে আজহার প্রতিবেশী সাকেরের খোঁজ লইতে গেল।

পাশের পাড়া। ভিটা ছাড়িয়া সামান্য কলাবাগান পার হইতে বেশী সময় লাগে না। আজহার ভাবিতেছিল, সাকেরের কাছে টাকা আছে। সে পেশাদার লাঠিয়াল। খাঁ বংশের মহিমা বরং একমাত্র সে বজায় রাখিয়াছে। চোয়াড়ে প্রকৃতির চেহারা সাকেরের। লম্বা ঘন গোঁপের উপর ভাঁটার মত দুই চক্ষু শিশুর আতঙ্কের পক্ষে যথেষ্ট। এই সময় তার কাছে টাকা থাকা সম্ভব। মাত্র দু-দিন আগে রোহিণী চৌধুরীর কোন তালুকে প্রজা ঠেঙাইতে গিয়াছিল সে। জমিদারদের কল্যাণে তার অবস্থা অন্যান্য প্রতিবেশী অপেক্ষা ভাল। দাঙ্গার জন্য আরো ভিন গাঁয়ে তার ডাক পড়িত।

চোয়াড় হোক সাকের। কিন্তু আজহার খাঁর সম্মুখে সে ভারী বিনয়ী, খুব মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলে। আজহারের ধারণা সাকের তা-কে শ্রদ্ধা করে। কোন দিন তার কাছে টাকা হাওলাত করিতে যায় নাই। মুখের কথা সে অবহেলা করিবে না সহজে। আর চন্দ্র-ও যেমন বেয়াড়া! তার সঙ্গে বন্ধুত্বের জুলুম সহ্য করিতে কোন কষ্ট হয় না।

সাকের ঘরে ছিল না। তার মা আজহার-কে দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বলিল, আমার পেটে এমন ডিংরে ছেলে জন্মাল, বাবা। আর পারিনে। লাঠি-খেলা কেন যে শিখেছিল। একদণ্ড শান্তি নেই। ও দাঙ্গা করতে যাবে, আর এ-দিকে আমাদের শাউড়ী-বৌয়ের পেটে ভাত সেঁধোবে না।

—সাকের কোথা গেছে, চাচি?

—কাল সন্ধ্যায় বেরিয়েছে আর দেখা নেই।

উদ্বিগ্ন আজহার প্রশ্ন করে, দাঙ্গায় যায় নি তো?

—না। লাঠিটা ঘরে রয়েছে। ঐ বাঁধানো লাঠি ছাড়া সে বেরোয় না। কিন্তু কোথা যে গেল?

আজহার নীরব। নিরাশার আঘাতে বার বার চন্দ্রের মুখ তার মনে পড়িতে থাকে। চন্দ্রটা এমন—

সাকেরের মা সংসারের কথা জুড়িল।

—ছেলে-মানুষ বৌ-টা তেম্নি হোয়েছে। ভয়েই মরে। চাষবাস করে. খেতে বল্, নিজের মানুষ-কে হাত কর। তা না। খালি দিন-রাত ছেলের জন্য কান্না। কাঁচা বয়েস, ছেলে হওয়ার সময় কি পার হোয়ে গেছে, বাবা?

হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মত আজহার জবাব দিল, না, আমাদের হাসু-বৌর আর কত বা বয়েস। কুড়ি পেরোয় নি।

—এখন-ই ছেলের জন্যে হাঁপাহাপি। দোয়া-তাবিজ আমি কি কম করতে বাকী রেখেছি! তবে মাস দুই হোলো নিস্তার। কপালে যদি থাকে—।

—সব আল্লার মরজী, চাচি। তোমার-আমার মত গোনাগার বান্দা আর কি করতে পারে?

—না, বাবা, আল্লা মুখ তুলে চেয়েছে। তারপর চাচি জোর গলায় হাসিল।

—জানো, বাবা, আভাগীর বেটী বলে কি—

আজহার জিজ্ঞাসু নয়নে চাচির মুখের দিকে তাকাইল।

—বৌমা বলে: ছেলের মুখ না দেখ্লে ও-সব লোক আর সংসারী হবে না। ও জোয়ান হওয়া অব্দি ভয়ে-ভয়ে সারা জনমটা গেল। কি দিন, কি রাত, বেঁচে সুখ নেই, বাবা।

আজহার চুপ করিয়া শোনে, কোন মন্তব্য করে না। তার দৃষ্টি প্রাঙ্গণের উপর। হঠাৎ মুখ অন্যদিকে ফিরাইতে সে বাধ্য হইল। সাকেরের স্ত্রী ঘাট হইতে কলস-কাঁখে ফিরিতেছিল। ভাশুর-কে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠানের লাউ গাছের ঈষৎ অড়ালে আড়-ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নিজ-কে বিব্রত মনে করে আজহার খাঁ। সত্যই বড় কাঁচা বয়স সাকেরের স্ত্রীর। মুখখানা ভারী করুণ মনে হয়। পূর্ণ যুবতী। তবু

মুখের আদলে সজীবতা নাই। যৌবনের শ্যামস্পর্শ যেন ক্ষণেক উঁকি দিয়া বিদায় লইয়াছে।

উঠানে লাউ গাছের মাচাঙ। সূর্যের আলো সেঁধোয় না নীচে, এমন ঘন লতার পরিবেশ। দু-একটী লাউ ঝুলিতেছে মাথার উপর। গোড়ার দিকে দশ বারোটী সর্পিল রেখার আলিঙ্গন মাটীর বুকের সহিত। সাকেরের স্ত্রীর কাপড়ের কোন কোন অংশ দেখা যায়।

আজহার যেন কত বিপদে পড়িয়াছে। বেগানা আওরতের সম্মুখে এমন-ভাবে বসিয়া থাকা শোভন নয়। সে উঠি-উঠি করিতেছিল। কিন্তু সাকেরের মার কথা আর ফুরায় না।

—দোয়া করো, বাবা। বৌমার নিয়েৎ পুরা করুক, খোদা।

—আল্লার দোয়া। বান্দার কথায় আর কি হয়? মাঠে কাজ আছে, চাচি। আজ আর বস্‌তে পারব না।

উঠিয়া পড়িল আজহার।

—আচ্ছা, এসো বাবা। দরিয়া-বৌ-কে এদিকে আস্‌তে বলো। বৌমার মাস দুই হোলো, দরিয়া-বৌ-র সাথে কতগুলো কথা আছে।

—সাকের বাড়ী ফিরলে আমাকে একবার খবর দিও।

দু'পাশে কঞ্চির বেড়া। এই পথে কলা গাছের ছায়ান্ধকার জমিয়া উঠিতেছে। সূর্য উঠিতেছিল তেজে। চারিপার্শ্বের আলোর প্রখরতায় অস্পৃষ্ট জায়গায় অন্ধকার আরো ঘন মনে হয়। আজহার খাঁর মন নানা সন্দেহে দোলে। সকাল-টা কোন কাজে আসিল না।

হঠাৎ চাচির খন্‌খনে গলার আওয়াজ শোনা যায়। ঘুলি-পথের উপর উৎকর্ণ আজহার থমকিয়া দাঁড়াইল। হ্যাঁ, চাচির-ই গলার আওয়াজ বটে, দূর হইতেও বোঝা যায়।

—হারামজাদী, ঘরে টাকা-পয়সা নেই, সে বাড়ী থাক্‌তে বল্‌লি নে কেন? মুখের ছ্যাঁদা বুজে গেছে বুঝি।

আরো গালিগালাজের অগ্ন্যুৎপাত। চাচি আদৌ বৌ-কে দেখিতে পারে না, আজহার জানে। কিন্তু আজ সে-জন্য বিশেষ মাথা-ব্যথা নাই তার। সাকেরের ঘরেও টাকা নাই। বুক-টা দমিয়া গেল আজহার

খাঁর। চাচি-কে শান্ত করিতে সে আর একবার ফিরিয়া আসিত, সে উৎসাহও ধীরে ধীরে নিভিয়া গেল।

গোয়াল-ঘরে সামান্য কাজ বাকী ছিল। আজহার খাঁ আজ যন্ত্র-চালিতের মত তাহা সম্পন্ন করিল। চন্দ্র কোটালের কাছে একবার খবর দেওয়া দরকার। সে আশায় আশায় থাকিবে। পাড়ার আর কারো কাছে হাত পাতা নিরর্থক। গফুর খাঁর গঞ্জের দোকান দিনদিন ফাঁপিয়া উঠিতেছে। তার পুরাতন ঋণ দু-বছরে শোধ হয় নাই। সে পথও রুদ্ধ। আরো কয়েকজন সঙ্গতিপন্ন প্রতিবেশীর কথা মনে পড়িল আজহার খাঁর। কিন্তু চারিদিকে খট্‌কা।

দরিয়া-বিবি পূর্ব্বতন শ্বশুর বাড়ীর দুটী দুল্ মাত্র আনিয়াছিল। গত বৎসর আমজাদ ও নঈমার অসুখে তা-ও পোদ্দারের দোকানে বাঁধা পড়িয়াছে।

চন্দ্র হুঁশিয়ার লোক। ব্যবসায় কপাল-খোলা বিচিত্র নয়। কিন্তু রুদ্ধ অদৃষ্টের কপাট খুলিতে সামান্য কুঞ্চিকার কথা, আজহার ভাবিতে পারে না।

মাঠের পথে চিন্তা-ভরাক্রান্ত মনে সে নানা উপায়ের কল্পনা করিতে লাগিল। হঠাৎ আকাশে মেঘ জমিয়াছে। সূর্যের আলো পলাতক। বর্ষা-কাল, যে-কোন সময় বৃষ্টি নামিতে পারে। এই মনে করিয়া আজ গরু মাঠে ছাড়িয়া দেয় নাই আজহার।

সে কোটালের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াছে এমন সময় দম্‌কা বৃষ্টি নামিল। দুপুরে গোসল করিতে হইবে, তাই বৃষ্টির কোন তোয়াক্কা রাখে না আজহার। সোজাসুজি সে গাঙের ধারে আসিয়া থামিল। চতুর্দ্দশীর জোয়ারের সময় চন্দ্র ঘরে থাকার বান্দা নয়। তা-ছাড়া মাছ ধরা একটা নেশা কোটালের।

খালের দুধারে ঝাপ্‌সা গাছপালা। ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি ঝরিতেছে। কোন জন-প্রাণী চোখে পড়ে না। সকলেই বোধ হয় আশ্রয়ে ঢুকিয়াছে। বামে ডিঙি নড়ার ঠক্‌ঠক্ শব্দ শোনা গেল। উৎফুল্ল হইয়া উঠে আজহার। চন্দ্র ছোট্ট পিনিসের উপর দাঁড়াইয়া জাল গুটাইতেছে।

নৌকার গলুই একটী বাঁশের সঙ্গে বাঁধা। স্রোতের টানে বাঁশ ও কাঠের সমবায়ে একরূপ ঘর্ষণ-ধ্বনি বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপাইয়া উঠিতেছে।

আজহার হাঁকিল, চন্দ্র! খালের দুপারে তার প্রতিধ্বনি ছড়াইয়া পড়ে।

সামান্য বৃষ্টির প্রকোপ মন্দীভূত। মেঘ হুড়ুম-হুড়ুম করিতেছে।

বোধ হয় হাঁক চন্দ্র শুনিতে পায় নাই। আজহার নিজেই তার কাছে আগাইয়া আসিল।

লম্বা বেড়-জালে জোয়ারের পূর্ব্বে খালের মুখ ঘিরিয়াছিল চন্দ্র। ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার জাল গুটাইতেছে। বড় শ্রান্ত সে। দুই বাহুর পেশী স্পষ্ট ফুলিয়া উঠিয়াছে। তার দৃষ্টি শুধু জালের দিকে।

চন্দ্র চোখ না তুলিয়াই বলিল, খাঁ-ভাই একটু দাঁড়াও।

জাল গুটানো সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আফ্‌সোস করে, না-ভাই মজুরী পোষাল না। অনেকক্ষণ খাট্‌ছি।

মাত্র সের দুই মাছ পড়িয়াছে। দশ বারোটী তপসে-মাছ কেবল চন্দ্রের চোখে আনন্দের প্রলেপ টানিয়া যায়।

—ভাবছিলাম, 'খিয়ে' (খেপলা) জাল দিয়ে আর একটু চেষ্টা করা যাক। না, তুমি এসেছ ভালই হোলো।

দুইজনেই বাড়ী অভিমুখী। চন্দ্র শীতে কাঁপিতেছিল। অনেকক্ষণ সে বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়াছে। কোটাল-পুত্র তাই নির্ব্বাক। মাছভরা খালুই হাতে দ্রুত হাঁটিতেছিল সে।

—পা চালাও, খাঁ। একটান তামাক না টান্‌লে আর নয়।

পিচ্ছল পথে সাবধানে পা ফেলে আজহার। বৃষ্টি এখনও সম্পূর্ণ থামে নাই। পাখীর পাখনা-ঝাড়া রোঁয়ার মত ইল্‌শে গুড়ি আকাশ হইতে ঝরিতেছে।

উঠানে হাঁকাহাঁকি করে চন্দ্র: সাজো, সাজো।

হাসিমুখে এলোকেশী ও চন্দ্রমণি বাহির হইয়া আসে।

—দাদা যেন যুদ্ধের হাঁক ছাড়্‌ছে।

এলোকেশী বোঝে, কি সাজিবার হুকুম কোটাল রাজার। সে আর

দাঁড়ায় না, দাওয়ায় চন্দ্রমণিকে একটী আসন আগাইয়া দেওয়ার হুকুম দিয়া সে চলিয়া গেল।

এই চন্দ্রমণি! আজহার অবাক হইয়া যায়। মাঠে আসিয়া সে বহুদিন চন্দ্রের এই সহোদরাকে দেখিয়াছে। পাৎলা চেহারার গঠন, ফর্সা রং, বয়সে সে চন্দ্রের অনেক ছোট। অগ্রজ-ই বহু চেষ্টা করিয়া তার বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু একি ছিরি হইয়াছে তার! পাঁকাটীর মানবিক সংস্করণ যেন গাঁয়ে নাজেল হইয়াছে।

—আমার কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে মণি, খড়ের বিড়েটা আর নষ্ট করব না। এমনি বসছি। কিন্তু তুই এমন হোয়ে গেছিস্ কেন ?

কপাল ভাঙলে আর কার গতর ভাল থাকে, দাদা!

আজহার চুপ করিয়া গেল। পঁচিশ পার হয় নাই, ওই কচি মেয়েটা আল্লার কাছে কি গোনাহ্ করিয়াছিল, যার শাস্তি এমন নির্ম্মম! আজহার এ-দিকে ধর্ম্ম-প্রাণ। বুদ্ধি দিয়া যার নাগাল পায় না, সেখানে আল্লার মকরের সন্ধান সে সহজেই লাভ করে।

—জ্বর হয় তোর, মণি ?

আজহার-ও মুষড়াইয়া যায়। আল্লার বান্দার বেশীর ভাগ এই এক-ই দশায় উপনীত! গাঁয়ের দশটা ঘর খুঁজিয়া পাওয়া মুশ্কিল, অভাব-অনটনপ্রসূত কোন ঝঞ্ঝাট যেখানে অনুপস্থিত।

—ম্যালেরিয়া জ্বরে দু-মাস ভুগছি। তবে শরীর আগে থেকেই খারাপ। দাওয়ার এক কোণায় চন্দ্রমণি বসিয়া পড়িল। সাদা থান কাপড় পরনে। তার ফ্যাকাশে রক্তহীন শরীরের সঙ্গে রঙের ভাল সামঞ্জস্য হইয়াছে।

দুটী উলঙ্গ কালো ছেলে চন্দ্রমণির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজহার ইহাদের আগে দেখে নাই।

পিতৃহীন অনাথদের পরিচয় তার অনুমানের কাছে অজানা নয়। তবু সে জিজ্ঞাসা করেঃ তোমার ছেলে না, মণি ?

—হ্যাঁ, দাদা। বড় গোপালের বয়স মোটে পাঁচ। যোগীন তিন বছরের। ওদের নিয়ে-ই ত আমি জ্বলে-পুড়ে মরলুম। একটা কানা-কড়ি যদি বিধবা হওয়ার সময় রেখে যেত—

চন্দ্রমণির কোটর-গত নিষ্প্রভ চক্ষু হইতে টস্ টস্ পানী পড়ে। গোপাল ও যোগীন মার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

চন্দ্রমণি আচ্ছন্ন চোখেই আবার বলিল, দাদা ছিল বলে মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে। কিন্তু দাদার অবস্থা ত দেখছ, ছেলে-পুলে মরে গেল। তার ওপর আবার আমার বোঝা।

শুকনা গামছা পরিয়া কল্কেয় দম দিতে-দিতে চন্দ্র বাহিরে আসিল। তার চোখ পড়ে মণির উপর।

—এই আবার প্যান প্যান শুরু করেছিস। এই মণি, অমন করবি ত যা নিজের যায়গায়। দেখ না আজহার-ভাই, ওর হয়েছে কি? আমি ত মরে যাই নি।

চন্দ্র ধমক দিল আবার: যা উঠে, মাছ কুটে দে। ছেলেদের খাওয়াতে-দাওয়াতে হবে?

চন্দ্রমণি এবার রাগিয়া উঠে: কিছু হয়নি। খেটে খেটে আমাদের জন্য শরীরটা কি হচ্ছে!

—ভাগ্—ভাগ্—আর মুখ খুলিস্ নি। কি হোয়েছে আমার শরীরের?

আজহারের হাতে কল্কে দিয়া চন্দ্র হাতের পেশী ফুলাইয়া বলে, ছাখ, মণি, ছাখ। ঘুষি মেরে কোন্ বাপের ব্যাটা এটা নোয়াক দেখি। ম'লো যা—যা রান্না-শালে।

গোঁপে তা দিয়া চন্দ্র ঠোঁট বাঁকাইল।

এলোকেশী চন্দ্রমণির হাত ধরিয়া টান দিল। সে বলিল, চলো-না ঠাকুর-ঝি। ভাই-বোনে আর সতীনের ঝগড়া দরকার নেই।

মৃদু হাসি এলোকেশীর ঠোঁটে।

—যা – যা, নিয়ে যা শিগ্গীর।

যোগীন মামার কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে থাকে।

—তুমি হাস্ছ! দেখি পাঞ্জা ধরো ত।

তিন বছরের শিশু। ভয় পায় না সে। কচি পাঞ্জা বাড়াইয়া দিল যোগীন।

গোপাল বড় নিরীহ। সে ছোট ভাইয়ের খেলা দেখে। ভয়ে

গোলাপ মামার কাছে ঘেষে না।

—এই রকম করে লড়্‌তে শেখ, বেটা। বড় হলে ডাকাতি করবি

আজহার ঠোঁট হইতে কল্কে নামায়।

—বেশ তালিম দিচ্ছ ভাগ্‌নেকে।

চন্দ্র লম্বা গোঁপে তাও দিল একবার।

— সত্যি, ডাকাত করব ছেলেগুলোকে। লুটপুট খাবে, খেটে ত খেতে পাবে না। নিজেও ডাকাতের দলে ঢুক্‌ব।

আজহার ভাবে, চন্দ্রের মাথায় ছিট আছে। তবু আজ চুপ করিয়া যায় না সে।

—তুমিও ডাকাতি করবে ?

—করব না ? এত মেহনৎ করে লাভ কী ? ধর্ম্ম-টর্ম্ম-ভগবান ও-সব আমি মানি নে। খেটে খেতে না পাওয়ার চেয়ে চুরি করায় পাপ নেই।

আজহারের চোখ কপালে উঠিতেছে যেন।

—কি সব বক্‌ছ, চন্দর !

—সত্যি বল্‌ছি, মন-মেজাজ বিগড়ে গেছে আমার। তুমি বিশ্বাস করো ভগবান আছে, আল্লা আছে ?

—তৌবা, তৌবা, তৌবাস্তাগফের।

আজহার মনে মনে দরুদ শরীফ পড়িতে লাগিল।

যোগীন মাতুলের সঙ্গে তখন-ও পাঞ্জা লড়িতেছে।

চন্দ্র কোটালের মুখ বন্ধ থাকে না: আমরা খেটে খেতে পাই না। ওরা বসে-বসে তামাক ফুঁকে, গদীতে শুয়ে খেতে পায়। বলে: ভগবানের ইচ্ছে, কপাল !

গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিয়াছে আজহার খাঁ।

হাত বাড়াইয়া দিল চন্দ্র তার দিকে। বলিল, রাগ করছ ? আচ্ছা, এখন আসল কথা পাড়া যাক।

জিজ্ঞাসা করে আজহার, কি কথা ?

—কি বলেছিলাম ?

সে-প্রশ্ন এতক্ষণ আজহার খাঁর মনে কোন চিহ্ন বজায় রাখে নাই। নিতান্ত নির্বোধের মতই সে উত্তর দিল।

—কি বলেছিলে ?

এক চোট হাসিয়া লইল চন্দ্র।

—তা আর মনে থাক্‌বে কেন। মাছ-ব্যবসা তোমার সঙ্গে। আরো অপ্রতিভ হয় আজহার খাঁ।

লজ্জায় সে অস্পষ্ট কণ্ঠেই জবাব দিল, জানো ত আমার অবস্থা। টাকা-ও ধার পাওয়া গেল না।

—খামাখা এতক্ষণ আমার সঙ্গে তর্ক জুড়েছিলে। চোখ চেয়ে দ্যাখো না। পেট চলে না, ব্যবসা করব। তা একটা কানা-কড়ি পুঁজি নেই।

তারপর চন্দ্র চুপ করিয়া গেল। চন্দ্রমণি নিঃশব্দে আসিয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল। সে-ই নীরবতা ভাঙ্গিল।

—দাদা, মাছের ব্যবসার জন্য যোগীনের বাবার-ও খুব ঝোঁক ছিল।

চন্দ্র হুঁ-শব্দে সায় দিল মাত্র।

যোগীনের মামার সঙ্গে খেলা বন্ধ। সে অভিমানীর মত বসিয়া আছে। চন্দ্র তার দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া জোরে হাসিয়া উঠিল।

—এই ছোট-মামা, আমাদের যুক্তি আঁটাই রইল। না, আর ব্যবসা করব না। চাষ্‌-বাস করব না।

আজহার মনে করে চন্দ্র তার উপর বিরক্ত। খট্‌কা মুছিয়া ফেলিবার জন্য সে সরস কণ্ঠেই বলিল, আমার উপর রাগ করো না, চন্দর। গেল দু'বছর কি করে যে সংসার চালিয়ে নিয়ে আস্‌ছি, আমিই জানি।

চন্দ্র যোগীনের মা-কে আর এক কল্কে তামাক আনিবার জন্য আদেশ করিল।

—তোমার উপর রাগের কি আছে ? রাগ সব—ওই যে তুমি কী বলো—কপাল, কপালের উপর।

আজহার ভিজা কাপড়ে বসিয়াছিল। সে যেন কতো অপরাধ করিয়াছে। সহজে চন্দ্রের দাওয়া হইতে উঠিতে পারিতেছিল না।

চন্দ্রমণি গন্‌গনে এক কল্কে আগুন লইয়া হাজির হইল। আজহার নির্জীবের মত দু-এক টান দিয়া কল্কে আবার প্রত্যর্পণ করিল।

—খাঁ, চলো জমির ধানগুলো দেখে আসি। তুমিও বাড়ী যাবে। দু'জনেই সড়ক ধরিয়া অগ্রসর হয়। চন্দ্রের হাতে দু'টি লাল-গোঁফ তপ্‌সে মাছ। আজহার আন্‌মনা, কোন দিকে তার দৃষ্টি নাই। কোটালের কোন সাহায্য করিতে পারিল না, এই চিন্তা তার মনে কোথায় যেন বিঁধিতে থাকে।

চন্দ্র বেপরোয়া। সে তার স্বকীয় পদক্ষেপের ভঙ্গী বিস্মৃত হয় না।

বৃষ্টির পর দিগন্তের আবিলতা মুছিয়া গিয়াছে। সাদা বকের দল বিলের ধারে কোলাহল-রত। খালের তীরে নল-খাগড়ার ঝোপের পাশে একটি মাছ-রাঙা বাসা হইতে গলা বাড়াইয়া আবার সন্ত্রস্ত নীল আকাশে মিশিয়া গেল নিমেষে। চন্দ্র কোটালের চটুল চাহনি এক জায়গায় স্থির থাকে না।

আজহার পেছন-পেছন হাঁটিতেছিল। হঠাৎ চন্দ্র পাশ ফিরিয়া চাওয়া-মাত্র আজহার ধরা-গলায় বলে, চন্দর, মনে করিস নে কিছু, ভাই। আমার-ও বরাত। কপাল ত খুল্‌ল না। ব্যবসা করে একবার দেখা যেত।

চন্দ্র কোটাল অবাক।

—নিশ্চয় রাগ করব! তপ্‌সে মাছ দুটো যদি ছেলেপুলে নিয়ে ভেজে না খাও, রাগ করব না? হাসি মুখে চন্দ্র আজহারের হাতে মাছ দুটী গুঁজিয়া দিল।

চন্দ্র কোটালের মনে চন্দ্রমণি, সংসার, যোগীন, গোপাল সকলে এক একবার উঁকি দিয়া যায়। দুঃখের পশরা যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। আজহারের সঙ্গ তার আরো ভালো লাগে।

—আজহার ভাই, তোমার সঙ্গে একবার বিদেশে যাব। রাজমিস্তিরির কাজ শিখিয়ে দাও সামান্য।

আজহারের নিকট হইতে কোন জবাব আসিল না। চন্দ্র তার বিষণ্ণ মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া নীরবে হাঁটিতে লাগিল।

একটা সাদা গাঙ-চিলের তীক্ষ্ণ স্বর প্রান্তরে মূর্চ্ছাহত স্বপ্নিল আবেশের মত বিলীন হইয়া যায়।

৭

কয়েক কাঠায় আউস ধান দিয়াছিল আজহার।

বর্ষার মাঝামাঝি পাকা রঙ ধরিয়াছে আউসের ধানে। হঠাৎ সে রাজমিস্ত্রীর কাজে কন্নিক ইত্যাদি লইয়া ভিন-গাঁয়ে চলিয়া গেল। সমস্ত সংসার রহিল দরিয়া-বিবির উপর। পূর্ব্বে বিদেশে যাওয়ার আগে আজহার খাঁ সলা-পরামর্শ করিত স্ত্রীর সহিত। এবার কোন কথা সে উচ্চারণ করে নাই। দরিয়া-বিবি আজহার-কে যন্ত্রপাতি লইতে দেখিয়াছিল। কোন ভিন-গাঁয়ে যাইতেছে সে, এমন ধারণা দরিয়া-বিবির মনে ঘুর্ণাক্ষরে উদিত হয় নাই। পরে আমজাদ আসিয়া খবর দিয়াছিল। পিতার বিদেশ-যাত্রার সংবাদ শুধু সে-ই প্রথমে অবগত হয়।

—তুই ঝুট বল্‌ছিস, আমু।

—না, মা। আব্বা বল্‌লে, কোথায় নিয়ামতপুর আছে, সেখানে কাজে যাচ্ছে।

অবেলা সঙ্গীদের সঙ্গে আমজাদ তেপান্তর-জরিপে বাহির হইয়াছিল। আকস্মিক সাক্ষাৎ পিতা-পুত্রে। নিতান্ত দৈবাতের যোগসাজস মাত্র।

দরিয়া-বিবি কিছুক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন-ও লোক সংসারে আছে! বিদেশে যাইতেছে তা-ও বাড়ীর লোকদের একটু খবরমাত্র দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না।

—হুই ইষ্টিশেনের দিকে গেল। মা, আব্বাকে দেখ্‌লে একটা পাগল মনে হয়। মুখে কথা নেই। মাথা গুঁজে চলেছে ত চলেছে-ই। হুঁস্‌গুস নেই।

দরিয়া-বিবির ঠোঁটে এতটুকু দাগ পড়িল না।

—মা, কী হাসি লাগে আব্বার ছিরি দেখলে। লুঙ্গিটা পর্যন্ত ভাল করে পরতে জানে না। কোন রকমে কোমরে গুঁজলেই বুঝি কাপড় পরা হয়? তার উপর ছেঁড়া পিরহান।

দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল দরিয়া-বিবি।

—যা, আর কথার খই ফোটাতে হবে না।

আমজাদ কেঁচো বনিয়া গেল।

দরিয়া-বিবি লক্ষ্য করে, সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে। ঘন কৃষ্ণ পক্ষ। আজ আর চাঁদ উঠিবে না সড়কের উপর। ইষ্টিশেনের পথ অনেক দূর।

—তোকে আর কিছু বলেনি, তোর আব্বা।

আমজাদের ত্রস্ত-সঙ্কুচিত চিবুক ছুঁইয়া দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসা করিল। পিতৃহীন কোন অনাথের চিবুক যেন স্পর্শ করিতেছে দরিয়া-বিবি। কণ্ঠ তার নুইয়া পড়ে ভাবাবেগের আতিশয্যে। হঠাৎ এমন দীনতার প্রলেপ তার মনে ও শরীরে! অস্বোয়াস্তি অনুভব করে জননী। বালক-পুত্রের জবাব আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশিয়া যায়।

—খালি বল্‌লে, আমু, কাজে যাচ্ছি নিয়ামতপুর। নিয়ামতপুর, কোথা মা?

দরিয়া-বিবি কোন উত্তর দিল না। আজ ক্ষোভ হয় তার। হিংসা-উদ্ভূত ক্ষোভ। সমস্ত সংসার-কে এমনই নির্ব্বিকার চিত্তে সে দেখিতে পারিত! রাত পোহাইলে শত কাজ, মনের চারিদিকে আরো সহস্র বেড়ির সর্পিলতা।

আমজাদ সম্মুখে না থাকিলে অবোধ বালিকার মত কাঁদিয়া ফেলিত দরিয়া-বিবি। দৃষ্টি নেপথ্যে মিলাইয়া, বালক-পুত্রের উপর ঈষৎ ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে স্থাণু প্রতিমার মত।

নঈমা পিতার ন্যাওটা। পাড়ার কোন বালকের মুখে সে বাবার বিদেশ-যাত্রার কথা শুনিয়াছিল। তার কান্না আর থামে না। রোদন-আতুর কন্যার কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙিল দরিয়া-বিবির।

—মা, আমাকে আব্বা নিয়া গেল না। নঈমা চীৎকার করে।

—চুপ। না হোলে মার খাবি।

মার ধমকে নঈমা শান্ত হয়।

দরিয়া-বিবি বলে, আমু, এ-কে তোমার মক্তবের বইয়ের ছবি দেখাও।

তখন-ও সন্ধ্যা দেওয়া হয় নাই, দরিয়া-বিবির খেয়াল ছিল না। তাই আবার বলিল, আমি ডিপে জ্বেলে দিচ্ছি একটু সবুর কর, বাবা।

নাচ-দুয়ারে প্রদীপ দেখাইতে আসিয়া দরিয়া-বিবি গোরুগুলির চেহ্‌রা-ও একবার দেখিয়া লইল। যদি বৃষ্টি না হয় কিছুক্ষণ চরাটের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আমু ছেলে মানুষ। অপরের ফসলে না পড়ে, সে ভয়-ও আছে। খোঁয়াড়ের পয়সা যোগানের ক্ষমতা যাদের আছে তাদের গোরু-বাছুর ছাড়া থাকে ফসলের দিনেও।

নিমগাছের নীচে পোয়াল-খড়ের গাদাটী বড় অদ্ভুত ঠেকিল আজ দরিয়া-বিবির। নিঃসঙ্গ মনে হয় ভিটের আশ-পাশ। প্রদীপ দেখাইয়া তাই তাড়াতাড়ি সে পুত্র-কন্যার নিকট ফিরিয়া আসিল।

একজোড়া পেঁচা উড়িয়া গেল। অমঙ্গলের আশঙ্কায় দরিয়া-বিবির বুক দুরুদুরু করে। ছেলেদের কাপড় চুরি গেল কয়েকটী। হাত-ছ্যাঁচড়ের উপদ্রবে রাত্রির ঘুম ব্যাহত হয়। পুরুষ মানুষ ছিল ঘরে, তবু ভরসা। নিঃসঙ্গতা আর একবার হানা দিয়া গেল। বেলাবেলি গেরস্থালির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। দরিয়া-বিবি আমজাদের পাশে বসিয়া তার পড়া শোনেঃ একদা দিল্লী নগরীর পথে—।

নঈমা হি হি শব্দে হাসেঃ দিল্লী-বিল্লী হি-হি।

—চুপ করে শোন। গোলমাল করিসনে, নঈমা। তোর বড় ভাই পড়ছে।

দরিয়া-বিবির কোলে বসিয়া দুলিতে থাকে নঈমা। বড় সজাগ আজ দরিয়া-বিবির কান। আমু পড়া-শুনা করিতেছে, তার গোলমাল নেহায়েৎ কম নয়। তবু বেড়ার ধারে কি পৈঠার কাছে সামান্য শব্দ হইলে দরিয়া-বিবি উৎকর্ণ হইয়া পড়ে।

ধূসর ভবিষ্যৎ যোজন-বিসারী প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তার চারিদিকে শুধু রুক্ষতা; সবুজ রঙের ফিকে আভাস পর্যন্ত নাই। দৃষ্টি মেলিয়া দিলে চাঁচর বালুর অকরুণ হাসি-ই একমাত্র সত্যরূপে প্রতিভাত হয়।

দরিয়া-বিবি কোনদিন বাস্তবের সম্মুখে ভাঙিয়া পড়িতে শিখে

নাই। আজ সামান্য ব্যাপারটুকু কেন্দ্র করিয়া এত-কিছু ঘটিয়া গেল।

সপ্তাহ কবে শেষ হইয়া যায়, আজহার খাঁর কোন খবর নাই। পিয়ন-কে আমজাদ অনর্থক বিরক্ত করে। দরিয়া-বিবি-ও চিন্তিত হয়। অবশ্য আউস-ধান কাটা বাকী আছে। তার পূর্বে আজহার খাঁ নিশ্চয় বাড়ী ফিরিয়া আসিবে, দরিয়া-বিবির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

ধীরে ধীরে আরো দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সাকের-কে ডাকিয়া দরিয়া-বিবি বহু খেদোক্তি করিল। জওয়ান মরদ বিদেশে গিয়াছে, তার জন্য এত ভাবনা-চিন্তা ভাল নয়। এই উপদেশ দিয়া সে সরিয়া পড়িল।

দরিয়া-বিবি চারদিকে অন্ধকার দেখে। হাত-খরচ শেষ হইয়া গিয়াছে। ছোট ছেলে আর মেয়ের মুখে দৈনন্দিন আহার্য্যটুকু কী শেষে যোগাইতে পারিবে না! ধার-কর্জ্জ করিয়া কত দিনই বা চলিবে?

দরিয়া-বিবি উপায়ের খোঁজে অন্ধকারে হামাগুড়ি দিতে থাকে। ছাগল-ছানা দুটী থাকিলে দুর্দ্দিনে কাউকে বিক্রয় করা যাইত। সে পথে-ও আল্লা বাধ সাধিয়াছেন। পুরুষ মানুষ ঘরে থাকিলে কোন না কোন পথের হদিস মিলিত। বর্ষাকাল—পাড়া-প্রতিবেশীরা কোন রকমে দিন গুজরান করে। বীজ-ধান খাইয়া অনেকে শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। এই সময় জন-মুনিশ লোক কম খাটায়। চারিদিকে বিপদের বেড়াজাল। প্রত্যেকে আত্ম-বিব্রত। গরীব কৃষক-পল্লীর ভেতর সহানুভূতি বুক-ফাটা নিঃশ্বাসের রূপ ধরিয়া বাতাসে ধ্বনিত হয়। আর তিন চার দিনের খোরাক আছে। তারপর?

পরদিন সাকেরের মার সঙ্গে দরিয়া-বিবি দেখা করিতে গেল। বৃদ্ধার গণ্ডস্থল আনন্দে স্বচ্ছ হইয়া উঠে। হাসু-বৌর নিয়ৎ আল্লা পুরা করিয়াছে এতদিনে। আনন্দে সাকেরের মা এই বয়সেও অস্থির হয়। দরিয়া-বিবি ঠাট্টাচ্ছলেই দাওয়াতের কথা পাড়িয়াছিল। বৃদ্ধা শুধু রাজী হইয়া গেল না, রীতিমত পীড়াপীড়ি শুরু করিল। দরিয়া-বিবি আজ সরলচিত্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারে না। কোথায় যেন মনে ব্যাপারটা বেঁধে। ঘরে ভাত

নাই, এমন দিনে দাওয়াত স্বীকার করিলে পাড়া-পড়শীরা হীন চোখে দেখিবে। তবু রাজী হইয়াছিল দরিয়া-বিবি। এক বেলার খোরাক অন্ততঃ বাঁচিয়া গেল। আসেক্‌জান-ও সেই সঙ্গে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

এতদিন আসেক্‌জানের প্রতি দরিয়া-বিবির একরূপ করুণা-মিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব ছিল। ইদানীং অন্য চোখে দেখে এই বৃদ্ধা-কে। সংসারে নিজেদের অসহায়তার সঙ্গে আসেক্‌জানের দশা সমান পাল্লায় ওজন করা চলে, দরিয়া-বিবি তা গভীরে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে। পূর্বে তার কোন খোঁজ-খবর-ই সে লইত না। কখন খায়, ঘুমোয় বা অভুক্ত থাকে তার হিসাবের প্রয়োজন ছিল না দরিয়া-বিবির। বর্ত্তমানে মনের এই বোঝা-বাহী প্রবৃত্তির তাড়না সে নিজেই অনুভব করে।

বর্ষায় আসেক্‌জান বাহির হইয়া যায়। দপাদপি বৃষ্টির তোড় চলিতেছে, সে কিন্তু থামে না। হয়ত তার দাওয়াত থাকে অথবা থাকে না—কিন্তু দাওয়াতের বাহানা সে ষোল আনা করে।

ঘরে চাল শেষ হইয়া আসিতেছে। আসেক্‌জান সব খবরই রাখে। এই বিষয়ে আমজাদ তার সহায়। রাত্রি বেলা ঘুমাইতে গেলে আসেক্‌জান খুটাইয়া-খুটাইয়া সব জিজ্ঞাসা করে।

—জালায় আর বেশী চাল নেই, দাদি। মা কত রাগ করছিলেন আব্বার উপর।

আসেক্‌জান প্রশ্নের জবাবে চুপ করে কিছুক্ষণ, আবার বলে ঃ আজ পেট-পুরে ভাত খেয়েছো ?

—হ্যাঁ, দাদি। মা কিন্তু ভাল করে খায় না।

আসেক্‌জান স্তব্ধ হইয়া গেল আবার।

এমন সংলাপের বিনিময় চলে।

পরদিন জালার ভেতর হঠাৎ বেশী চাউল দেখিয়া দরিয়া-বিবি আমজাদ-কে ডাকাইল।

দরিয়া-বিবি ঃ জালায় চাল এলো কোথা থেকে ?

আমজাদ ঃ আমি কি জানি, মা।

দরিয়া-বিবি ব্যাপারটা সহজে আন্দাজ করে। অন্যদিন হইলে

এতক্ষণ কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইত। সদ্‌কা-জাকাতের চালে তার শিশুদের জঠর-সেবা চলিতে পারে না। আজ দরিয়া-বিবি নিজেই অন্যদিকে কথার স্রোত ফিরাইল।

—তুই পিয়ন-কে জিজ্ঞেস করেছিলি, টাকা বা চিঠি কিছু নেই ?

—আমি রোজ জিজ্ঞেস করি, মা।

—কাল আর একবার যাস।

মার কণ্ঠ এত মোলায়েম হইতে পারে, আমজাদের বিশ্বাস হয় না।

বড় মিষ্টি মনে হয় মার গলা : আমু, ধান পেকেছে নাকি দেখে আসবি কাল। মুনিশ করে কাটতে হবে আর কী।

আমজাদ মাথা দোলাইয়া সায় দিল।

রান্নার জন্য মা চাউল মাপিতে আসিয়াছিল। হঠাৎ আমজাদ-কে আদর করিতে আরম্ভ করিল দরিয়া-বিবি। যেন কত কথা আছে আরো, তা আজ বলিয়া শেষ করা যায় না। তাই স্নেহের ছোঁয়াচে সমাপ্তি-রেখা টানা হইতেছে। মার চুম্বনে বিব্রত হয় আমজাদ।

বাইরে বাঁশ-বনে ঝিঁঝির শব্দ শোনা যায়।

পরদিন দুপুরে আমজাদ স্তম্ভিত হইয়া গেল। সামান্য অন্যায়ে মা এমন শাস্তি দিতে পারেন! মক্তবের বেতন চাহিয়াছিল সে। হয়ত মার মেজাজ ভাল নয়, সেই জন্য চাওয়া উচিত হয় নাই; কিন্তু জননী এমন বেদেরেগ হাত চালাইতে পারে, তার জানা ছিল না।

মার খাইয়া দাওয়ায় বসিয়া সে নীরবে অশ্রুপাত করিল বহুক্ষণ। নঈমা পাশে দাঁড়াইয়াছিল। অনুতপ্ত জননীকে যদি একটীবার পাওয়া যায়। দরিয়া-বিবি শত 'কাল্লাম' জুড়িয়াছিল। আজহার ও তার চৌদ্দ পুরুষের চাল্লিশার আয়োজন হইতেছিল দরিয়া-বিবির ঠোঁটে। আমজাদ আনমনা অলক্ষিতে ভিটা হইতে সরিয়া পড়িল।

মাঠে আসিয়া সে শান্তি পায়। আজহারও এই প্রান্তরের বুকেই দীর্ঘ-শ্বাসের মর্যাদা দিতে পারে। রক্তের শৃঙ্খলে বোধ হয় আমজাদ বাঁধা পড়িয়াছিল।

সে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল মাঠে-মাঠে। আকাশে মেঘ ছিল, বৃষ্টি

ছিল না। ঘুরিয়া বেড়াইতে কোন বাধা নাই।

বেলা ঢলিয়া পড়িতে তার ভয়ানক ক্ষুধা লাগিল। বর্ষাকালে ধান ছাড়া অন্য চাষ নাই মাঠে। গ্রীষ্মের দিন হইলে তরমুজ-শশা খাইয়া আমজাদ মার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিত। অদৃশ্য হাতের টানেই সে চন্দ্র কোটালের কুঁড়ের দিকে অগ্রসর হইল।

নদীর মোহনার কাছে একটা পিঠুলী গাছের তলায় বসিয়া আমজাদ আবার আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। চন্দ্র-কাকার বাড়ী সোজা-সুজি যাইতে আজ বাধে। মনের আবহাওয়া অতটুকু খোকা-ও সহজে মুছিয়া ফেলিতে পারে না।

চন্দ্রমণি একবার কলস-কাঁখে খালের ধারে আসিয়াছিল। আমজাদ-কে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, খোকা এখানে বসে আছ যে — ?

আমজাদ জবাব দেয় না। তার মুখ শুষ্ক। চোখের পাতার নীচে কান্নার শুষ্ক ছাপ।

—রাগ করে এসেছো বুঝি বাড়ী থেকে ?

চন্দ্রমণি ঠিকই আন্দাজ করিয়াছিল।

—চলো, তোমার কাকা ঘরে আছে। কি হোয়েছে ?

আমজাদ শুধু মাথা হেঁট করিয়া থাকে। চন্দ্রমণির অনুরোধ সে রক্ষা করে না।

এই সময় চন্দ্র কোটাল-ও আসিয়া উপস্থিত হইল।

—কিরে, চাঁদমণি।

—এই ছাখো না, দাদা। তোমার বন্ধুর ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে।

চন্দ্র-ও আমজাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিল। সে নির্বিক নিশ্চল। তার কচি সুন্দর দুই চোখ-ও দূরে উধাও।

হাসিয়া ফেলিল চন্দ্র।

—আরে চাচা, গাছের তলায় শেষে তপ করতে বসেছো নাকি ? তোমার বাবা বড় নামাজী-মুসল্লী। তার ছেলে ত।

আমজাদ কারো দিকে চায় না।

কোটালরা দুই ভাই-বোনে খুব হাসিতে থাকে।

শীষ দিয়া চন্দ্র গান ধরিল —কথা কয় না,
আমার ময়না।

তবু আমজাদের ঠোঁটে কোন আভাস নাই। চন্দ্র এইবার একটা শীষ দিয়া 'সুৎ' শব্দ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমজাদকে পাঁজা-কোলা ভাবে একদম কাঁধে তুলিয়া লইল।

মৌনী বাবা এবার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কান্না শুরু করিল।

কথা কয় না,
আমার ময়না,
হায়, হায় রে……

চন্দ্র খালের সড়কে হাঁটে।

চন্দ্রমণি ডাকে, ও দাদা, ছেলেটাকে দু'টো মুড়ি খাইয়ে নিয়ে যাও।

মাথা দোলায় চন্দ্র।

—হ্যাঁ, বড় কথা মনে করেছিস, মণি।

কোটাল আবার ঘরের দিকে মুখ ফিরাইল।

৮

বৃষ্টি ঝরিতেছিল অঝোরে। মাঠের খোলা জায়গায় জমাট টুইটুম্বুর পানীর উপর আকাশের ছায়া পড়ে। বর্ষা থামিলেই শালিখ-চড়াই স্নানের লোভে ছুটিয়া আসিবে।

দরিয়া-বিবি সদর ছাড়িয়া সড়কের ঘুলি-পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জীবনে আর কোন দিন সে এতদূর আসে নাই। মাথায় চটের থলি টোকার মত করিয়া দেওয়া। পায়ের তলায় বৃষ্টি-স্রোত বহিয়া যাইতেছে। চটের থলি পানী রোধ করিতে পারে না। ইতিমধ্যে উপর-দিক ভিজিয়া গিয়াছে।

দরিয়া-বিবি নির্ব্বিকার দাঁড়াইয়াছিল। বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে, তবু খেয়াল নাই। কার প্রতিক্ষায় সে দাঁড়াইয়া আছে ?

সড়কের একপাশে গাছপালার নৈরাজ্য অল্প, তাই দূরে মাঠ দেখা যায়। অন্যান্য দিকে আকাট লতা আর গাছ-পালার জঙ্গল। মেঘ-মেদুর আকাশের আচ্ছাদনে নীরবতা-নিবিড় পল্লীর এই বিজন কোলটুকু ভয়াবহ, প্রেতায়িত— সামান্য শব্দে চমক লাগে।

সড়কে দরিয়া-বিবি দাঁড়াইয়া থাকে। চঞ্চল চোখ বার বার সড়কের দূরতম রেখায়। তার গম্ভীর মুখাবয়ব আকাশের বাদল যেন।

হঠাৎ দরিয়া-বিবির দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। দূরে একটী বালক মূর্তি দেখা গেল। আমজাদ দ্রুত পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। একটী মাত্র লাল গামছা তার মাথায়।

বৃষ্টির পতন-রেখার ভেতর দিয়া তার বালক-মূর্ত্তি অপরূপ দেখায়। একটী পুতুল লাফাইয়া চলা-ফেরা করিতেছে।

দরিয়া-বিবি আকস্মিক উৎফুল্ল হইয়া ওঠে। আমজাদ তার নিকটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বলে, শৈরমীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

বৃষ্টি-স্নাত তার সমগ্র শরীর। শীতে আমজাদ কাঁপিতেছিল। সহজে জবাব দিতে পারে না সে।

মার কাছে ঘেঁসিয়া সে হাঁফ ফেলে কিছুক্ষণ, তারপর বিষণ্ণ মুখেই জবাব দেয়ঃ না গো মা। তবে শৈরমী ফুফুর 'জা' বল্‌লে, সে মাঠ থেকে তোদের বাড়ী যাবে।

শৈরমী জাতে বাগ্‌দী। কৈবর্ত্ত-পাড়ার ঠেস ছাড়াইয়া গেলে জনপদের একটেরে বাগ্‌দীদের বাস। শৈরমীর সংসারে একমাত্র পঙ্গু পুত্র জীবিত। বহুদিন পূর্বে তার স্বামী পরলোকগত। গণেশ দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া পরে হঠাৎ অকেজো হইয়া পড়ে। সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, এক্‌ হাত বাঁকিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে-ও শৈরমী-কে এই পুত্রের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পাড়ায় সে ঘুটে দেয়, মাঠের শাক তুলিয়া বেচে, কারো বাজার-সওদা কিনিয়া আনে। ফায়ফরমাসেই তার জীবিকা সংগ্রহ হয়। জওয়ান পুত্রের এই দুরবস্থা। কায়িক পরিশ্রমের চাপেই শৈরমী তা সহ্য করিতে শিখিয়াছিল। দরিয়া-বিবির সঙ্গে কয়েক বছরের পরিচয়। শৈরমী এই বাড়ী ঘুঁটে দিয়া যায়। সেই সূত্রেই হৃদ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। শৈরমী গ্রামের-ই ঝিউড়ী বলিয়া সে দরিয়া-বিবিকে ভাবী সম্বোধন করিত।

আমজাদ শীতে কাঁপিতেছিল। সেদিকে দরিয়া-বিবির লক্ষ্য নাই। কাদার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে যেন কত ভাল লাগে।

বিষণ্ণ-মুখ পুত্র ও জননীর!

বৃষ্টি একটু কমিয়াছিল। গাছে-পালায় মৃদু-নিনাদ অহর্নিশ বাজিতেছে। পাখীর ভিজে পাখ্‌না-ঝাড়ার শব্দ এবার শোনা যায়।

—যদি না আসে। নীরবতা ভাঙিল দরিয়া-বিবি।

—না গো মা, আস্‌বে। ঘরে চলো, আমার শীত পেয়েছে।

হুঁশ হয় যেন দরিয়া-বিবির। আঁচলের একপাশ শুষ্ক ছিল, তা দিয়া সে আমজাদের মাথা মুছাইয়া দিল!

—এখানে মুছে কি হবে মা, বিষ্টি পড়ছে যে।

গৃহকর্ম্মে নিপুণ দরিয়া-বিবির কোন কাজে যেন সুডৌল নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে এখন চুল মুছাইয়া দেওয়া বৃথা, এই কথাটুকু সে যেন উপলব্ধি করিতে পারে না।

একটা অশথ গাছের গোড়ায় অনেক ব্যাং লাফাইতেছে। শীতে কাঁপিতেছে, তবু মজা লাগে বেশ আমজাদের। থপ্ থপ্ করিয়া একটী ব্যাং সড়কের উপর বসিয়া বাদল পোকা খাইতেছে নীরবে।

আমজাদ জোরে এক স্যুট দিয়া বলিল, মা, দ্যাখো ফুট্‌বল খেল্‌ছি।

ধপাস শব্দে কয়েক হাত দূরে গিয়া ব্যাংটী আবার মাটীর উপর পড়িল। চার হাত-পা ছাড়িয়া কোক-কোক শব্দ করে ব্যাঙের বাচ্চা।

দরিয়া-বিবি এই সময় হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না।

—আরে আমু, তোর ছেলেমি আর যায় না।

নিজের কৃতিত্বে আমজাদ গম্ভীর হইয়া যায়। মাথা দোলাইয়া সে বলে, ঘরে আমাকে কিন্তু গরম ভাত খেতে দিতে হবে। এত ভিজেছি, আমার বুঝি ক্ষিধে লাগে না?

দরিয়া-বিবি চুপ করিয়া গেল। তার মুখের হাসি নিভিয়া যায় তখনই।

আকাশে আরো মেঘ জমিতেছে। আরো কতদিন বর্ষা লাগিয়া থাকিবে বাংলা দেশের গ্রামে?

নঈমা কোথাও যায় নাই, আসেক্‌জানের সঙ্গে সে বাগ-বিতণ্ডা করিতেছিল। দু-জনে মাঝে মাঝে কৃত্রিম বিবাদ চলে। গতকাল আসেক্‌জান কিছু চাল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল। তার-ই সদ্‌গতি হইতেছে।

পান্তা ভাত ছিল সকালের। দরিয়া-বিবি রান্নার আয়োজন করে নাই। আমজাদ বাঁকিয়া বসিল, সে পান্তা ভাত খাইবে না।

মেজাজ খারাপ, তবু দরিয়া-বিবি আজ চুপ করিয়া গেল। অভিমানে আমজাদ কিছুই স্পর্শ করিল না। বিছানায় শুইয়া-শুইয়া ক্ষুধার্ত্ত জঠরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

দরিয়া-বিবি ভিজা কাপড় ছাড়িয়া বসিয়া রহিল। গোয়ালে গরুগুলি খড় চিবাইতেছে। আজ আর কোন হাঙ্গামা নাই। কত নিশ্চিন্ত যেন দরিয়া-বিবি। নঈমা আসেক্‌জানের ঘরে খেলা করিতেছিল, তার

আওয়াজ কানে পৌঁছায়।

বৃষ্টির কামাই নাই।

নিদ্রিত আমজাদের দিকে চাহিয়া দরিয়া-বিবির বুকে শত তরঙ্গের আলোড়ন চলিতেছিল। বাহিরে তার কোন প্রকাশ নাই। দরিয়া-বিবি চুপচাপ বসিয়া। বহুদিনের পর যেন অবকাশ মিলিয়াছে। কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনে খুটিনাটি দিনগুলি তাই স্মরণে গাঁথা হইতেছে।

সামান্য পান্তা ভাত ছিল। দরিয়া-বিবি খাওয়ার কথা সহজেই ভুলিয়া যায়। তার-ও ঘুমে চোখ বুঁজিয়া আসে। দেওয়ালে ঠেস দিয়া দরিয়া-বিবি ঢুলিতে থাকে।

—কোথা গো, ভাবী। শব্দে চমকিয়া উঠিল দরিয়া-বিবি।

সত্যই শৈরমী আসিয়াছে। ভিজে কাপড়। হাতে একটী ন্যাকড়া কাপড়ে বাঁধা শাকের পুটুলী।

দাওয়ার উপর বোঝা রাখিয়া শৈরমী বলিল, কেন ডেকেছিলে, ভাবী ?

দরিয়া-বিবি শৈরমীর কাছে যেন ছুটিয়া আসে। ঘুম উবিয়া গিয়াছে তার।

—এই রাস্তায় যে ছায়া পড়ে না আর দিদির।

শৈরমীর রং কালো। বৃদ্ধ বয়সে চামড়া লোল হইয়া গিয়াছে। রেখা-সমন্বিত শরীরে আবার বৃষ্টি-জাত শৈত্যের জুলুম। কুঁকড়াইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে শৈরমী। বড় কুৎসিত দেখায় তার শরীর।

কিন্তু তার কণ্ঠে হৃদয়ের অপূর্ব্ব আভাস বাজে ঃ কত কাজে থাক্‌তে হয়, তোমার কাছে কী অজানা, ভাবী। বর্ষাকালে ছেলেটা-কে নিয়ে কষ্টের সীমা নেই।

এইবার রীতিমত হাঁপায় শৈরমী।

দরিয়া-বিবি গণেশ-কে কোনদিন দেখে নাই। তবু শৈরমীর দুর্দ্দশা তার কাছে বাস্তব। কোন কল্পনার প্রয়োজন হয় না তার।

—নসীব, বোন। তোমার অমন রোজগারী পুতের এমন অসুখ দিলে, আল্লা।

শৈরমী বুকে দুই হাত রাখিয়া উত্তাপ খোঁজে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে চায় না সে। দরিয়া-বিবি সহজে কোন কথা পাড়িতে দ্বিধাগ্রস্ত, কেবল দেরীর বাহানা তার।

—পুটুলীতে কী আছে, দিদি!

শৈরমী জবাব দিল, ভাবী, ক'টা শাক আছে। একটু তেল আন, একদম 'চান' করে ঘরে ঢুকব।

দরিয়া-বিবি ঘরের ভেতর হইতে সরিষা তেলের ভাঁড় আনিল।

শৈরমী তখন পুটুলী খুলিতেছে। সে এক রাশ শাক দাওয়ার উপর রাখিয়া দরিয়া-বিবির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

—আর দেবো, ভাবী।

—না, এত মেটে শাক কি খাওয়া যায়! আর কী আছে পুটলীতে?

—কিছু নেই।

কৌতূহলের ছলে দরিয়া-বিবি শাকে হাত দেওয়া মাত্র তার নীচে শামুক দেখিতে পাইল।

বেশীদূর সে অগ্রসর হইল না। দরিয়া-বিবি বুঝিতে পারে, শৈরমী-ত খুব সুখে নাই। হাঁসের জন্য শামুক লইয়া গেলে এমন গোপনের কী আছে? আর বেশী কথা জিজ্ঞাসা করিল না দরিয়া-বিবি।

—ভাবী, এবার উঠি।

—আর একটু বসো! বুড়ো হাড়ে কী এত শীত ঢুকেছে?

কৃত্রিম কোপনতার সঙ্গে বলে দরিয়া-বিবি।

শৈরমী অনুনয় করে: ভাবী, আর একদিন এসে গল্প করে যাব। যাই, ছেলেটাকে বর্ষায় ঘরে একা রেখে মন মানে না। পাছে কিছু হয়।

দরিয়া-বিবি কিয়ৎক্ষণ কোন জবাব দিল না। পিঁড়ির উপর বসিয়াছিল মাথা নীচু করিয়া তেমন-ই বসিয়া রহিল। মুখের উপর কালো ছায়া পায়চারী করে তার।

হঠাৎ এক দম্‌কা নিঃশ্বাসে দরিয়া-বিবি বলিয়া ফেলিল, দিদি, তোমার গুণধর ভাই তিন হপ্তা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে মুখ কালা করে। ঘরে বড্ড টানাটানি। একটা পুরাতন ঘড়া আছে—রেখে যদি কেউ

পাঁচটা টাকা দেয়। আমি সুদ দেব মাসে মাসে।

শৈরমী বিশ্বাস করে না। মিছিমিছি বলছ, ভাবী।

দরিয়া-বিবি হৃদ্যতার জন্যই শৈরমী-কে কোনদিন কোন দুঃখের কথা-ই বলে নাই, বরং শৈরমী-কে এক আধটা পয়সা দিয়া সাহায্যের চেষ্টা করিয়াছে, আধ পয়সার শাক এক পয়সায় কিনিয়াছে।

হৃদ্যতার এই আর এক সোপান।

আজহারের উপর দরিয়া-বিবির ক্রোধের অন্ত থাকে না।

—দ্যাখো না, দিদি। ঘর ছেড়ে পালালো। আমিও বয়েস থাকলে কাউ-কৈ নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। এমন লোক ভূ-ভারতে না জন্মায়। এমন—

শৈরমী ধমক দিয়া বলিল, কি-সব অনাছিষ্টির কথা মুখে আনছ অবেলায়, ছি ছি! তুমি-ও দিদি, সামান্য বাতাসেই হেলে পড়ো?

দরিয়া-বিবি স্তব্ধ হইয়া যায় হঠাৎ।

—আচ্ছা, ঘড়াটা দাও। অধর সাঁতের মার কাছে রেখে পাঁচটা টাকা আনব। বুড়ি দু-পয়সা সুদ চায় মাসে।

—তা-কেই দিও।

ধীরে কথা বলে দরিয়া-বিবি। দুই চোখ ছল ছল করে তার।

—বাবাজী বিয়ের সময় যৌতুক দিয়েছিল। আগে কপাল ভেঙেছিল। সেখান থেকে অতি কষ্টে ঘড়া আর পেতল-কাঁসার কটা জিনিস এনেছিলাম।

সজল ডাগর দুই চক্ষু দরিয়া-বিবির বাষ্পায়িত। থমথমে আকাশের মত মুখাবয়ব বড় সুন্দর দেখায়। পরিশ্রম-মলিন গৌর রঙ বিদ্যুতের আভাসের মত খেলিয়া গেল।

শৈরমী দুঃখ প্রকাশ করেঃ দাদার এমন উচিত হয়নি। ভাল-ঘরের বউড়ী বাইরে বেরোয় না, সংসার দেখবে কে?

—তুমি-ই বলো দেখি, দিদি।

দরিয়া-বিবি কয়েক মিনিটের জন্য ঘরে ঢুকিল। যখন বাহির হইল তার হাতে একটী পুরাতন পিতলের ঘড়া।

মাটীর উপর রাখা-মাত্র ঠুন শব্দ হয়।

শৈরমী বার বার ঘড়াটী পরীক্ষা করিতে লাগিল।

— দেখব ভাবী, যদি দু-এক টাকা বেশী দেয়। যে মজবুত জিনিস।

বৃষ্টি থামিয়াছিল কিয়ৎক্ষণের জন্যে।

দরিয়া-বিবি একটী পান শৈরমীর হাতে দিয়া বলিল "দিদি, আঁচলের আড়ালে নিয়ে যাও। কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন্ বলো না, আমাদের ঘড়াটা। দিব্যি রইল, দিদি"।

—ভাবী, এতদিনে আমাকে এমন কাল-কেউটে ঠাউরালে! অদেষ্ট খারাপ না হোলে ঘরের লক্ষ্মী পরের ঘরে কেউ রেখে আসে!

শৈরমী উঠিয়া পড়িল। আবার বৃষ্টি শুরু হইয়াছে। দরিয়া-বিবি তখনও ঘড়াটী নাড়াচাড়া করে। কত অনিচ্ছার প্রতিরোধ মনে, তবু ধীরে ধীরে পিতলের সামগ্রী শৈরমীর হস্তে তুলিয়া দিতে হইল।

—কাউকে বল না কিন্তু, দিদি। আমার মাথার দিব্যি।

শৈরমী চলিয়া গেল।

সামান্য চাল আছে, আমজাদের জন্য ভাজা হইবে। রাত্রে আর কিছুর ঝঞ্ঝাট নাই দরিয়া-বিবির।

দূরে মেঘ-গর্জ্জন প্রান্তর পার হইয়া ভাসিয়া আসে। সবুজের বন্যায় তরুলতা লুটোপুটি খায়।

অবেলার মৌন আকাশ দরিয়া-বিবির মুখের উপর বার বার ছায়া ফেলে।

* * * *

এই দুর্দ্দিনে চন্দ্র কোটাল অনেক সাহায্য করিল। একটা কানা-কড়ি সে দেয় নাই। গতরের মেহনৎ আর সহানুভূতির কোন মূল্য নিরূপণ করা যায় কী? আরো দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আজহারের কোন পাত্তা নাই। বর্ষায় গোবর হইয়া যাইত এতদিন পাকা আউশ-ধান। চন্দ্র কোটাল মুনিশ করিয়া নিজে সব খড় আজহার খাঁর ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। এবার ভাল ধান ফলে নাই। তবু বর্ষার পর দু-মাস কোন রকমে কাটিয়া যাইবে। দরিয়া-বিবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বুক

বাঁধে। চন্দ্র কোটালের উপদেশেই সে কারো দেনা শোধ করিল না। দু মাসে যদি আজহারের সংবাদ না আসে—যদি আর কোন দিন-ই না আসে। কুটীল হতাশার চক্র-রেখায় নিষ্পিষ্ট হইতে থাকে দরিয়া বিবি।

আমজাদ একদিন মক্তব হইতে ফিরিয়া বলিল, মা, মৌলবী সাহেব মাইনে চেয়েছে।

দরিয়া-বিবি বিরক্ত হয়ঃ থাক্, রোজ রোজ তাগাদা করতে হবে না মৌলবী সাহেবকে। কাল থেকে আর মক্তবে যাস্‌নে।

আমজাদের মুখ শুকাইয়া যায়।

দরিয়া-বিবি একরাশ ক্ষুদের কাঁকর চয়ন করিতেছিল। আমজাদের দিকে চাহিয়া তার বিরক্তির ছায়া অদৃশ্য হয়। মুখ গম্ভীর করিয়া দরিয়া-বিবি বলে, মৌলবী সাহেবকে বল্ আমার বাপ এলে সব চুকিয়ে দেব।

আমজাদ তবু নড়িল না। সে জানে, মা ঐ এক বাক্যে বহুদিন মৌলবী সাহেব-কে স্তোক দিয়াছে।

সাহসের উপর ভর দিয়া আমজাদ মার কথার প্রতিবাদ করিল, তুমি ত রোজ ঐ কথা বলো।

দরিয়া-বিবি অবনত মুখে কাঁকর বাছিতে থাকে, আমজাদের দিকে আর চাহিয়া-ও দেখে না।

আমজাদ গুটিসুটি মারিয়া মার গতিবিধি লক্ষ্য করে শুধু।

বহুক্ষণের নিস্তব্ধতা জগদ্দল ঠেকে আমজাদের নিকট। উস্‌খুস করে সে।

দরিয়া-বিবি তার পুত্রের অস্তিত্ব যেন বিস্মৃত হইয়াছে।

—মা।, হঠাৎ ডাকিয়া ফেলে আমজাদ। আড়ষ্ট ঠোঁট হইতে কোন রকমে নিঃসৃত।

গম্ভীর দুই নেত্র প্রসারিত করিয়া দরিয়া-বিবি একবার পুত্রের দিকে চাহিল মাত্র।

—মা।

আমজাদের সম্বোধন আরো বাড়িয়া যায়।

এবার তীক্ষ্ণস্বরে জবাব আসে, কী ?

—মা।

—না। কাল থেকে আর মক্তবে গিয়ে কাজ নেই। ঢের হোয়েছে লেখা-পড়া।

আমজাদ মনে উল্লসিত হয়। মক্তবের ছেলেদের ভাল লাগে। মক্তব তার আদৌ ভাল লাগে না।

—তবে কি করব, মা?

ব্যঙ্গস্বরে জাবাব দিল দরিয়া-বিবি : কী করবি আবার! চাষার ছেলে জাত-ব্যবসা ধরবি।

আমজাদ এইবার মাথা হেঁট করে। কৃষির মত কঠোর পরিশ্রমে কোন সম্মান নাই।

মুখের হাসি অম্লান রাখিয়া সে জবাব দিল, আমি এই আট বছর বয়সে লাঙল ঠেলতে পারব?

— তোর ঘাড় পারবে।

আমজাদ ভয় পায়। মা রীতিমত ক্রুদ্ধা।

এমন সময় হঠাৎ চন্দ্র কোটালের ডাক শোনা গেল দহলিজে।

আমজাদ হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল।

এমন-ই আসিয়াছে কোটাল। আজহারের কোন সংবাদ পাওয়া গেল কি না। নিয়ামতপুরে ধান ব্যবসায়ীরা প্রায়-ই যায়। তারা কোন খোঁজ দিতে পারে নাই। অত বড় গঞ্জে আজহার খাঁর মত নগণ্য মানুষের তালিকা কোথাও লেখা থাকে না।

আমজাদ কোটালের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিল। একটু পরে দহলিজের আড়াল হইতে দরিয়া-বিবি নিজেই কোটালকে ডাকিয়া বলে, কোটাল মশায়, আমজাদের একটা বন্দোবস্ত করে দিন।

চন্দ্র অবাক হইয়া যায়। আজ পর্দানশীনা দরিয়া-বিবি নিজেই কথা বলিতেছে।

লজ্জায় চন্দ্র কোটালের কণ্ঠস্বরে তার স্বাভাবিক গমক থাকে না।

—কেন, কী হোলো, ভাবী?

—গরীবের ছেলে খামখা মক্তবের মাইনা গুণে লাভ কী?

চন্দ্রের স্বাভাবিক রসিকতা-পটু কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল সে।

—তা ঠিক। তবে দু-এক বছর দেখা উচিত। ঐ ত কচি ছেলে।

—না, যখন বেশীদূর টান্‌তে পারব না। খামাখা টাকা খরচ করে লাভ নেই।

চন্দ্র আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিল না।

—ভাবী, বরং আমার সঙ্গেই থাকুক। মাছ-ধরা নৌকো-বাওয়া শিখুক।

দরিয়া-বিবি রাজী হইয়া গেল। ঐটুকু ছেলে এখন-ও সাঁতার শেখে নাই। সে নৌকা বাহিবে? চন্দ্রের উপর সব নির্ভর করা চলে।

পান খাইয়া আমজাদ-কে একটু আদর করিয়া চন্দ্র কোটাল গাঁয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

পরদিন সকালে আমজাদ অবাক হইয়া গেল। একটী ছোট লগী হাতে মা কোটালের নিকট পুত্র-কে প্রেরণ করিতেছে। সত্যই নৌকার জীবন আরম্ভ হইবে নাকি!

মার দৃঢ় মুখাবয়ব দেখিয়া আর কোন আপত্তি করিল না আমজাদ। সামান্য মুড়ি কোঁচড়ে সে নদীর পথ ধরিল।

দু-বছর আগেও দরিয়া-বিবি এমন ঘটনা-স্রোতের কল্পনা করে নাই। কত স্বপ্ন ছিল তার চোখে শিশু-পুত্র লইয়া।

তুমি কি আর স্বপ্ন দেখো না, দরিয়া-বিবি?

৯

মৌন মহিমায় বর্ষার আকাশ জাগিয়াছিল তারা-ক্ষত অন্তর লইয়া। মফস্বল শহরের অন্তঃপাতী গণ্ডগ্রাম। সড়কের এক টেরে আজহার ও কয়েকজন রাজমিস্ত্রী বাসা ভাড়া লইয়াছিল।

ষ্টেশনে যাত্রী পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য এই অঞ্চলের শেষ বাস্ বহুক্ষণ সড়কের উপর টায়ারের দাগ আঁকিয়া গিয়াছে।

আজহার একমনে তখনও নারিকেলী হুঁকা টানিতেছিল। কল্কের দমের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ফুল্‌কি ওড়ে বাতাসে। কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্ধকার সরিয়া যায়। বাসার দরজা চোখে পড়ে। আজহার চৌকাটের উপর।

বাসার আয়তন সংকীর্ণ। একদিকে মাত্র ছোট জানালা। মাটীর দেওয়ালে চূন-বালি ছোপানো, কোথাও কোথাও রং ধ্বসিয়া গিয়াছে। মেঝে সুসমতল নয়। তারই উপর মাদুর পাতিয়া আজহারের সঙ্গী ঘুমাইতেছিল। সারাদিন বৃষ্টির পর ভ্যাপ্‌সা গরমে ঘরের ভেতর আজহারের দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। কিছুক্ষণ পূর্বেই বিছানা ছাড়িয়া সে চৌকাটে ধোঁয়ার আসর জমাইতে মগ্ন হইয়াছিল।

সড়কের পাশে একটী ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছিল। এই অঞ্চলে ভয়ানক মশা। গা উলঙ্গ করিয়া শোয়া-বসার উপায় নাই। নিস্তেজ ক্লান্তির ছায়ায় কল্কে টানিতে টানিতে তার চোখ বুঁজিয়া আসে। আশেপাশে মশা ভন্ ভন্ করে। এক একবার গামছার ঝট্‌কা মারে, আজহার আবার ধোঁয়ার সঙ্গে মিতালি চলে।

সড়কের গাছ-পালায় অন্ধকার জমিয়া রহিয়াছে। শীতল রাত্রির ডাকে জোনাকীদের চোখ নিদ্রাহীন। পানা-পুকুরের ধারে এই নিরীহ পতঙ্গের দেয়ালি-উৎসবে কোন ছেদ পড়ে না।

ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আজহার নিরীহ চোখ দিয়া চারিদিক অবলোকন করে। পঙ্গু মন তার নিঃসাড় হইয়া গিয়াছে। চিন্তার এলোমেলো জটাজাল অন্ধকারে হামাগুড়ি দেওয়া পর্যন্ত বিস্মৃত। কোন কিছু মনে পড়ে না আজহার খাঁর।

নিয়ামতপুরে দু-দিন ছিল সে মাত্র। কাজ জুটিয়াছিল ভাল। কয়েক সপ্তাহ কাজ চলিত স্বচ্ছন্দে। জায়গাটা খুব পসন্দ-সই নয়। ইতর মাতালদের আড্ডা তার ভালো লাগে নাই। এখানের অন্যান্য রাজমিস্ত্রী বড় বদ চরিত্রের। সামান্য দু'দিনের রোজগার ট্যাঁকে গুঁজিয়া আজহার পথে পাড়ি দিয়াছিল। কাজ কোথাও না কোথাও জুটিবেই, ভরসা ছিল তার। সড়কের পথেই নূতন ইমারতের কাঠামো দেখিয়া সে আশান্বিত বুকেই এখানে গৃহস্বামীর উমেদার হইয়াছিল। সঙ্গী-মিস্ত্রীরা লোক মন্দ নয়। রোজ কম। তবু আজহার কোন প্রতিবাদ করে নাই, সহজেই সে কাজে লাগিয়াছিল।

গ্রামের নাম শাহানপুর। দু-মাইল দূরে ষ্টেশন। তারই আবহাওয়ায় গ্রাম ও শহরের যৌথ লীলা-ভূমিরূপে জায়গা মন্দ নয়। আজহারও আকর্ষিত হইয়াছিল।

রেল-ষ্টেশন মাত্র বছর দুই আগে খোলা হয়। এখনও বহু ব্যবসার ভবিষ্যৎ এই গ্রামে উঁকি মারিতেছে। কয়েকদিন অবস্থানের পর আজহার তাহা নীরবেই উপলব্ধি করিয়াছিল। যদি কোন পুঁজি জমানো যায়! আজহার তাই কায়ক্লেশে রীতিমত কৃচ্ছ্র-সাধনা আরম্ভ করিয়াছিল।

সারাদিন খাটুনির পর আজ শরীর ভাল ছিল না, তার উপর বাসার ভেতর ভ্যাপ্সা গরম। সব মিলিয়া বড় অস্বোয়াস্তি বোধ করিতেছিল আজহার। তার কোন স্পষ্ট চেতনা কিন্তু দাগ কাটে না কোথাও। নীরবে তাই সে হুঁকা পান-ই করিতেছিল। কয়েকবার হাই উঠিল। আজহার খাঁ নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকে। তামাক প্রায় নিঃশেষ। অন্যদিকে হুঁকার আওয়াজের কামাই নাই।

স্মরণের প্রান্তর নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে কালো অন্ধকারের প্রলেপে।

শিরার দ্রুত কম্পন রাত্রির তরঙ্গশীর্ষে ঈষৎ ঝিলিকের রেখা টানিয়া আবার শান্ত হইয়া আসে।

প্রাগৈতিহাসিক বর্ব্বরের আলস্য-মুখর অদ্ভুত বিরাম-আকাঙ্ক্ষা আজহার খাঁর মেরুদণ্ডে ঘা দিয়া গেল।

এইবার জোরে কল্কে ফোঁকে আজহার। তামাক না-দারাৎ। অসন্তুষ্ট চিত্তে সে কল্কে চৌকাঠের কোণে রাখিয়া দিল।

আর এক চিলিম পাইলে মন্দ হইত না। সে হাই তুলিল।

হঠাৎ আজহার তার পাশেই আর একজনের উপস্থিতি অনুভব করে। অন্ধকারে অপরিচিত মানুষটী।

আজহার মৃদু কণ্ঠে ডাকে ঃ কে ?

—আমি, চাচা।

একটী বালকের কণ্ঠস্বর অন্ধকারে ঢেউ তোলে।

—খলিল, এত রাত্রে বাইরে এসেছো ?

জিজ্ঞাসা করে আজহার।

—ঘুম ধরে না, চাচা।

ফোঁপানির শব্দ আসে আজহার খাঁর কানে।

খোঁয়ারি ভাঙিয়া যায় তার। কার কণ্ঠনালী-দুমড়ানো এই শব্দ, প্রথমে আজহার স্থির করিতে পারে না।

নিবিড় অন্ধকার। চৌকাঠের অপর দিকে আজহার হাত বাড়াইয়া দিল। খলিলের নাগাল পায় সে। হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজিয়া সে বসিয়া আছে। এতক্ষণ এই অবস্থায় সে ধীরে ধীরে জবাব দিতেছিল তবে।

আজহারের সঙ্গী মিস্ত্রীর নাম ছিল ওদু। তারই ভাইপো খলিল। বয়স বারো হইবে কি না সন্দেহ। বালক-বয়সেই চাচার সঙ্গে ছুতার-মিস্ত্রীর কাজ শেখার জন্য এই প্রবাস-জীবনের গ্লানি বহন করিতেছে।

আজহার খলিলের নিকটে সরিয়া আসিল। তার গায়ে ঈষৎ নাড়া দিয়া সরস কণ্ঠে আজহার সম্বোধন করে, কি হোয়েছে, চাচা ?

খলিল মাথা তুলিতে চায় না। হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজিয়া যেন বিশ্বের সমস্ত কলঙ্কের নিকট হইতে পরিত্রাণ চায় সে।

—কিছু হয় নি ত, চাচা ?

আবার আজহার নাড়া দিয়া বলিল, মাথা তুলে কথা বলো না, কি হোয়েছে ?

খুব মৃদু স্বরেই আলাপ বিনিময় চলিতেছিল। ঘরের ভেতর সকলে দিন-মজুর। কারো ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে।

খলিল নীরব।

আজহারের কৌতূহল মিটিল না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিল।

খলিল এইবার কোন জবাব দিল না। আদুল গায়েই সে বসিয়াছিল। আজহারের হাত নিজের পিঠের উপর ধীরে রাখিয়া আবার খলিল ফোঁপাইতে লাগিল।

আজহারের আঙ্গুলের ডগায় যেন বিছা দংশন করিয়াছে। সে তড়িৎগতি খলিলের পৃষ্ঠদেশ হইতে হাত তুলিয়া লইয়া স-চীৎকার জিজ্ঞাসা করে : তোমার পিঠে এত দাগ ?

খলিল আজহারের মুখে হাত চাপিয়া ধরে : জোরে চেঁচিয়ো না, চাচা। ওদের নিঁদ ভেঙে গেলে আবার বক্‌বে।

ত্রস্ত খলিল মুখ ফিরাইয়া নিদ্রিত ব্যক্তিদের দিকে তাকায়। না, কারো কানে আজহারের চীৎকার পৌঁছায় নাই।

আজহার খলিলকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

বারবার হাত বুলায় সে খলিলের পিঠে।

কুয়াশানিদ্রিত প্রান্তর আবার জাগিয়া উঠিতেছে। মনে পড়িল বৈকি আজহারের আমজাদের কথা, নঈমার মুখ, মহেশ ডাঙার জলা-জাঙ্গাল। আর দরিয়া-বিবি ? না, আজিহারের মানসপটে পরিশ্রমপটু, সংসার-অভিজ্ঞ, সুঠাম-তনু দরিয়া-বিবির কোন ছায়া ভাসিয়া ওঠে না। হয়ত ভাসিয়া উঠিয়াছিল ক্ষণিক আলোর মলিন রেখায়। নির্ব্বীর্য এক রকমের অস্থিরতা আজহার-কে ব্যথিত করে বলিয়া সে তখন ছায়ার অন্যান্য জনতায় চিন্তার প্রহরীদের অজ্ঞাত-বাসে পাঠাইল।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া আজহার জিজ্ঞাসা করিল, কেউ মেরেছে বুঝি ?

—হ্যাঁ, চাচা।

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল আজহার।

—কচি গায়ে কার এমন 'আজারে' হাত উঠল ?

খলিল কোন জবাব দিল না। নীরবে বসিয়া রহিল।

—কে মেরেছে ?

আজহার অস্থির-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল।

খলিল অন্ধকারে চারিদিকে দৃষ্টি মেলে। তারপর আজহারের কানে কানে সে বলিল : ওস্তু চাঁচা চেলা-কাঠ দিয়ে—

ঢোক গিলিয়া খলিল আবার ফুঁপাইতে থাকে।

—এ্যাঁ, ওস্তু এমন কড়া-জান্ ?

খলিলের গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে আজহার বলিয়া যায় : কি করেছিলে তুমি যে এমন করে হাত চালায় ?

—গহর-মিস্ত্রীর সুর্ম্মী ভেঙে ফেলেছি। ইটের উপর পড়ে গেল কিনা।

গহর রাজ-মিস্ত্রী। সে-ও বাসার ভেতর নিদ্রিতের দলে। পাছে তার কানে কোন শব্দ যায়, ধরা-গলায় খলিল জবাব দিয়া চুপ করিল।

—ছোট একটা সুর্ম্মী ভেঙেছ, তার জন্য এত মার মারলে ?

ফুঁপাইয়া কান্না আরম্ভ করিল খলিল।

আড়ষ্ট উচ্চারণের মধ্য দিয়া বোঝা যায় তার আবেদন : আমি চাচার সঙ্গে বাড়ী যেতে চেয়েছিলাম কিনা।

—ওস্তু আজ বাড়ী গেছে ?

—হ্যাঁ চাচা।

আজহার সান্ত্বনা দিতে চায় ওই অবোধ বালক-কে।

—ওস্তু যাক্ না বাড়ী। আমরা রয়েছি, তোমার কোন ভয় নেই।

চৌকাঠের এক পাশে কখন সরিয়া গিয়াছে খলিল। আবার হাঁটুর মধ্যে তার মাথা গোঁজা। বিভীষিকাময়ী পৃথিবীর মুখ অবলোকনের সাহস তার নাই।

একটু পরে ঘাড় গুঁজিয়া-ই খলিল জবাব দিল : আমার এখানে মন টেকে না, চাচা।

—ব্যাটা ছেলে, কাজ-কাম না শিখিলে চল্‌বে কেন? বিদেশ ত ব্যাটা ছেলেদের জন্যই। তা মন অমন এক-আধটু খারাপ করে।

নিঃসাড় হইয়া গেল খলিল। কোন জবাব আসে না তার নিকট হইতে।

—তোমার বাপ বেঁচে আছে, চাচা?

জিজ্ঞাসা করিল আজহার।

খলিল অন্ধকারে মাথা তোলে না। ক্লান্ত-স্বর তার বাইরে আর্ত্তনাদের মত শোনায়ঃ না?

—আবার মাথা গুঁজে বসে আছো? ভাবনা কিসের। আমরা ত রয়েছি। ওহু কাল্ল-পরশু ফিরে আস্‌বে।

আজহার খলিলের দিকে হাত প্রসারিত করে। খলিল ধীরে ধীরে খাঁর পাশে সরিয়া আসিল। ক্লান্ত দুই চোখ তার সড়কের দিকে।

পরে আজহারের মুখোমুখি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিলঃ আজ দু-মাস এসেছি, চাচা। মার জন্যে মন কেমন করে-যে। ওহু-চাচা এইবার নিয়ে চার বার ঘরে গেল।

—বিদেশে থাকতে শেখো। কাজ শিখলে তবে ত বড়-মিস্ত্রী হবে। দুঃখ ঘুচবে। এই দ্যাখনা আমরা দেশে চাষবাস করতাম, শহরে আসিনি। কুকুরের হাল।

কোন আশ্বাস পায় না খলিল।

—পেট-ভাতায় ছ-মাস কাজ শিখলে তবে নাস্তার পয়সা বেরোবে। মা-কে এক পয়সাও দিতে পারি নি। নাস্তার পয়সা বেরোলে তা বাঁচিয়ে-ও কিছু পাঠাতে পারতাম।

আজহার খাঁ বিগলিত হৃদয়ে ওই দুগ্ধ-পুষ্য বালকের দিকে চাহিয়া থাকে। এত অল্প বয়সে পৃথিবীর রং চিনিতে শিখিয়াছে সে। এমন ছেলের উন্নতি আল্লা নিশ্চয় দেবেন। নসীব খুলিবে বৈকি।

পুনরায় সরব হয় আজহারঃ আর ক'টা মাস, চাচা। তারপর নাস্তার পয়সা বেরুলে তোমার মাকে টাকা পাঠিয়ো। কেন, তোমার মা কিছু করেন না?

—ধান কুটে ভাত জোটাতে হয়।

কথা সমাপ্ত করিয়া বড় লজ্জিত হয় খলিল। কুট্‌নীর ছেলে সে, এমন পরিচয় দিতে মাথা কাটা যায়। আবেগের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল খলিল।

আজহার আর কোন জিজ্ঞাসাবাদে মত্ত হয় না। নিঝুম সেও বসিয়া থাকে। এতটুকু ছেলে, মার দুঃখের সঙ্গী। তিন চার বছর পরে আমজাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়াইবে কে জানে?

মাত্র এক পলকের জন্য আমজাদের মুখ মনে পড়িল আজহারের। চন্দ্র কোটাল তাকে স্বপ্ন দেখিতে শিখাইয়াছে। তার কুয়াশা-আবর্ত্তিত ফেনিল পটে কারো মুখ আর স্থিতি পায় না। ষ্টেশনের নিকট বর্দ্ধিষ্ণু এই গ্রামে ব্যবসা-পত্তনের অশেষ সুযোগ রহিয়াছে। খোদা কি মুখ তুলে চাহিবেন না, একটি বার?

অজানিত ভীতির ফুৎকার আজহারের চিত্ত আরো অস্থির-উন্মত্ত করিয়া তোলে। তিনবার বুকে কুলহু-আল্লা পড়িয়া ফুঁক দিল সে।

খলিলের ঘন ঘন হাই উঠিতেছিল, আজহারের খেয়াল হয়। তার দিকে ফিরিয়া সে বলে, চাচা, আবার সকালে কাজে বেরুতে হবে। যাও ঘুমিয়ে পড়ো।

—তুমি ঘুমোবে না, চাচা?

অবোধ কণ্ঠের নিনাদ বড় মধুর লাগিল আজহারের কানে।

—না, চাচা। আর এক চিলিম খেয়ে শোব।

খলিল বাসার ভেতর প্রবেশ করিল। আজহার নূতন চিলিম সাজে।

ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকে শেষ রাত্রে। খণ্ড মেঘ ছড়াইয়া পড়ে গ্রাম বনানীর উপর।

আকাশের মুখ কালো হইয়া গেল এক নিমেষে।

আজহার খাঁর সিদ্ধান্ত স্থির ছিল।

সপ্তাহ দুই পরে এই বাসার নিকটে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের নিকট সে তিন টাকা দিয়া একটী ছোট চালা-ঘর ভাড়া লইল। ঘরের বারান্দা দুই-হাত

মাত্র প্রস্থে। তারই একপাশে সঙ্গী ছুতারের সাহায্যে সে একটী শেল্ফ তৈয়ারী করিল। দোকানের ঘটা ছিল বেশী। অবশ্য মাল খুব পর্যাপ্ত নয়। আজহার কোন রকমে গোটা পঁচিশেক টাকা জমাইয়াছিল। তিন টাকা লইল মিস্ত্রী; বাকী বাইশ টাকায় সুঁচ-সুতো, মেয়েদের টিপ, স্কুলের ছেলেদের পেনসিল, লজেঞ্চ—এই জাতীয় ছোটখাট মণিহারী পণ্য-সম্ভারে সে দোকান সাজাইল।

পানের দোকান সঙ্গে রাখিবারও ইচ্ছা ছিল আজহার খাঁর। আরো কয়েকটী পানওয়ালা পূর্ব্বেই আসর জমাইয়া রাখিয়াছে। তবু লোভ আছে খাঁর। ভবিষ্যতে যদি নসীবে জৌলুষ লাগে, আরো নূতন পণ্যে দোকান-ঘর চম্‌কাইয়া দিবে সে।

কয়েকদিন ভয়ানক মেহ্‌নতে কাটিয়া গেল। ষ্টেশন হইতে চার মাইল দূরে গঞ্জের উপর গোলদারী দোকান। একজন মাড়োয়ারী খুব বড় ব্যবসা ফাঁদিয়াছে। তার নিকট এই সব জিনিষ পাওয়া যায়। চার পাঁচ মাইল হাঁটার কসরৎ বাড়ে। সঙ্গী মিস্ত্রীর ধর্ণা দিতে হয়। শত অনুরোধে সে রাত্রি-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া শেল্ফ্ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে।

গহর মিস্ত্রী ব্যাপারটা সোজাভাবে গ্রহণ করিল না। আজহার চলিয়া যাইতেছে, বাসা-ভাড়া বেশী লাগিবে। সে নিরুৎসাহ করিবার বাক-অস্ত্র নিক্ষেপ করিল শত শত। একটু হিংসাও হইতেছিল বৈকি তার। গহর জানে না, পঁচিশটী টাকা জমাইতে আজহার কত নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে। বাউণ্ডেলের মত সংসারের কোন খোঁজ নাই। তার উপর কায়িক জুলুম। এত সহ্যের ক্ষমতা কয় জনার বা আছে?

গহর বলিল, মিস্ত্রী তাহ্‌লে শেষে এইখানে দোকান ফাঁদলো। দেখো, যদি পাকা বাড়ী ওঠে।

আজহার নিরীহ বেচারা। কোন জবাব দিল না। কিন্তু কথাটা সোজাসুজি তার মর্ম্মে বিঁধিতে থাকে।

—কিছু করেকম্মে খেতে হবে তো, ভাই। তাই মন গেল একটা দোকান করলাম।

গহরের রং ফর্শা, দীর্ঘতায় তাল গাছ। কিন্তু ভয়ানক পাৎলা

শরীর। অবশ্য বাঁধন মজবুত। দাঁতগুলি খুব পরিষ্কার। সে পান খায় না।

—না, তা'তে আর কী। আচ্ছা, একটা বিড়ি দাও।

আজহার সহজে রাগে না। কিন্তু গহরের কথার ঝাল সে-ও আজ অনুভব করিল।

—বিড়ি নেই, ফুরিয়ে গেছে।

মিথ্যা কথা বলিতে বাধে না আজহারের।

উঠিয়া পড়িল গহর।

—চালাও দোকান, যদি পাকা বাড়ী উঠে এক সঙ্গে কাজ করেছি বলে একদিন এসে থাকা যাবে।

গহরের পদক্ষেপের দিকে চোখ ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া যায় আজহার। মনে মনে বলিল, আমার মত হা-ভাতে গরীবকে-ও হিংসা করার লোক আছে পৃথিবীতে।

লজেঞ্চুসের বোতলের পাশে পিঁপড়া উঠিতেছিল, আজহার সে-দিকে মনোনিবেশ করিল।

একটু পরে আসিল খলিল। ভারী উৎফুল্ল সে।

—চাচা, আপনার দোকানটা বেশ সুন্দর হয়েছে। যখন লোক রাখবে আমাকে মনে করো।

আজহার স্তিমিতে হাসি হাসে।

—দোয়া করো, বাবা। আল্লার দোয়া লাগ্‌লে কতক্ষণ।

অনেক সামগ্রী খলিল কোন দিন গাঁয়ে দেখে নাই। সে বিস্মিত চোখে চারিদিকে তাকায়।

—চাচা, একা লোক আমি। গোসল করতে গেলে দোকান বন্ধ করতে হয়। তুমি মাঝে-মাঝে এসে বসো।

—হ্যাঁ, বসব চাচা। বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। ওস্তু-চাচা এবার নিয়ে যাবে বলেছে।

—বেশ, বেশ।

দাওয়ার একপাশে খলিল উপবেশন করিল।

পাশাপাশি সাজানো শিশি-বোতলের দিকে সে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত

করিতে থাকে।

আনমনা লজেঞ্চুসের বোতল হাতে তুলিয়া খলিল নাড়া-চাড়া করে।

—এতে কি আছে, চাচা ?

—লজেঞ্চুস।

—খেতে কেমন লাগে ?

—খুব মিষ্টি। একটার দাম দু-পয়সা।

আজহারের কথা শেষ হওয়া মাত্র খলিল বোতল শেল্‌ফের কোণে রাখিয়া দিল। তার হাতে শত রাজ্যের আড়ষ্টতা।

আজহার তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। দোকানদার সে। দোকান খুলিয়াছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলে, একটা খাও না, চাচা।

লজ্জিত খলিল জবাব দিল, না।

আজহার আর বিলম্ব করে না। নিজেই দু-টী মিষ্টান্ন বাহির করিয়া খলিলের হাতে দিল।

আড়ষ্টতা কাটে না খলিলের : না, চাচা, আমি মিষ্টি খাই না। আমার কাছে পয়সা নেই।

—খাও। খেয়ে ফেলো, ব্যাটা।

—তোমার দোকান চল্‌বে কি করে ?

এতটুকু ছেলে, সংসারের মার প্যাঁচ এত বোঝে। অবাক হইয়া যায় আজহার খাঁ।

হাসি-মুখে মিষ্টি খায় খলিল।

—তুমি একটু বসো, আমি মগরেবের নমাজ পড়ে আসি।

খলিল হঠাৎ কর্ত্তা বনিয়া যায়। গম্ভীর মুখে সে বসিয়া থাকে। খরিদ্দারদের সঙ্গে আলাপ করে। খুব হাসি পায় তার। এমন একটা দোকান যদি দিতে পারিত সে।

আজহার ফিরিয়া আসিলে সে সড়কের পথ ধরিল।

ছোট ডিপা জ্বলে দোকানের এক কোণে। দেখা যায় খলিল পথ হাঁটিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী গাছ-পালার ছায়ায় ঢাকা সড়ক।

অতটুকু ছেলে।

আমজাদ কি অভিমান করিয়া মহেশ-ডাঙা ফিরিয়া যাইতেছে ?

১০

শৈরমী পাড়ায় কলমী শাক বিক্রয় করিয়া দরিয়া-বৌর সঙ্গে গল্প জুড়িয়াছিল। গণেশের শরীর ভাল নয়। কয়েকদিন পূর্ব্বে দাওয়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। পঙ্গু বাম-হাত একদম অচল হইয়া গিয়াছে। শৈরমীর সামান্য অবসর পর্যন্ত নাই।

দরিয়া-বিবি দরদের সঙ্গে-ই এই বিধবার করুণ প্রাত্যহিকতার কাহিনী শুনিতেছিল। আজকাল বার-বার তারও মনে দোলা লাগে, এই জীবনের পরিণতি কোথায় পৌঁছিবে, কে জানে। আমজাদ ও নঈমার মুখের দিকে চাহিয়া দরিয়া-বৌর মুখ শুকাইয়া যায়। আজহার খাঁ কোন খবর দেয় না, কয়েক মাস হইয়া গেল।

সাকেরের মা আসিয়া জুটিল এই সময়। দরিয়া-বৌ একটী পিঁড়া আগাইয়া দিল।

—বৌ যে আর আমাদের দিকে পা বাড়াও না, মা।

দরিয়া-বিবি এক সপ্তাহ সাকেরের বাড়ী যায় নাই, লজ্জিত হয় সে।

—কত কাজ দেখ্‌ছেন না, মা। ফুরসৎ পাইনি।

সাকেরের-মা খেদোক্তি করে: আমার-ও ফুরসৎ নেই, মা। বৌ নিয়ে হাড়-মাংস পুড়ে ছাই হোতে বসেছে।

শৈরমী এই প্রসঙ্গে যোগদান করিল: কি হোয়েছে?

—দিন মাস পার হোয়ে গেল এখন-ও খালাস হওয়ার নাম নেই। কব্‌রেজ ডাকব, বৌর তাতে-ও দশ অছিলা।

দরিয়া-বৌ সন্দেহ প্রকাশ করে: দশ মাস হোয়ে গেছে! না, মা তোমাদের হিসেবে ভুল আছে।

সাকেরের মা জোর দিয়া বলিল, না, দশ মাসের বেশী হবে ত কম নয়।

শৈরমী জবাব দিল: ভাবী, অনেকের এগার মাস লেগে যায়।

দরিয়া-বিবি মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাসিতে লাগিল।

—এগার মাস কেন, আঠার মাস লাগে।

সাকেরের মার মুখ কালো হইয়া যায়। কি হাস্‌ছো, বৌ, আমার পেটে আর ভাত সেঁধোয় না।—ছেলেটা দিনদিন বিগড়ে যাচ্ছে। দাঙ্গা করতে কোথায়-কোথায় চলে যায়। ছেলের মুখ দেখলে হয়ত ঠাণ্ডা হোত।

—ও ব্যাটা-ছেলেদের দস্তুর। তোমার ভাসুর-পোর কোন খোঁজ নেই। একদিন ঝুপ করে এসে পড়বে। কি আর উপায় আছে, বলো।

শৈরমী ভরসা দিল: ঘাবড়ে যেও না, সাকেরের মা। ভগবান সুফল দিয়েছে নিচ্চয়।

—তোমার মুখে সুবন (সুবর্ণ) বর্ষুক, শৈরমী,। আমার ঘুম হয় না চিন্তায়।

দরিয়া-বিবি শৈরমীর-দেওয়া কল্‌মী শাক বাছিতে বাছিতে কথা বলিয়া যায়।

—হাসু বৌ-কে বিকেলে দেখে আসব।

—এসো, একবার।

আবার সাকেরের মা বলিল: বৌটার মনের হদিস পাওয়া মুশকিল। ছেলে-ছেলে করে গেল। আজকাল আর আমাকে ছাড়া কোথাও শোয় না। ছেলেটা এই জন্যেই বুঝি আরো বিগ্‌ড়েছে। আমিও ভাবি অয়লা-পয়লা বার এবার। পাছে কোন কষ্ট না হয়। বৌটা গোসল পর্যন্ত করে না, পাছে জ্বর হয়।

হাসু-বৌর উদরস্ফীতির আয়তন সম্পর্কে দরিয়া-বিবি প্রশ্ন উত্থাপন করিল।

—দশ-মেশে পোয়াতির মত, বৌ-মা। সর্ব্বদা হাঁই-ফাঁই করছে। হাসু-বৌ বলে, তার পেটে খুব ব্যথা। তাই হাত পর্যন্ত দিতে দেয় না। একবার দাই-কে ডেকে পাঠালাম। পেটে আঙ্গুল পর্যন্ত ছোঁয়াতে দিলে না।

—সুফল দিয়েছে, চাচি। তুমি দেখো। হয় নয়, শৈরমী বাগ্‌দিনী

বলেছিল। গণেশের মা মন্তব্য করে। বৃদ্ধা বিশেষ আশ্বস্ত হয় না। বরং দরিয়া-বিবি যেন এক বার পাড়া ভ্রমণে বাহির হয়, তার অনুরোধ জানাইল সে।

—আজ হাতে অনেক কাজ আছে, মা। কাল বিকেলে ঠিক গিয়ে তোমার বৌর রোগ ধরে আসবে।

শৈরমী আফসোস করিতে লাগিল ঃ কলি-কাল, দরিয়া-ভাবী। মানুষের খারাবীর শেষ নেই।

দরিয়া-বিবি মুখ নীচু করিয়া শাক-ই বাছিতে লাগিল। সে নিজের চিন্তায় মশ্‌গুল ছিল।

—সাকের ভাই এলে একবার পাঠিয়ে দিয়ো। তার ভা'য়ের খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুক। মনে করি চুপচাপ বসে থাক্‌বে। আর ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাব না।

—এমন-ও লোক হয় সংসারে! ছেলেপুলের মায়া পর্যন্ত নেই।

শৈরমী তোপ্‌ড়া গালে হাত রাখিয়া দরিয়া-বিবির দিকে চাহিয়া রহিল।

এই সহানুভূতি ভাল লাগে না দরিয়া-বিবির। মেজাজ তার রুক্ষ হইয়া উঠিতেছে হঠাৎ।

— একবার এসো, বৌ-মা।

সাকেরের মা চলিয়া গেল। শৈরমী এইবার ফিস্‌ফিস কণ্ঠে বলে, ভাবী আধ্‌খানা পচা সুপুরী দেবে, আজ-কাল গা মাটী-মাটী লাগে, ভাত খেয়ে কিছু মুখে দিতে পাই নে।

দরিয়া-বিবি ঘরের ভিতর হইতে শুধু সুপারী নয় তেলের বোতল-ও বাহির করিয়া আনিল।

—শৈরমী দিদি, মাথায় একটু তেল দিয়ে যাও! শৈরমী তার রেখাঙ্কিত কর-তালু প্রসারিত করিল।

মাথায় তেল ঘসিতে ঘসিতে সে বলিয়া যায় ঃ ভাবী, এই পাড়ায় এলে একটু মন ঠাণ্ডা হয়। কোঠা বাড়ীওয়ালা বামুনদের ওখানে গিয়ে দূর-ছি ছাড়া অন্য কথা শুনিনে। কপাল ধরিয়ে এসেছিলাম ভগবানের

কাছে। ছেলেটার শুদ্ধ ভগবান হাত-পা ভেঙে ফেলে রাখলে।

দরিয়া-বিবি জবাব দিল: সব জেতে (জাতিতে) ঐ এক রকমের ব্যাপার। রহিম বখ্‌শ্‌ জমিদার বলে সেবার তোমার দাদা-কে কত অপমান করে গেল শুনেছিলে তো? গরীব হিঁদু আর মুসলমান নিজের জেতের কাছেই হোক আর পরের জেতের কাছেই হোক একই রকম মান-মজ্জিদে পায়।

—আচ্ছা, ভাবী আমার মাথার কিরে—দাদার কোন খবর পাওনি? তবে চুপচাপ বসে আছো?

—তার খবরের কোন দরকার নেই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে দরিয়া-বিবি জবাব দিতেছিল।

শৈরমী চুপ করিয়া গেল। আঁচলে আধখানা সুপারী বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িল।

—জাওলা পাঁকাল মাছ পেলে নিয়ে এসো, শৈরমী দিদি। ছেলেটার পেট গরম রেখেছে।

শৈরমী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

— আর একটা কথা, ঘড়ার কথাটা কাউ-কে বলো না।

শৈরমী এইবারে হাসিয়া উঠিল।

—আমাকে পাগ্‌লী ঠাওরালে, ভাবী!

দরিয়া-বিবি লজ্জায় মুখ নীচু করে। ঘড়া-প্রসঙ্গে তার মর্যাদা কোথায় যেন আহত হইয়াছে।

—না। তবে এম্নি বলে রাখা ভালো।

শৈরমী আড়াল হইলে দরিয়া-বিবি ঝরঝর কাঁদিয়া ফেলিল। চোখের পানী স্বতঃই রোধ্ মানে না। প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল দরিয়া-বিবি। আসেক্‌জান পাড়ায় বাহির হইয়া গিয়াছে। কথা-বলার কোন লোক আর নাই। দরিয়া-বিবি শাক বাছিতে লাগিল।

আমজাদের ডাক কানে না গেলে হয়ত দরিয়া-বিবি সারাদিন শাক লইয়া বসিয়া থাকিত। আন্‌মনা-ঘোর তার কাটিয়া যায়।

—মা, এই ছাখো আব্বা চিঠি আর কুড়ি টাকা পাঠিয়েছে।

আনন্দে যেন নৃত্য করিতে পাইলে আমজাদ সন্তুষ্ট হইত। বগলে মক্তবের দপ্তর, একহাতে টাকা আর মণি-অর্ডারের কুপনের অংশ। দশদিন মাত্র আমজাদ চন্দ্র-কোটালের সহযোগীরূপে কাজ করিয়াছিল। দরিয়া-বিবির আদেশেই আমজাদ এখন মক্তবের পড়ুয়া।

দরিয়া-বিবির দুই চোখ বিস্ময়ে ভরিয়া যায়।

—সত্যি টাকা পাঠিয়েছে, কে দিলে তোকে টাকা?

—পিয়ন এসেছিল। আমার নামে আব্বা টাকা পাঠিয়েছে। আমার টিপ-সই নিল পিয়ন।

দরিয়া-বিবি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নোট দুটী পুত্রের হাত হইতে লইয়া সে নাড়া-চাড়া করে।

—ঠিকানা দিয়েছে?

—হ্যাঁ গো, মা এই ত লেখা রয়েছে।

আমজাদ জননীকে কুপনের অংশ দেখাইল, যেন মার অক্ষর-জ্ঞান কত গভীর। দরিয়া-বিবি কুপন হাতে লইয়া চক্ষুর দৃষ্টি সজাগ করিল। অক্ষর-পরিচয়ের মূল্য তার নিকট এই প্রথম কঠিন সত্যরূপে ধরা দিল।

নঈমা কখন চুপি-সারে দুইজনের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, সে 'ফুট' কাটিল, "মা, টাকা দিয়েছে, চিঠি দিয়েছে।"

দরিয়া-বিবি নঈমা-কে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিতে লাগিল। —হ্যাঁ। তোমাকে ময়রার দোকান থেকে মিঠাই কিনে দেব।

আমজাদ মুরুব্বীর মত মন্তব্য করিল: এই ত ক'মাস পরে মোটে কুড়িটা টাকা। তার চেয়ে গাঁয়ে থেকে জন খাটলে লাভ। জানো মা, আমাদের জমি ছাড়িয়ে নিতে পারে। আব্বা এসে চাষ না দিলে লোকে জমি রাখে?

পুত্রের সংসার-অভিজ্ঞ সিদ্ধান্ত দরিয়া-বিবির কাছে ভাল লাগে না, যদিও সে মায়ের-ই কথার প্রতিধ্বনি করিতেছিল।

—তুমি আর অত ফক্কর-দালালি করো না। যা' করার আমি দেখে নেব।

—আবার মাইনে দু-মাসের বাকী আছে। গম্ভীর হইয়া আমজাদ জবাব দিল।

নূতন নোটের গন্ধ শুঁকিতে লাগিল দরিয়া-বিবি। বাইরে দুপুরের সূর্য টলমল করিতেছিল। বাস্তুর নীচে তেঁতুলের বন অলস সমীরে উল্লসিত।

নোট আঁচলে বাঁধিয়া দুটী খুচরা পয়সা দরিয়া-বিবি আমজাদের হাতে দিয়া বলিল, "দোকান থেকে দু-জনে বিস্কুট কিনে খা"।

নঈমা মার কোল হইতে নামিয়া পড়িল।

আসেক্‌জান পাড়া হইতে ফিরিয়া আসিল। চৌধুরী পাড়ার কার যেন ফাতেহা ছিল আজ। আসেক্‌জান খালি হাতে ফিরিয়া আসে নাই, তার আঁচলের নীচে অবস্থিত পুঁটুলী দেখিয়া তা বোঝা যায়।

—বৌমা, তোমাদের রান্নার আগেই এসেছি। ছেলেরা আমার সঙ্গে খাবে। অনেক গোস্ত আর ভাত আছে।

—না, আমাদের রান্না হবে এখনি।

—খামাখা চাল নষ্ট করবে, মা।

নঈমা তখন চীৎকার করে বুড়ির আঁচল ধরিয়া।

—ও দাদি, বাবাজী টাকা পাঠিয়েছে।

বৃদ্ধার চোখ আনন্দে সজল হইয়া ওঠে।

—সত্যি বৌমা, খবর পাওয়া গেছে ছেলের?

—হ্যাঁ, খালা। টাকাও দিয়েছে।

আমজাদ বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, ঠিকানা পাওয়া গেছে? আমি একদিন যাব বাপজীর কাছে।

দরিয়া-বিবি কথা-কাটাকাটি পছন্দ করে না, আসেক্‌জান আনন্দবিহ্বলতায় বিস্মৃত হইয়াছিল।

—বৌমা, ছেলেরা আমার সঙ্গে খাবে দুপুরে।

—না। দোকানে যা' আমজাদ। নঈমা তুইও সঙ্গে যা'।

বৃদ্ধা ক্ষুণ্ণ-মনে নিজের ঝুপ্‌ড়ির দিকে অগ্রসর হইল। মনে মনে রাগিয়াছিল। আজ টাকার লোক সাদ্‌কার খাবারে এত ঘৃণা, ইস।

বৌমার রোখ্ সে জানে। সহজেই নীরব হইয়া গেল বৃদ্ধা।

দরিয়া-বিবি আসেক্জানের গমন-পথের দিকে চাহিয়া বার বার ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিল।

কয়েক মাস পূর্ব্বে নঈমার একটী কালি-কাপড় হারাইয়া গিয়াছিল। দরিয়া-বিবি বেদম প্রহার করিয়াছিল সেদিন নঈমা-কে।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার সে একটী কাপড় হারাইয়া বাড়ী ফিরিল। দরিয়া-বিবি আজ কিছু-ই উচ্চবাচ্য করিল না। একে সংসারে হাজার রকমের টানাটানি, তার উপর এই সব ঝামেলা পোহাইতে দরিয়া-বিবি হিমসিম হইয়া যায়। মাঝে মাঝে অগত্যা ললাট-লিপির উপর সমস্ত ক্রোধ খারিজ করিতে হয়।

সাকেরের মার অনুরোধে পরদিন বিকাল বেলা দরিয়া-বিবি অবসরের ফাঁকে পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিল। সাকের কয়েকদিন হইতে বাড়ীতে-ই আছে। রোহিণী চৌধুরী বোধ হয় প্রজা টিট করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

পাড়ার প্রবেশ-পথেই তার সঙ্গে দরিয়া-বিবির সাক্ষাৎ হইল।

—এই যে ভাবী সাহেব, হঠাৎ।

দরিয়া-বিবি হাসি-মুখে জবাব দিল ঃ কাজের জন্যে আসতে পারিনি।

সাকের গোঁয়ার ও চোয়াড় বলিয়া খ্যাত। দরিয়া-বিবির সঙ্গে তার ব্যবহার ভারী মধুর। চোখাচোখি দরিয়া-বিবির দিকে চাহিয়া সে কথা বলে না পর্যন্ত। কণ্ঠস্বর তার সম্মুখে নরম হইয়া আসে। অথচ বিনয় সাকেরের স্বভাব-বিরুদ্ধ বিশেষণ।

দরিয়া-বিবি মাথার শ্লথ ঘোমটা টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি সাকের-ভাই। মাথা-ভাঙা কাজ নেই বুঝি এখন, তাই দেখা হোয়ে গেল।

—আপনি-ও লজ্জা দেন ভাবী! লাঠি যখন চালাই, মাথা ভাঙে বৈকি। কিছু করে খেতে হবে ত। চুপচাপ বসে থাকলে কেউ চাল-ডাল যোগাবে ?

—তোমার বড়-ভাই চুপচাপ বসে নেই। সফরে বেরিয়েছে, দেখি কত মাল-মাত্তা নিয়ে ফেরে।

সাকের বিস্মিত-উল্লাসে জিজ্ঞাসা করে, বড়-ভাইয়ের খবর পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ। কোথা জাহানপুর, সেখানে আছে।

—মাশায়াল্লাহ। এমন লোক, ডুব দিয়ে এতদিন কাটিয়ে দিলে।

—তার ঘরে চাল-ডাল যোগানো আছে, ভাই। সে প্যাঁকাল মাছ সেজে বসে না থাকলে আর কে থাকবে।

সাকের হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

—গুণধর ভাইয়ের কাণ্ড দেখে হাসি পায় সকলের।

দরিয়া-বিবি ঠোঁট দাঁতে চাপিয়া জবাব দিল।

—ভাবী সাহেব চটে গেলেন। মরদ মানুষদের আপনারা ঐ রকম ভাবেন। চাল-ডাল জোটাতে তারা কম চেষ্টা করে না। চাল-ডাল না থাক্‌লে ত মুখ বেঁকে নদীর চড়া হয়ে যায়। তাই মাথা ভাঙি না মাথা পেতে দিই—এ-সব দেখবার কি সময় আছে। বড়-ভাইকে খামাখা দোষেন।

দরিয়া-বিবি হাসিমুখে বলিয়া যায়ঃ তুমি ভাই বেড়াতে বেরিয়েছো। যাও। আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। বড়-ভা'য়ের হোয়ে আর ওকালতি দরকার নেই।

—জো হুকুম ভাবী সাহেব, কুর্ণিশের ভঙ্গীতে সাকের কিছুক্ষণ পিছু হাটিয়া অন্য পথে আড়াল হইয়া গেল।

দরিয়া-বিবির হাস্য-ধ্বনি পাড়ার ঘুলি-পথে গুঞ্জরিত হয়। একটু দূরেই সাকেরদের উঠান আর লাউ-মাচাঙের প্রাঙ্গণ।

সাকেরের মা হাসির শব্দ শুনিয়া কৌতূহলবশতঃ এই দিকে অগ্রসর হইয়াছিল।

দরিয়া-বিবি-কে দেখিয়া আনন্দিত হয়।—তুমি বৌমা। হঠাৎ রাস্তায় এমন হাস্‌ছ?

—সাকের ভায়ের সঙ্গে দেখা হোলো। সে কোন দোষ গায়ে মাখে না। বড়-ভায়ের মতই। আমাকে জবার দিল, ঘাড় না ভাঙলে কেউ খেতে দেবে। সাধে কী আর লাঠি ধরি!

—ওর কথা ছাড়ো, মা। কান ঝালাপালা হোয়ে গেল ওই এক

কথা শুনে-শুনে। এসো, মা।

হাসু-বৌ শাশুড়ীর গলা শুনিয়া মাচাঙের নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বড় শীর্ণ হইয়া গিয়াছে তার শরীর। মুখ পাংশু। চোখের কোণে রক্তিমতা আছে কিনা সন্দেহ। চোখ দু'টী সদ্য-আরোগ্য রোগীর মত ভাসা ও বিষন্নতা-ক্লিষ্ট।

শাশুড়ী হাসু বৌ-কে দেখিলা জ্বলিয়া উঠিল।

—ওই যে অভাগীর বেটী, দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে কী আর আল্লা দেবে। সাকের না-হোলে আমাদের এত জ্বালাবে কেন?

হাসু-বৌ কোন জবাব দিল না। ক্লান্ত দুই চোখ মাটীর সমতলে কি যেন খুঁজিতে লাগিল।

—খামাখা রাগ করো কেন, চাচি। এমন কচি বয়স, ছেলেমানুষ। পোয়াতিকে এমন ফজিয়ৎ করলে রোগে পড়বে যে।

—রোগটা নেই কোনখানে?

দরিয়া-বিবি হাসু-বৌর নিকট অগ্রসর হইবামাত্র আতঙ্কিত চোখে সে একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

—হাসু। দরিয়া-বিবির ডাক।

—জী, বড়-বুবু।

—তোমার শরীর ভাল ত আজকাল?

—না। সংক্ষিপ্ত নম্র উত্তর।

—ক'দিনে এমন হোয়ে গেছ।

দরিয়া-বিবি পুনরায় প্রশ্ন করিল, তুমি দিনের হিসেব রেখেছিলে?

লজ্জায় হাসু-বৌ চোখ নামাইল।

—এগার মাস হোয়ে গেল। পেটে ব্যথা করে খুব নাকি?

—জী।

দেখি একবার।

—জী না, থাক।

দরিয়া-বিবি সাকেরের মার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, চাচি, তুমি পেটে হাত দিয়ে দেখোনি ছেলে নড়ে কি না? মরাছেলে পেটে থাক্‌লে,

শেষে পোয়াতি নিয়ে ভারী টানাটানি হবে।

—আমাকে ছুঁতে দেয় না, মা।

হাসু-বৌ ঘরের দিকে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাস্, হাসু।

—পিয়াস লেগেছে, বড়-বুবু।

—পানী খেয়ে শিগ্গীর আয়। শাশুড়ী আদেশ দিল। দরিয়া-বৌ বিজ্ঞের মত সায় দিতে লাগিল সাকেরের মার মন্তব্যের উপর

—বুড়ো বয়সে সংসারের ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না, মা। কোথা নামাজের পাটিতে বসে আল্লা-আল্লা করব আর ওদের জন্য দোওয়া মাঙব। না, তা আর হবে না। এই সব ঝামেলা এই বয়সে পোষায়?

দরিয়া-বিবির সহানুভূতি প্রকাশ প্রায় অন্যরূপে।

—তা কী করবে, চাচি। এইটুকু হাবা গোবা মেয়ে, তুমি না দেখ্লে সংসার চলে?

হাসু-বৌ ঘর হইতে আর বাহির হয় না। বাহিরে দুইজন অপেক্ষা করিতে লাগিল। অবশ্য তাহাদের সময় অন্য কথাবার্তায় কাটিতে থাকে।

—তুমি একটু দেখে যাও, মা। সত্যি পেটে যদি মরা ছেলে থাকে, মুশ্কিল।

—তোমার বৌ-কে ডাকো, চাচি।

শাশুড়ীর ডাকে হাসু-বৌ আবার মাচাঙের নীচে দাঁড়াইল।

অবেলার অন্ধকার আসন পাতিয়াছে লাউ-মাচার সরস মাটীর উপর। কয়েকটী চড়ুই নীল পাতার বনে কিচিরমিচির করিতেছিল।

হাসু-বৌ অবনত মুখে ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল।

দরিয়া-বিবি তার শীর্ণ হাত নিজের কর-তালুর উপর রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিতে লাগিল, হাসু, কান্না কিসের! আমি-ও মেয়ে মানুষ, তোর দুঃখ বুঝি। স্বামী বাউণ্ডেলে হোলে কোন মেয়েই সুখী হয় না।

সাকেরের মা দরিয়া-বিবির সান্ত্বনা গ্রহণ করিল না।

—মা, বাঁজা মেয়ে! ক'বছর বিয়ে হলো, একটা ছেলে হলে সাকেরের চাল-চলন বদ্লে যেত!

দরিয়া-বিবি হাসু-বৌর রক্ত-শূন্য আঙ্গুলের দিকে চাহিয়া কহিল, আমার-ও দু'টো ছেলে, চাচি। কৈ, তোমার ভাসুর-পো'র বাউণ্ডেলে-গিরি গেল? আর জোয়ান ছেলের এমন কচি-বৌ, করেছিলে কেন?

শাশুড়ী কোন জবাব দিল না।

হাসু, তোমার পেট্‌টা একটু দেখি! যদি কপাল তোর ভাঙে, ছেলেটা পেটেই মরে থাকে, তোকে বাঁচাতে হবে ত।

আরো জোর কান্নার সঙ্গেই জবাব দিল হাসু-বৌ।

—আমাকে মরতে দাও, বড়-বুবু। আমি সকলের গলার কাঁটা। আমি গোরস্থানে গেলেই ভাল।

দরিয়া-বিবি তার চিবুকে হাত দিয়ে বলিল, মুখে যা তা কথা আনিস্‌নে। দু-সাঁঝ এক। দেখি তোর পেট্।

—তোমার পায়ে পড়ি, দরিয়া-বুবু, তোমার পায়ে পড়ি। তীব্র ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে হাসু-বৌর গলা বুজিয়া আসিতেছিল। দুই হাত প্রসারিত করিয়া সে নিজের বক্ষপুট আবৃত করিল, চিলের নখর হইতে যেন বিহঙ্গিণী শাবক রক্ষা করিতেছে।

—একটু-ও লাগ্‌বে না। একবার দেখব।

হাসু-বৌ আরো পিছাইয়া যাইতেছিল।

দরিয়া-বৌ ক্ষিপ্রগতি-তে তার জঠরের কাপড় ধরিয়া এক টান দিল। একি! একরাশ বস্ত্র-খণ্ডের ঢিবি যেন ধ্বসিয়া পড়িতেছে।

এক নিমিষে মাচাঙের নীচে মূর্চ্ছিত হইয়া হাসু-বৌ পড়িয়া গেল। স্বাভাবিক তার জঠর দেশ —স্ফীতির কোন চিহ্ন নাই সেখানে।

কাপড়ের স্তূপের সম্মুখে ফ্যালফ্যাল নেত্রে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল সাকেরের মা ও দরিয়া-বিবি।

১১

আজহার হিসাবী বটে ; কিন্তু পরিবেশের কোন উপাদান সে তলাইয়া দেখিতে শেখে নাই কোনদিন। কপাল-ঠোকা গাণিতিক বিদ্যা দোকান-করার পূর্ব্বে তার একমাত্র ভরসা ছিল। পদে পদে নিজের ভুল দেখিতে পাইয়াছিল আজহার। সংসার-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এইসব ব্যাপারে তবু চোখ বুঁজিয়া বিধাতার দিকেই বার বার চাহিয়া থাকে।

ষ্টেশন হইতে সড়ক ধরিয়া বহু যাত্রী গ্রামের দিকে হাঁটিয়া যায়। তাহাদের অধিকাংশই শহর-প্রবাসী। মণিহারী দ্রব্য নগরে সস্তা পায় বলিয়া কেউ এই সব অঞ্চলে খরিদ করে না। যারা নিজস্ব গ্রামে থাকে, তারা সামর্থ্যহীন। এক মাস দোকান চালানোর পর আজহার তা নির্ম্মমভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিল। ভবিষ্যতের অন্ধকারে মায়াময় হাতছানি লুকাইয়া থাকে; আজহারের মত নামাজী পরহেজগার ব্যক্তি এই কুহকের রং-কে মনে করিত ঈমানের অঙ্গ। সুতরাং সর্ব্ব ব্যাপারে নির্ব্বিকার। দোকান খুলিয়া অবসর যাপনই একমাত্র দিন-গোজরানের শ্রেষ্ঠ পথ। আজহারের সামান্য পুঁজি ছিল, ইতিমধ্যে সে বাড়ীতে একবার টাকা পাঠাইয়াছে। অবশিষ্ট মূলধন ভাঙাইয়া ভবিষ্যতের দিগন্ত-জরীপ ছাড়া আর কোন্ পথ খোলা আছে ?

মাঝে মাঝে হাট-ফেরৎ পশারিণীরা আজহারের দোকানে ভিড় করে। তারা কোনদিন শহর দেখে নাই, শহরের জিনিষের জন্য লোভ বেশী। ক' পয়সার সওদা বা তারা আঁচলে তুলিতে পারে ? একটা সস্তা স্যালুলয়েডের চিরুণী, দু-পয়সার রঙীন ফিতা, সূঁচ-সূতা অথবা এক ডিবা আল্‌তা। কেবল গঞ্জের দিনে এই মহিয়ষীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

আজহারের ধ্যান-ধারণা, কল্পনার সৌধ এই দোকানকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। ঈমানদার লোকের দিন আট্‌কাইয়া থাকে না, আজহার এই মূলমন্ত্রটী সহজে বিস্মৃত হইত না। তাহারও দিন অতিবাহিত

হইত বৈকি! কোনদিন রান্নাই হইল না। ময়রার দোকান হইতে দু-পয়সার মুড়ি ও বাতাসায় নৈশ-ভোজ সমাপ্ত হইত। নিজেকে লইয়া আজহার খাঁর কোন লোভ ছিল না বলিয়া সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস এক মুহূর্তও টলিত না।

শুক্রবারে দুপুর-বেলা সাদা লুঙ্গী পরিয়া কিস্তী টুপী মাথায় সে তিন মাইল দূরে মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়িতে যাইত। এই সময় দোকান বন্ধ থাকিত মাত্র। নচেৎ শেষ বাস্ ষ্টেশনে যাওয়া পর্যন্ত দেখা যাইত, আজহারের দোকানে চিম্‌নীওয়ালা ছোট দেওয়াল্‌গীর বাতি জ্বলিতেছে।

দুই মাস্ কাটিয়া গেল। দোকানে কোন আয় নাই দেখিয়া আজহার আবার মিস্ত্রীদের কাজে জুটিল। গহর মিস্ত্রী সেদিন খুব হাসিয়াছিল। আজহার তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছে। এমন হিংসাতুর মন কোথা হইতে আপদের মত তার সঙ্গ লইয়াছে অকস্মাৎ, আজহার কোনদিন তা ভাবিয়া দেখে নাই। সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যায় আবার দোকান খোলা হইত। গঞ্জের দিন কাজে যাইত না আজহার। সেদিন দু'পয়সা বিক্রী হয়, তাই।

গহর মিস্ত্রী একদিন অযাচিত-ভাবে আলাপ আরম্ভ করিল।

—আজহার ভাই, আমার সঙ্গে কথা বলো না। সাধে আমি রাগ করি? কপালে মুগুর মেরে এসেছি, ভাই, এ জন্মে আর কিছু হবে না।

আজহার তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গহর বলিয়া যায়ঃ পয়সা কামাবার হেকমত আছে, ফিকির আছে, ফন্দী আছে, তা যদি না জানো, দোকান দিলেই কী পয়সা হয়?

গহরের সহানুভূতি আদৌ খাদ-মিশ্রিত নয়, আজহার বুঝিতে পারে।

—তুমি ত কথা বলবে না, খাঁ। আমি-ই বলে যাই, শোনোঃ দোকান খুলে খদ্দের ঠকাতে হবে। তার কত ফন্দী! কথায় কথায় হলফ করো, সাত-বার 'মাইরি' বলো। বলোঃ কেনা দামে বেচছি, হুজুর। যদি লাভ নিই ত হারাম-শুয়োর খাই। এম্নি করে সাত শ' শুয়োর খেলে তবে পয়সা হয়। পয়সা হোলে হয়ত হাজী সাহেব হোয়ে আস্‌তে পার। মক্কা-মদিনা ঘুরে এলে, ব্যস। সব সাফ।

গহরের পাৎলা শরীর বলিয়া কথার ভারসাম্য রক্ষার জন্য তার হাতে-পায়ে চাঞ্চল্য খুব বেশী ফুটিয়া ওঠে।

আজহার এইবার মুখ খুলিল: লাভ না নিলে কারবার চলে, ভাই?

—তা হোলেই, মিথ্যে বল্‌তে হবে। আর যদি সাচ্চা কথাই বলো,. বেশী লাভ্ হবে না, হয়ত একদম-ই হবে না। তা-তে সংসার চলে না।

কথাগুলি আজহারের খুব মনঃপূত। ভয়ানক ছোট হইয়া যায় সে। তবু যেন গোলক-ধাঁধা হইতে পরিত্রাণ পাইতে তার মন আকুলি-বিকুলি করে।

—ঈমানদার হোলে সংসার করা দায়।

—শুধু দায়, চৌদ্দ পুরুষ জড়িয়ে পড়ে শুদ্ধ। বলিয়া গহর একটী বিড়ি ধরাইল।

বাসায় আরো মিস্ত্রী কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আজহার আজ দোকান খুলিতে যায় নাই। বাসার আড্ডা তার ভাল লাগিতেছিল।

গহর ডাকিল: ওহু। ওহু আছিস—

ওহু মিস্ত্রী বাসার এক কোণে শায়িত অবস্থায় গল্পের দিকে কান খাড়া রাখিয়াছিল।

—কিরে! সে জবাব দিল।

—তোর মনে আছে, সে-বার বেলেঘাটার আড়ৎদারের কাজ করি, ব্যাটা চামার! আমাদের কি ঠকান না ঠকালে।

ওহুর শরীর ক্লান্ত, তাই সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এইবার উঠিয়া বসিল।

—গহর, সেই আড়ৎদারের নাম-ডাক কত জানিস্, দু-টো মস্‌জিদ তৈরী করে দিয়েছে এবার। অথচ আমাদের খাট্‌নীর দামটা দিলে না। কত টাকা বাকী ছিল, গহর?

—চৌদ্দ টাকা ছ'আনা।

গহর বিড়ির ছাই টোকা দিয়া ফেলিয়া পুনরায় কহিল, ব্যাটা চৌদ্দ বছর দোজখে জ্বলবে।

আজহার জবাব দিল, তা কী আর হয় ভাই। কেরামিন, কাতেবিন আমাদের গোনা আর নেকীর কথা লিখ্ছে। হাশরের ময়দানে যেদিন বিচার হবে, দাঁড়ি-পাল্লার ওজন করে দেখ্বে নেকী আর বদীর কোন্ পাল্লা ভারী। চৌদ্দ টাকা মেরে মসজিদ দিলে কোন গোনা থাকে না, নেকীর পাল্লা ভারী হোয়ে যায়।

গহর ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল, আজহার-ভাই তোমার 'ওয়াজে'র আওয়াজ বন্ধ করো। চৌদ্দ টাকায় মসজিদ হয়? কত চৌদ্দ জনের কত চৌদ্দ টাকা মেরেছে তাঁর খবর রাখো?

আজহার সায় দিল: ঠিক বলেছ, ভাই! আমি অন্য কথা ভাবছিলাম কি না।

— ঐ রকম ভাব্লে আর দোকান চলে না। মসজিদ-ওয়ালা আড়ৎদারের মত ভাবো, জাল-জোচ্চোরি শেখো, কপাল খুল্বে।

— তৌবা!

গহর মিস্ত্রী খিল খিল শব্দে হাসিয়া উঠিল। মুখ তার বন্ধ থাকে না।

—তবেই তুমি কারবার চালিয়েছ। জুম্মার দিনে দেখি তোমার দোকান সারা দুপুর বন্ধ পড়ে থাকে,—খদ্দের যা আসে তা ওই সময় আসে—তখন দোকান বন্ধ রাখলে চলে?

আজহার সহসা উত্তেজিত হয় না। আজ ঝোঁকের মাথায় সে প্রতিবাদ করিয়া বসিল, একি কথা তোমার মুখে, গহর ভাই! আমার এবাদতের চেয়ে পেট এত বড়!

— অত ঈমানদার হোলে ফকিরী নিতে হবে।

আবার ব্যঙ্গের হাসি গহরের কণ্ঠে। একটু দম লইয়া সে ডাক্ দিল: খলিল, চাচা, একটু তামাক সেজে আন।

বাসার এক কোণায় রান্না চলিতেছিল। খলিল তরকারীর হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছিল। বয়সে ছোট বলিয়া বাসার সকলের ফাই-ফরমাস তাকে শুনিতে হয়।

—দিচ্ছি, চাচা।

গহর অবশ্য খলিলের চাচা নয়, ওদের সঙ্গে একত্র কাজ করে

বলিয়া সে আত্মীয়তা গুছাইয়া লইয়াছে।

—ধোঁয়া দে বাবা, ধোঁয়া দে। আর এ-সব ভাল লাগে না।

খলিল তামাক সাজিয়া আনিল।

গহর কল্কে আজহারের হাতে দিয়া বলিল, খাঁয়ের পো তুমি-ই প্রথমে আরম্ভ করো।

থাক, তুমি শুরু করো। নরম সুরে জবাব দিল আজহার।

গহর অত্যন্ত বিনয়ী এখন, কল্কে গ্রহণ করিল না।

আজহার কয়েক টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতেছে আরামে চোখ বুঁজিয়া। তখন গহর সহাস্যে আবার বলিতে থাকে, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দাও, খাঁয়ের পো। বড় কঠিন ঠাঁই দুনিয়াটা।

নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল আজহার। সে চোখ বুঁজিয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

ওদু-ও কল্কের প্রত্যাশী, আজহারের মুখের দিকে সে চাহিয়াছিল। খলিল কর্ত্তব্য-স্থলে ফিরিয়া গিয়াছে। চুলায় চেলা-কাঠ জ্বলিতেছিল, আগুনের আভায় দেখা যায় তার মুখ ঘামিয়া উঠিয়াছে।

গহর কল্কে হাতে লইয়া আবার কথাবার্ত্তা শুরু করে। জীবনের অভিজ্ঞতা তার অফুরন্ত। ব্যবসা-জগতের বহু মানুষ, মিস্ত্রীরূপে সে দেখিয়া আসিয়াছে। উপনীত মন্তব্য তার সব জায়গায় এক: ঈমানদারের জায়গা নাই সংসারে।

আজহারের পকেটে তস্‌বী থাকে। ঠোঁটের এত তোড়ের মধ্যে সে এক-একটী দানা টিপিয়া লইতেছিল। অবাক হইয়া যায় আজহার, এই বয়সে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে গহর।

—ওদু!

ওদু আবার আড় হইয়া শুইয়াছিল বিছানার উপর। সে নিদ্রিত কি না তার-ই পরীক্ষা লইল গহর।

—কি রে।

—ওদু, শোন একটা মজার গল্প। সেবার আমি হাওড়ায় থাকি। এক ব্যাটা এসে বলে, মিস্ত্রী, আমার কাছে তোমার পাঁচ সাত দিনের

কাজ হবে 'ফুরোণে' ঠিক করে নাও। পাঁচ টাকা রফা হলো। আমি টাকা চাইতে বলেঃ এই-ত কাছে-ই আমার বাড়ী। দশ টাকার নোট আছে, খুচ্রো নেই। তুমি পাঁচটা টাকা দাও, আমি দশ টাকা বাডী থেকে দিয়ে দেব। আমার সঙ্গে এসো। যো হুকুম। পাঁচটা টাকা তার হাতে দিলুম। মিনিট দশেক দু'জনে হাঁটার পর সে বললে, ঐ আমার বাড়ী। তুমি দাঁড়াও বাইরে, আমি টাকা আনি। মুসলমানদের ঘর, বাইরে চটের পর্দা ঝুল্ছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে-ই রইলাম। এক ঘণ্টা গেল, সে-আর আসে না। শেষে চেঁচামেচি জুড়ে দিলাম। একটা আধ-বয়সী মেয়ে বেরিয়ে এলো ডিপা হাতে। কা'কে চাও? বাড়ীওয়ালাকে, জবাব দিলাম। মেয়েটা হেসে বলে, এখানে বাড়ীওলী থাকে বাড়ীওয়ালা থাকে না। আমি ত অবাক! গলির ওপাশ দিয়ে রাস্তা আছে, আমার বাড়ীওয়ালা সে পথে পগার পার।

ওহু রস-নিষিক্ত গল্পের মহিমায় বোধ হয় আবার উঠিয়া বসিল। মৃদু হাস্যে সে বলে, তারপর?

—তারপর ঘোড়ার ডিম। বোকার মত ভ্যাল ভ্যাল চেয়ে থাকা।

—বাড়ীওয়ালীর কাছে অপেক্ষা করলে না?

—শুধু হাতে আর অপেক্ষা চলে না। শোনা আরো আছে। বছর সাতেক পরে পোস্তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, দেখি একটা বড়ো কারবারী বসে আছে। আমার চোখে ধাঁধা লেগে গেল, সে-ই লোকটা গদীর উপর আর কত কর্ম্মচারী চারপাশে।

ওহু তুড়ি মারিয়া বলিল, শেষে টাকা আদায় করলে বলো তা-হলে।

—আদায়! অবিশ্বাসের হাসি গহরের কণ্ঠে।

—ভয়ে পালিয়ে এলাম। আমার ময়লা চিরকুট কাপড় আর এই চেহ্রা, সেখানে থ' দিতে পারি?

আজহার তস্বী টিপিলেও গহরের দিকে তার ষোল আনা খেয়াল ছিল।

—লোকটা ঠিক চিনেছিলে?

—আলবৎ। কাব্‌লীদের মত আমার চোখ। অত ভুল হয় না খাঁয়ের-পো। ঐ রকম জুয়াচ্চোরী ফন্দী এঁটে 'শেঠ' হোয়ে বসেছে এখন। ঈমানের কাল আছে আর?

—তা-হলে বে-ঈমান না হোলে তুনিয়ায় বেঁচে থাকা যায় না। আর কোন উপায় নেই?

আর্ত্তনাদের মত শোনাইল আজহারের প্রশ্ন। গহরের মুখের দিকে এমন বিষণ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া চাহিয়া রহিল যে, গহর চোখ ফিরাইতে বাধ্য হইল। সে-ও এবার গম্ভীর হইয়া যায়, কণ্ঠে তার আভাস ফুটিয়া উঠিতেছিল।

—উপায় যদি জান্‌তুম, তা হোলে এই দশা! আমার বিদ্যে কুলোয় না।

হতাশার তীব্র ব্যঞ্জনা মানুষের কণ্ঠস্বরে এমন করিয়া সহজে বাজে না। রূপ কথা শুনিতে শুনিতে তার বাস্তব পটক্ষেপ যেন কাহিনী-কার ও শ্রোতার সম্মুখে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে, রূপকথা তাই আর জমিতেছে না; সভায় বোবার মত সকলে তুই চোখ খুলিয়া কেবল চাহিয়া রহিয়াছে, যার গহনে শুধু বিস্ময়, ভয়, আরো ভঙ্গুর মানস-বুদ্বুদের জনতা।

সকলেই চুপচাপ। ঘরের কোনে জ্বলন্ত চুলার উপর হাঁড়ির ভেতর চুঁই চুঁই শব্দ উঠিতেছিল কেবল।

আজহার যন্ত্রচালিতের মত তস্‌বীর দানা এক এক করিয়া টিপিয়া যাইতেছিল। দ্রুত চলে তার আঙুল। গহর পর্যন্ত কেন নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে? সেও জবাব দিতে পারে না।

খলিল বাহিরে গিয়াছিল ভাতের ফ্যান গড়াইতে। তার অদ্ভুত চীৎকার শোনা গেল। আজহার ঈষৎ তড়িত-স্পৃষ্টের মত হঠাৎ বলিয়া উঠে, গহর, বাইরে কী হোলো?

স্ব-স্ব পৃথিবীতে সবাই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ওহ্‌, গহর আজহার তাড়াতাড়ি বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

খলিল তখন ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। এক পাশে ভাতের হাঁড়ি বসানো।

—কি হোয়েছে? সকলের মুখে ওই এক কথা।

—আমার হাত পুড়ে গেছে। ও মা গো—

বয়সে ছোট বলিয়া সকলেই খলিলের মেহ্‌নতে নিজেদের বিশ্রামের আরাম খোঁজে। গহর এই দিকে বারো আনা গড়িমসী করে। নিজের ভাইপো বলিয়া ওহু একদম নবাব্‌ বনিয়া গিয়াছে।

আজহার অতি-ব্যস্ততার সহিত বলিল, ঘরের ভেতর চলো। আলোয় দেখা যাক। একটু সাবধান হোতে হয়, বাবা।

ওহু ধমক দিতে আরম্ভ করিল: এত বড় ছেলে, একটু হুঁসগুশ নেই। পরের ছেলে নিয়ে এসে মুশ্‌কিল।

গহর অন্যান্য দিন নাবালকের উপর ওহুর তম্বী উপভোগ করে। আজ সে পর্যন্ত চটিয়া গেল।

—ওহু, যা' মুখে আসে তাই বল্‌ছিস! ওইটুকু ছেলে, দেড় সের চালের ভাত পসানো চাট্টিখানি কথা নাকি! নিজে ত ছ-মাসে একবার-ও হাঁড়ি ছুঁস্‌নে।

ওহু গজর-গজর করিতে লাগিল। গহরের তুঁড় ভয়ানক ধারালো, ওহু আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

হুকুম-জারী কণ্ঠেই গহর বলিল, আমরা দেখ্‌ছি ওকে, হাঁড়িটা নিয়ে যাও ঘরে। না, কুকুরের মেহ্‌মানদারী হবে আজ।

ওহু নীরবে আদেশ পালন করিল। কিন্তু সে এমন চটিয়াছিল যে, খলিলের দিকে আর চাহিয়াও দেখিল না।

খলিলের ডান-হাতের আঙুলের আগাগুলি ফোঁসায় ভরিয়া উঠিয়াছে। গহর বার বার আফসোস করিতে লাগিল।

এসব কাজে আর হাত দিয়ো না, বাবা।

গহরের মুখে এমন সুমিষ্ট বাণী! খলিলের দগ্ধ আঙ্গুলের যন্ত্রণ সামান্য উপশম হয় যেন। তাড়ি গিলে এসেছে নাকি গহর, হঠাৎ এমন কথাবার্ত্তা?

আজহার বলিল, আমি আলু বেটে দিচ্ছি। ফোঁসার উপর দিলে

জ্বালা বন্ধ হোয়ে যাবে।

চটপট আলু বাটিতে বসিল আজহার। ততক্ষণ গহর ফোঁসার উপর তালের পাখার বাতাস করিতে লাগিল। তরকারী এখন-ও রান্না হয় নাই। হাঁড়ি লইয়া পড়িয়াছিল ওহু। এ-দিকে সে নির্ব্বিকার।

ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়া আলুর পুলটিশ বাঁধিয়া দিল আজহার। হাতের যন্ত্রণা কমিয়া আসিতেছে ধীরে ধীরে।

আজও কৃতজ্ঞতার সহিত খলিল আজহারের মুখ অবলোকন করিতে লাগিল।

নিজের মনেই সে প্রশ্ন করিল, চাচা, তোমার দোকানটা বড় হোলে আমাকে দোকানদার করবে ?

আজহার তার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল, কোন জবাব দিল না।

সম্মতির এই আর এক নূতন পদ্ধতি মনে করিয়া আরো উৎফুল্ল হইয়া উঠিল খলিল।

—আমার এই কাজ ভাল লাগে না।

ওহু খলিলের দিকে একবার চাহিয়া আবার রান্নায় মন দিল। দৃষ্টির ভেতর কার কি ছিল দেখা গেল না।

গহর এখনও হাত হইতে পাখা ফেলে নাই। মাঝে মাঝে খলিলের মুখ হইতে আ-উঃ শব্দ উচ্চারিত হইতেছিল। জ্বালা থামিলেও কব্জি পর্যন্ত টন টন করিতেছিল তার।

—আজহার-চাচা, আল্ল আপনার দোকানটার বাড় দিতো।

আজহার জবাব দিল, তোমার মুখে সুবন (সুবর্ণ) বর্ষুক, চাচা।

গহর কোন মন্তব্যের দিক গেল না, পাখা রাখিয়া উঠিয়া পড়িল সে। তার হাত মুখ ধোয়া দরকার। আজহার আবার বাতাস করিতে লাগিল।

ওহু-কে যমের মত ভয় করে খলিল। চাচা-ভাইপোয় কদাচিৎ প্রাণ খুলিয়া বাক্যালাপ হয়।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলিয়া তবু বলে, ওহু-চাচা, আমার মা-কে খবর দিও না, সে বড় কাঁদবে।

ওহু প্রথমে জবাব দিল না। কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল, না, কাল পরশু বাড়ী রেখে আসব তোকে। এখানে খামাখা বসে বসে খোরাকী খাওয়া।

প্রথমে উজ্বল হইয়া উঠিয়াছিল খলিলের মুখ, চাচার শেষ কথাগুলি তার সারা শরীরে কালি লেপিয়া দিল।

—না, চাচা, কাজ না শিখে আর ঘর যাব না।

—আচ্ছা, তাই হবে আর ভাল হবে, বলিয়া ওহু দুই ঠোঁট চাপিয়া তরকারীর হাঁড়ির ঢাক্‌নী খুলিল। শ্‌-শ শব্দ উঠিতেছিল, খলিল ক্লান্ত দৃষ্টি সেইদিকে মেলিয়া দিল।

গহর ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় পাখা হাতে লইল। সন্ধ্যার আড্ডা তার মেজাজ খারাপ করিয়া দিয়াছে, সহজে না কোন বাঁকা কথা, না বাঁকা হাসি তার মুখ-নিঃসৃত হইতেছিল।

রান্নার পর খলিলের বাসনে ডাল-তরকারী মাখাইয়া দিয়াছিল গহর। আজহার নিঃশব্দে এক-এক লুক্‌মা তার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল। দগ্‌দগে হইয়া উঠিয়াছিল এতক্ষণে খলিলের আঙ্গুলের ফোঁসা।

জুম্মার দিন। আজহার দুপুরের আগেই ভিনগাঁয়ে নামাজ পড়িতে-গিয়াছিল। আজ দোকান বন্ধ রাখিতে হয় নাই, খলিল বিপত্তির জন্য কাজে বাহির হইতে পারে নাই। সে-ই দোকান তদারক করিতেছিল। বসিয়া বসিয়া খোরাকী-খাওয়া চাচা পছন্দ করে না, তাই আজহারের নিকট সে দু-আনা মজুরী চাহিয়াছিল। অবশ্য নানা অনুনয়ের ত্রুটী করে নাই খলিল। গরীব বলিয়া সে এমন নির্লজ্জ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। একথা সে বারবার বলিয়াছিল। মজুরী লইয়া খলিল বাসায় খাইতে গিয়াছে, আসরের নামাজের সময় সে দোকানে আসিবে। আজহার চুপচাপ বসিয়াছিল। আজ খরিদ্দার বিশেষ নাই। সকাল ঝোঁক যা' সামান্য বিক্রয় হইয়াছে। জোরে বাতাস বহিতেছিল। রাস্তার ধূলায় জিনিষপত্র সাফ রাখা মুশ্‌কিল। আসবাবপত্রগুলি আজহার পরিষ্কার করিয়া আবার বিশ্রামে রত হইল।

দোকানের পশ্চাতে ঝাঁকড়া শিরীষের ডালে শন্ শন্ শব্দ উঠিয়াছিল। মেঘের রং ঈষৎ কাজল, হয়ত ঝড় উঠিতে পারে। নিরুদ্দিষ্ট আকাশের যাত্রীদের সঙ্গী হইয়াছিল এক ঝাঁক শীতেল পাখী। আজহার তার কোন সংবাদ জানিল না।

আন্‌মনা বসিয়া থাকিলে নানা রাজ্যের চিন্তা আসিয়া ভিড় করে, সোয়াস্তি পায় না আজহার।

বাতাসের স্রোত হঠাৎ মন্দীভূত হইয়া গেল। একটী কোকিলা কর্কশ শব্দ করিয়া সম্মুখে বাঁশবনের ঝোঁপে আসিয়া বসিল। একটু পরে পথের মোড়ে শীসের শব্দ শোনা গেল।

আরো নূতন পাখী আসিল নাকি? শীসের শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

সড়কের দিকে মুখ ফিরাইয়া আজহার অবাক হইয়া গেল!

চন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইবার পূর্ব্বে সে 'সুইং' শব্দে শীসধ্বনির সমাপ্তি-রেখা টানিয়া আজহারের দোকানের সম্মুখস্থ বাঁশের টাঁটির উপর বসিয়া পড়িল।

—কোটাল, তুমি?

কৌতুহলে চন্দ্র কোটালের চক্ষু-তারকা নাচিতে থাকে। আবার শীস দিয়া সে গুন গুন করিতে লাগিল:

মথুরায় ফিরে এসে
ভুলে গেছ বিন্দাবনের কথা।
আমি তোমায় চিনেছি শ্যাম,
খাইনি চোখের মাথা।

আজহার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উন্মুখ। কোটালের গান আর থামে না।

—চন্দর, একটু থামো, ভাই।

জোর-গলায় ডাকিল আজহার।

—আগে বিড়ি দাও।

পা নাচাইতে থাকে চন্দ্র।

—বিড়ি পান তামাক সব দিচ্ছি। বাড়ীর ছেলেপুলেরা কেমন আছে?

অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল আজহার : সব ভাল আছে ?

আবার গোঁপে লম্বা তা। মাথা দোলাইয়া চন্দ্র জবাব দিল, আমি তার কি জানি ?

হাতের তালু প্রসারিত করিয়া চন্দ্র মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।

ছেলেরা ভাল আছে ?

আসরের নামাজের সময় নিকটবর্ত্তী। খলিল দোকানের সম্মুখে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। এই লোকটি-কে দেখিয়া সেও হতবাক। মনে মনে ভয়ানক হাসি পাইতেছিল তার।

খলিলের দিকে নজর পড়িল চন্দ্র কোটালের।

—কার ছেলে, আজহার-ভাই ? ও বাবা, এখানে তা হোলে সংসার পেতেছ। নিকে করলে নাকি ছেলেশুদ্ধ ?

খলিল লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। আজহার অস্বোয়াস্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, চন্দর, থাম্ একটু।

—ও দোকান দেখে-শুনে মাঝে মাঝে। আমাদের এক মিস্তিরির ভাইপো।

—তাই ভালো। ঘরেও সব ভালো। আগে একটা বিড়ি দাও, তবে সব খুলে বলব।

আজহার জবাব দিল, কোটাল একটু মিষ্টি আনিয়ে দিই, তারপর বিড়ি খাও।

না, ও-সব দরকার নেই।

অগত্যা আজহার বিড়ি-দেশলাই বাহির করিয়া দিল।

চন্দ্র কোটাল নিশ্চিন্তে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, সব ভাল আছে। ভগবানের দিন ত আট্‌কে থাকে না কারো জন্য। তবে কখন-কখন দু-পায়ে চলে আর কখন হামাগুড়ি দিয়ে, চার-হাত-পায়ে চালাতে হয়।

প্যাঁচ-কষা কথা আজহারের সহজে বোধগম্য হয় না, আজ অবশ্য অপরোক্ষ অনুভূতির সাহায্যে নির্দ্দয়ভাবে সব-কিছু উপলব্ধি করিল।

খাঁ এইদিকে চতুর। মনের হঠাৎ-জাগা কোন বেদনা সে অন্য কথায় ঢাকিতে চায়।

— অনেক দূর থেকে এসেছো। চলো, একটু ঠাণ্ডা হোয়ে মিষ্টি খাও। আর কোন কাজ আছে ?

—কাজ! চন্দ্র কোটাল ভ্রূকুটী করিল।—অনেক কাজ। দোকানটার মাল-পত্র গুটিয়ে এখনই মহেশ ডাঙা রওয়ানা হোতে হবে।

আজহার অবিশ্বাসের সুরে বলিল, চন্দর, তোমাকে নিয়ে পেরে ওঠা মুশ্‌কিল।

—মুশ্‌কিল হোক আর যা' হোক। এখন শিগ্‌গীর করো।

আজহার যেন সব ঘুলাইয়া ফেলিতেছে।

—শিগ্‌গীর কেন্? দোকানটা কিছুদিন দেখব।

চন্দ্র এবার সত্যই গম্ভীর হইয়া উঠিল। ভয়ানক তিক্ত কণ্ঠেই সে জবাব দিল, ও-সব রাখো। আর লাখ টাকা কামাতে হবে না। ক'মাসে ঘরের কী দুর্দ্দশা হোল দেখে আস্‌বে চলো। জমি ক'বিঘে পর্যন্ত রহিম বখ্‌শ নিয়ে নিল। ক'দ্দিন ফেলে রাখবে সে। দরিয়া-ভাবী বলে সংসার চল্‌ছে, আর কেউ হোলে ঢি ঢি করে ছাড়ত।

আজহার লজ্জায় মাথা নীচু করিল, চোখের কোণ তার সজল হইয়া উঠিয়াছে।

—হাঁড়ির খবর হাটে ভেঙে লাভ নেই। তোমার চাদর দিয়ে এই ত কটা জিনিষ-পত্তর—বেঁধে নিয়ে, চলো সরে পড়ি।

খলিল বোবা অবোধ শিশুর মত আগন্তুক ক্ষ্যাপা লোকটীর গতিবিধি আড়চোখে লক্ষ্য করিতেছিল।

—ঢের উপায় হোয়েছে বিদেশে। চলো, মহেশডাঙা। শাক-পাত খেয়ে চোখের উপর তবু সংসারটা দেখ্‌তে পাবে।

শিকড়-বশীভূত সাপের মত আজহার আর মাথা তুলিল না।

চন্দ্র সত্যই না-ছোড় বান্দা। আজহার মৃদুভাবে নানা আপত্তি জানাইল; কিন্তু কিছু-ই টিকিল না। এক ঘণ্টার মধ্যে চাদরে মণিহারী পণ্যগুলি বাঁধা পড়িল। চন্দ্র নিজে সড়কের ওপারে এক পানওয়ালার নিকট কাঠের শেল্‌ফ ক'টা বিক্রয় করিয়া দিল। ক্ষতি হইল না এক পয়সা। সে ত আজহার খাঁ নয়।

গোঁপে তা দিয়া কোটাল জবাব দিল না, মুখ নীচু করিয়া বিড়ালের হাসি হাসিতে লাগিল।

কেমন বর্ব্বর মনে হয় চন্দ্র কোটাল খলিলের নিকট। দৈর্ঘে-প্রস্থে সুগোল, গুম্ফবিশিষ্ট কোন দৈত্য যেন হঠাৎ শাহানপুরে আসিয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া গেল। আজহার-প্রদত্ত এক মুঠো মুড়ি-লজেঞ্চুস যা একমাত্র সান্ত্বনা।

বাসায় তখনও-মিস্ত্রীরা ফিরিয়া আসে নাই। কারো সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন-ও ছিল না আজহার খাঁর। নিজের সুর্ম্মি-কন্নিক পাটা গুছাইয়া লইবার জন্য সে একবার বাসায় গিয়াছিল। খলিলের মন-মরা ভাব দেখিয়া সে সত্যই ব্যথিত হইল।

—একবার সময় এলে আমাদের গাঁয়ে এসো। মহেশ ডাঙা, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে।

—আচ্ছা, চাচা।

—অনেক দূর আগাইয়া আসিল খলিল। জল্লাদ-খানার গহ্বরে সে একজন সমব্যথী হারাইল।

চন্দ্র কোটাল দোকানের মাল-পত্র পিঠে ঝুলাইয়া লইয়াছিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে সে বলিল, ঘাবড়ে যেও না, খাঁ-ভাই। সামনে পুন্যমেতে পীরের মেলায় সব বিক্রী হোয়ে যাবে!

আজহার ছোট একটী পুঁটলী লইয়া হাঁটিতেছিল, কোন জবাব দিল না।

পড়ন্ত দিনের শেষ-ভাগ। রৌদ্র মরিয়া গিয়াছে। গাছ-পালার ছায়া দীর্ঘতর হইয়া সড়কের উজ্জ্বলতা মুছিয়া দিতেছে।

জনপদ ছাড়াইয়া চন্দ্র গান ধরিল ঃ

মথুরা ছেড়ে কোটাল যমালয়ে চলে,
মাঠে মাঠে গোপিনীরা ভাসে চোখের জলে,
ও-ও-ও-ও-ও …..।

আজহার হাসিয়া উঠিল, বলিল ঃ চন্দর, আবার ভাঁড় নাচের দলটা জমাও। গান বাঁধতে এখনও বেশ পারো।

চন্দ্র মাথা দোলায়, সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের বোঝা দুলিতে থাকে।

—দেশে মানুষের দশা ভাল থাক্‌লে চন্দর-কে কি আর এত বোঝা বইতে হয়।

ঘাড়ের বাম দিকে বোঝা ঝুলিতেছিল, কোটাল ডাহিনে লইয়া একবার ঝাঁকুনি দিল।

ওয়ো-ওয়ো-ওয়ো···শ্যাম, এত দুক্ষু দাও রে···
ধিকি ধিকি তুষের আগুন মাঠের উদাস বাও রে···

সড়কের সর্পিলতা দূরে নিয়ামতপুরে গিয়া মিশিয়াছে। আরো দশ মাইল দূরে মহেশ ডাঙা। দ্বাদশীর চাঁদ আকাশে বহুক্ষণ আগেই আসর জুড়িয়াছিল! প্রান্তরের হাহাশ্বাস বাতাসের মুর্চ্ছনায় বিলীন কোন দিনের ইতিহাস যোজনা করিতেছিল। শব্দান্বিত বিষণ্ণতা জলা-জাঙালে।

চন্দ্র শীষ দিতে লাগিল ঃ শ-ওয়ো-ওয়ো-ওয়ো—

১২

অঘ্রান মাসের ভোর-বেলা। দরিয়া-বিবির ঘুম ভাঙিয়াছিল অনেকক্ষণ। ধান-সিদ্ধ করিবার জন্য রাত্রির বিশ্রামটুকু বহু আগেই তাকে বির্জ্জসন দিতে হইয়াছে।

সামান্য শীত পড়িয়াছিল। তরল কুয়াশায় আচ্ছন্ন গাছ-পালার উপরে নিষ্প্রভ তারকার দ্যুতি তখন-ও মিটিমিটি জ্বলিতেছিল।

দরিয়া-বিবি সিদ্ধ ধান আঙিনার একদিকে ঢালিয়া রাখিতেছিল। ডাবা হইতে ভিজে ধান হাঁড়ি ভর্তি-করার সময় ভয়ানক শীত ধরে। চুলার নিকটে অবশ্য উত্তাপ পাওয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য।

রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই। বার বার হাই উঠিতেছিল দরিয়া-বিবির। আজহার-নঈমা ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আসেক্ জানের কাছে আমজাদ এখনও নিদ্রায় অচেতন। দরমায় মাঝে মাঝে মোরগ ডাকিতেছিল। বড় কর্কশ মনে হয় তার শব্দ।

চুলায় জ্বাল দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দরিয়া-বিবি। মাস চার পরে নূতন সন্তানের জননীর শিরোপা মিলিবে, এই চিন্তা বার বার পীড়া দিতেছিল তা-কে। স্ফীত জঠর লইয়া পরিশ্রমের কামাই নাই। দরিদ্রের গৃহে ইহারা কেন ভিড় করিতে আসে? নঈমার চোখের পিঞ্চুটী ভাল হইতেছে না। যদি অন্ধ হইয়া যায় সে। গরীব মেয়ের হয়ত বিবাহ-ই হইবে না। সদরের দাতব্য হাসপাতাল পাঁচ মাইলের পথ। অতদূর কচি মেয়ে হাঁটিয়া যাইতে পারিবে? আমজাদের মক্তবের পড়া শেষ হইয়া যাইবে এই বৎসর। তার আগামী শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। চন্দ্র-কোটাল জমিগুলি নিজের নামে বিলি করিয়া লইয়াছিল বলিয়া তবু চাষাবাদের জীবিকার সম্বল রহিয়াছে—নচেৎ তা-ও ধূলিসাৎ হইত।

হঠাৎ পেটে ফিক-ব্যথা ধরিয়াছিল দরিয়া-বিবির। চুলার আগুনে তার ফ্যাকাশে পাষাণ-স্তব্ধ মুখটী আরো কালো হইয়া গেল। পেটের কাপড় খুলিয়া চুলার উত্তাপ লাগাইতে রত হইল দরিয়া-বিবি। আরো জাঁকিয়া আসে ব্যথা। এখন-ও দু'হাঁড়ি ধান সিদ্ধ করিতে হইবে। দরিয়া-বিবির মুখে কোন আর্ত্তনাদের শব্দ উত্থিত হইল না। উঠানে সিদ্ধ-ধানের স্তূপ, তখন-ও উত্তপ্ত ধোঁয়াটে বাষ্প উত্থিত হইতেছে। দরিয়া-বিবি তাড়াতাড়ি তারই উপর ঈষৎ জঠর চাপিয়া শুইয়া পড়িল। বার বার আশঙ্কিত হইতে লাগিল এখনই সে হয়ত অজ্ঞান হইয়া পড়িবে।

একটু আগে শীতে শরীর কাঁপিতেছিল। এখন সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিয়াছে। কপালে স্বেদ-বিন্দু চকচক করিতেছিল আলোয়।

দরিয়া-বিবি চারিদিকে চোখ ফিরাইল, বাস্তর নীচে গাছ-পালা স্তব্ধতায় ভোরের আলোক পান করিতেছে। নীলাভ কলা-বনের উপরটায় শুক-তারা অন্য দিনের চেয়ে আজ উজ্জ্বলতর মনে হয়। তবু ধূসর আকাশের পটভূমি।

অকস্মাৎ সটান হইয়া ধানের স্তূপ আলিঙ্গন করিয়া শুইয়া পড়িল দরিয়া-বিবি। অসহ্য বেদনায় তার পা কাঁপিতে থাকে। একবার আহ্ শব্দ করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিশ্চল পড়িয়া রহিল উলঙ্গ ইভের প্রতীক-বহনকারিণী ভূলুণ্ঠিতা জননী।

সিদ্ধ-ধানের উত্তাপে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে আবীর চুলার মুখে আসিয়া বসিল দরিয়া-বিবি। ধান টিপিয়া দেখিল, এবার নামাইবার সময় হইয়াছে। দ্রুত হাত চালাইতে লাগিল সে।

এমন কর্ম্মোন্মত্ত কেন দরিয়া-বিবি? সংসারের বোঝা শুধু একমাত্র তার-ই স্কন্ধের জন্য! তার স্বামী নাই, আজহার নাই?

এক হাঁড়ি নামাইবার পর চুলায় জ্বাল দিতে দিতে দরিয়া-বিবি পুনরায় চিন্তা-স্রোতে মগ্ন হইয়া যায়। জগদ্দল প্রস্তর-শিলার বুকে প্রস্রবনের বুদ্বুদ উপল-রেখায় মৃদু-তরঙ্গে সমাহিতি চায়।

চোখ বুজিয়া আসিতেছে ঘুমে, তবু কর্ত্তব্যের বেড়ির নাগপাশ শিথিল করিবার কোন উপায় নাই। ধীরে ধীরে চুলায় জ্বাল দিতে লাগিল

দরিয়া-বিবি। উবু হইয়া বসার ফলে শির-দাঁড়া টন্‌টন্‌ করিতেছে। একটী পিড়া সে টানিয়া আনিল ঘরের দাওয়া হইতে।

দিগ্বলয়ে প্রভাতের আলোর জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বনানীর নিঃসঙ্গে রাত্রি-চরা পাখী বিশ্রামের জন্য ঠাঁই খুঁজিতেছে। প্রত্যুষের মনোহরণ ঝঙ্কারে জাগিয়া উঠিতেছে পশু-পাখী তরুলতা কিষাণ-জনপদের অধিবাসীরা। গ্রামান্তর হইতে মুয়াজ্জিনের 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি মুর্চ্ছনার রেশ রাখিয়া গেল মহেশ-ডাঙার জলা-জাঙালে।

খাঁ-পাড়ার আশে-পাশে স্নানার্থী যুবতী-বধূ ছাড়া আর বোধ হয় কেহ জাগে নাই। আরো কত না রাত্রি দরিয়া-বিবি একাকী জাগিয়া এমন-ই সংসারিকতায় নিজের সামান্য বিশ্রাম-টুকু বিসর্জ্জন দিয়াছে। কোন ক্ষোভ নাই মনে। নিষ্প্রাণ লৌহ-কঠিন পাথরের মূর্ত্তির মত ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ প্রহরে বর্ষণের আঘাত নীরবে সহিয়া-যাওয়া শুধু, প্রান্তরের দিকে ভাস্করের দূর-প্রসারী দৃষ্টির ছায়া মেলিয়া দিয়া। আজ-ও তেমনই নীরবতায় নিজ-কে আবৃত করিয়াছিল দয়িয়া-বিবি। অলক্ষিতে কখন চোখের কোণে কোণে অশ্রু জমিয়াছে, তার-ও খোঁজ রাখে নাই সে। পেশী স্নায়ু আর মনের মিতালি অজানিতে-ই আসিয়াছে।

গণ্ডদেশে তপ্ত এক ফোঁটা অশ্রু-পতনে দরিয়া-বিবি সজাগ হইয়া উঠিল; চোখ মুছিয়া চারিদিক করুণা-বিহ্বল দৃষ্টির সাহায্যে অবলোকন করিতে লাগিল।

দাওয়ার পাশে রান্না-ঘর, তার পাশেই টাঁটির বেড়া। গোয়াল-ঘর যাওয়ার পথ। ভিটের ধারে গাছ পালা আছে বলিয়া এইদিকে এখনও অন্ধকারের ভিড়। চুলার আলোর ঝল্‌কানি তার ঠোঁটের উপর পড়িয়াছিল। হঠাৎ মানুষের ছায়া দেখিয়া দরিয়া-বিবি দৃষ্টি আরো সজাগ করিল। মানুষের শিরোদেশের ভাঙা-ভাঙা ছায়াই-ত বটে।

সকালে চোর আসে না, দরিয়া-বিবি-ও ভয় পাওয়ার পাত্রী নয়; সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অগ্রসর হওয়া মাত্র ছায়া সরিয়া গিয়াছে। টাঁটি খুলিয়া দরিয়া-বিবি চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। না, কোন জন প্রাণীর চিহ্ন নাই।

মনে একটু খট্‌কা লাগিল। আন্‌মনা দরিয়া-বিবি আবার চুলাশালে ফিরিয়া আসিল।

এইবার চোখ-কে অবিশ্বাসের কিছু নাই। সেই ছায়া তেমন-ই অবিকল টাঁটির উপর। কিন্তু অগ্রসর হওয়া-মাত্র মিলাইয়া গেল।

ভয়ানক ধাঁধায় পড়িয়াছিল দরিয়া-বিবি। জীন-ভূতের ব্যাপার নয় ত। একটু ভীত হইল আজহার-পত্নী। কিন্তু তৃতীয়-বার টাঁটি খুলিয়া দেখিল, একটি দশ-বারো বছর বয়সের বালক কাঁঠাল গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে। ভোরের আলো তখনও এখানে অপরিচিত, ছেলেটির মুখে তার উজ্জ্বলতা পড়ে নাই।

—এই খোকা। দরিয়া-বিবি ডাক দিল। ছেলেটী ভোরের আলোকের ছায়ায় পা-পা করিয়া কিছু-দূর আগাইয়া গেল।

—দাঁড়াও। আপ্ত-রমণীর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়। ছেলেটীর গমন-নিরস্ত, হঠাৎ মুখ ঢাকিয়া সে ফুঁপাইতে লাগিল।

দরিয়া-বিবি ছেলেটী-কে কোলে টানিয়া লইয়া বলিল, কাদের ছেলে, খোকা। বাপ মেরেছে বুঝি। পালিয়ে এসেছো ?

সে কোন জবাব দিল না। ফুঁপাইতেছিল, এখন স্তব্ধ হইয়া গেল। মাঝে মাঝে তবু ফুঁপানির শব্দ ভোরের বাতাসে আলোড়ন তোলে।

—কা'দের খোকা তুমি? দরিয়া-বিবি তাকে তপ্ত-বক্ষের পাশে গভীরে টানিতে লাগিল অচেতন স্নেহে।

দরিয়া-বিবির ঠোঁটে হাসি খেলিয়া যায়। —বেশ ছেলে ত। জবাব দেবে না ?

এখন-ও এখানে অন্ধকারের ঘোর কাটে নাই। গাছের পাতায় অলস সমীরণের কানাকানি ধ্বনিত হয়।

আবার ফুঁপাইতে শুরু করিয়াছে ছেলেটী। কোন জবাব নাই তার মুখে।

অগত্যা দরিয়া-বিবি বলিল, তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি নে, চলো আমাদের ঘরে।

মন্ত্র-মোহিতের মত বালকটী দরিয়া-বিবির বাহু-বেষ্টনে থাকিয়া হাঁটিতে লাগিল।

উঠানে ভোরের আকাশ থামিয়া পড়িয়াছে। মানুষের পরিচয় স্বচ্ছ দৃষ্টির কাছে অগোচর থাকে না।

—খোকা, তোমার নাম কী?

বালকটী দরিয়া-বিবির ডাগর চোখের দিকে নিজের আকর্ণ-বিস্তৃত দুই নয়ন মেলিয়া দিল। গভীর মমতাময়ী আঁখি-পল্লবের অন্ধকার দূর হইতে-না-হইতে দরিয়া-বিবির চোখে পড়িল বালকের ভ্রূর উপরে কালো দাগ।

বিস্মৃতির তিমির কে যেন এক নিমেষে মুছিয়া গেল।

—মোনাদির, আমার মুনি—অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কয়েকটী কথা আধ-স্পষ্ট গুঞ্জরিত শুধু হয় নাই। সেইখানে বালকটীকে গভীরে বুকে বাঁধিয়া অকস্মাৎ বসিয়া পড়িল দরিয়া-বিবি। তারপর শুরু হইল অঝোর আঁখির উৎস-মুখের প্রস্তর-বিদারণ।

ডুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিল মোনাদির মার কোলে মাথা গুঁজিয়া। বাইরের প্রভাত-স্নিগ্ধ আলো আর বায়ুতে আজ আর এতটুকু মমতা-ও ছড়ানো নাই।

একটু বসো, বাপ আমার।

সিদ্ধ-ধান একটু আঁচ ধরিয়াছিল, পোড়া গন্ধ উঠিতেছে। দরিয়া-বিবি মোনাদির-কে বসাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি হাঁড়ি নামাইল।

ধান ঢালা হইল যথা-শীঘ্র। মোনাদির মাঝে মাঝে ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। অপরিচিত পরিবেশে তার চোখ কৌতুহলের কোন নেশায় ডুবিয়া যায় না। সে মার মুখের দিকে বার বার চাহিয়া থাকে।

কাজ শেষ হইয়া গেল, সে মোনাদিরের কচি মুখ তুলিয়া তার ডাগর চোখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—গরীব দাসী মা-কে এতদিনে মনে পড়ল? ধরা-গলায় কথা শেষ করিয়া দরিয়া-বিবি কচি ঠোঁটে-মুখে বার বার চুম্বন করিতে

লাগিল। মাঝে মাঝে সে-ও উর্দ্ধ-নিবদ্ধ নয়নে নীলিমার প্রশান্তি-চয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বোধহয় আকাশের দিকে মুখ ফিরাইতেছিল।

—বেশ ভাল ছিলে, মুনি ?

মুনি সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দিল, হ্যাঁ, মা।

দরিয়া-বিবি তাহাকে কোলে তুলিয়া খুটিনাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

একটু পরে আসিল আজহার। ফজরের নামাজ শেষ করিয়া সে দহলিজ হইতে ফিরিতেছিল। দরিয়া-বিবির কোলে একটী অপরিচিত বালক দেখিয়া সে বিস্মিত।

— কার ছেলে কোলে ?

মাথায় তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া দরিয়া-বিবি নম্র-কণ্ঠে জবাব দিল, আমার ছেলে এসেছে।

—বা, বেশ সুন্দর ছেলে ত। কি সুন্দর চোখ দুটো।

দরিয়া-বিবির মুখ রাঙা হইয়া উঠিতেছিল।

—বাপ, মুনি, তোমার আব্বা-কে কদম-বুসি করো।

যন্ত্রচালিতের মত মোনাদির আজহারের পায়ে কদম-বুসি শেষে আবার মার কোলে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিল।

—তোমাকে যেতে দেব না। আজহার চিবুক ধরিয়া তার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

—তুমি আমার বাবাজী আজ থেকে। আমি তোমার ছেলে।

নিজের রসিকতায় আজহার হাসিতে থাকে। তার স্বভাবের রীতিমত ব্যতিক্রম।

—তোমার নাম বলো।

মোনাদির লজ্জায় মাথা নীচু করিল। জবাব দিল দরিয়া-বিবি : মোনাদির হোসেন খাঁ। আমি মুনি ডাক্‌তাম।

— বেশ, বেশ ; আমার মুনি বাবাজী।

হঠাৎ আজহার চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, আমু—নঈমা—আমু—

তারা বিছানা ছাড়িয়া সকলে ছুটিয়া আসিল কয়েক মুহূর্তে। ভোরের বেলা বিছানায় জাগিয়া-জাগিয়া কল্পনা করিতে আমজাদের খুব ভাল লাগে।

—দেখে যা' আমু—নঈমা—তোদের বড়-ভাই-কে দেখে যা।

তারা বিস্মিত নয়নে শিশু-সুলভ বিহ্বলতায় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

আজহারের উচ্ছ্বাস দেখিয়া দরিয়া-বিবি মনে মনে আনন্দিত হয়। তার কোলে মোনাদির উপবিষ্ট বলিয়া নঈমা-আমজাদ দূরে দাঁড়াইয়া ছিল।

—আয়, কাছে আয়, তোদের বড়-ভাই। মোনাদির কোন কথা বলিল না। আমজাদের হাত নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তার সস্নেহ দৃষ্টি নঈমার উপর পড়িলেও পিঁচুটী-ভরা চোখের জন্য কেমন যেন লাগিতেছিল তা-কে।

দরিয়া-বিবি নৈরাশ্য-ক্লান্তি নিমেষে কখন ভুলিয়া গিয়াছে। ফাল্গুধারার মত আনন্দের অন্তঃস্রোত তার পাঁজরে। নূতন ঢেউ যেন খেলিয়া যায়।

—তুমি ছেলেদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দাও। একটা কলার কাঁদি-তে রং ধরেছে দেখে এসেছিলাম কাল, আজ পেকে গেছে নিশ্চয়। সকাল-বেলাটা ছেলেদের ভাল নাস্তা হবে।

দরিয়া-বিবি দ্রুত গতি চলিয়া গেল। মোনাদির মার গমন-পথের দিকে চাহিয়া থাকে।

আজহার বলিল, তোমরা খেলা করো, আমি হুঁকোটা ধরিয়ে আনি। আমজাদ, তোর আজ মক্তবে গিয়ে কাজ নেই।

আনন্দে সে ছুটাছুটি করিতে লাগিল উঠান-ময়।

১৩

হঠাৎ নূতন কর্ম্মোদ্যম ফিরিয়া আসিয়াছে দরিয়া-বিবির। আজহার অবাক হইয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীর ভেতর সংসার-যাপনের যুগ্ম-বন্ধন থাকিলেও, এতদিন বড় ফাঁকা ঠেকিত সব-কিছু। দরিয়া-বিবি পাষাণই ত বটে। আজকাল হৃদ্যতার নব-মুকুল প্রস্ফুটিত হইতেছে কিষাণ-দম্পতিকে ঘিরিয়া। স্নেহ-যত্নের আতিশয্যের কোন কুল কিনারা করিতে পারে না আজহার।

মোনাদির কয়েক দিনেই অপরিচয়ের বেড়িগুলি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। আজহার আমজাদ অপেক্ষা মোনাদিরকেই যেন বেশী স্নেহ করে। কোন ফাই-ফরমাস তাকে খাটিতে হয় না। গাঁ হইতে এক মাইল দূরে মাইনর স্কুলে আজহার তাকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। মাইনা-পত্র যোগাইবার সাহস আছে তার। দরিয়া-বিবির উৎসাহ কম নয়। পুরাতন দিনগুলির স্মৃতি কিছুটা উত্তাপ অবশ্য হ্রাস করিয়া ফেলে। আমজাদের মক্তবের পড়া আর দু-মাস পরে শেষ হইয়া গেলে দু-ভাইয়ে একসঙ্গে স্কুল যাইবে। এখন-ও দুই মাস। একা-একা মোনাদির স্কুলে যায়, দরিয়া-বিবি তার জন্য খুব উতোলা হইয়া পড়ে। নদীর ধারে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে একদিন তার বাড়ী ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, সেদিন সকলের খাওয়া-দাওয়া সারিতে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। বিকালে দরিয়া-বিবি রান্না চড়ায় নাই।

মোনাদির আসেক্‌জানকে দু-চোখে দেখিতে পারে না। তার নোংরামির নানা কীর্ত্তন করে সে মায়ের কাছে। আমজাদ অবশ্য কোন বিপত্তি তোলে নাই। ঘর মাত্র দু-খানা। মোনাদির আসেক্‌জানের কাছে ঘুমাইতে নারাজ।

‘বুড়ির মাথায় যা’ উকুন’। অগত্যা দরিয়া-বিবি নিজের ঘরেই তাকে স্থান দেয়। এখানেও উসখুস করে মোনাদির। তার সহজে ঘুম হয়

না, সে উপলব্ধি করিয়াছিল। এই জন্য আর একটী চালা-তৈরীর বায়না ধরিয়াছিল দরিয়া-বিবি। ঘরের চালের সঙ্গে চাল বাড়াইয়া একটী ছোট ছিটে-বেড়ার কামরা প্রস্তুত করিয়া ফেলিল আজহার। চন্দ্র কোটাল শুধু তার গতরের মেহনৎ নয়, খড়ও দিয়াছিল দশ গণ্ডা। এই ঘরে মোনাদির আর আমজাদ লেখা-পড়া করে, বইপত্র রাখে। পাশে উদ্বাস্তু এলাকা, গাছপালায় ভরা। জ্যোৎস্না রাত্রে আমজাদ-মোনাদির দুইজনে প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে। আসেক্‌জান এই জন্য কম আফসোস করে নাই। আমজাদ তার কাছ হইতে সরিয়া গিয়াছে। কোন কোন দিন রাত্রে বুড়ি হামাগুড়ি দিয়া তাদের কামরায় প্রবেশ করে। হয়ত এতক্ষণ গল্প চলিতেছিল, বুড়ির আগমনে চুপ হইয়া যায় দুই ভাই। মোনাদিরকে বুড়িও খুব ভাল চোখে দেখে না। 'বুড়ো পাখী কী পোষ মানে বৌমা, চাল-ছোলা খাওয়ানোই সার।' দরিয়া-বিবির ধমকে আসেক্‌জান আর এমন কথা কোনদিন মুখে তোলে নাই। সে মনে মনে তুষের আগুন ধোঁয়াইয়া রাখিয়াছিল। আমজাদকে একা পাইলে বুড়ি নানা মন্ত্রণা দিয়া মনের ঝাল মেটায়। আমজাদও সহজে আসেক্‌জানের ছায়া মাড়ায় না। তোমার ব্যাটা, দরিয়া-বৌ, মন্দ হোয়ে গেছে, আর আমার কাছে শুবে কেন?' ক্ষোভ মিশিয়া থাকে কথাটায়।

তবু মোনাদির এই সংসারে এক ব্যাপারে অনাত্মীয়। দারিদ্র্যের কোন ছায়া তার চোখে পড়ুক, দরিয়া-বিবি তা পছন্দ করে না। স্বামী-স্ত্রী ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া দেনা-পাওনার কথা বলে। ঘরে চাল বাড়ন্ত হইলে দরিয়া-বিবি পূর্বের মত আর হৈ চৈ করে না স্বামীর সঙ্গে। পাছে কথাটা মোনাদিরের কানে পড়ে। হয়ত তার ফলে একদিন আবার চলিয়া যাইবে সে। পরাশ্রিত, তবু নিশ্চয় এমন গরীব হালে সেখানে মোনাদির দিন কাটায় নাই। আজহার খার লুঙ্গি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। নামাজ সহীহ্‌ হয় কি না সন্দেহ। সিজ্‌দার সময় হাঁটু বাহির হইয়া পড়ে। সে নিজে লুঙ্গি না কিনিয়া মোনাদিরের হাফ প্যাণ্ট ও শার্ট কিনিয়া দিল। বালক হইলেও মোনাদির সংসারের শ্রী-সম্পর্কে সচেতন

মার অনাত্মীয়ভাব সে কোনদিন তলাইয়া দেখে নাই! মার সঙ্গ-ই ত আশীর্ব্বাদের সমান। অন্য কিছু নিষ্প্রয়োজন।

মোনাদিরের সবচেয়ে ভাব হাসু-বৌর সঙ্গে। মাত্র কয়েকদিনে এমন আপন করিয়া লইয়াছে সে দরিয়া-বিবির এই সন্তানটীকে। যেদিন স্কুল থাকে না, সারা দুপুর কাটে সাকেরের বাড়ীতে। আমজাদ আর মোনাদির বইয়ের গল্প পড়িয়া শোনায়। অসহায় এই বধূটী নূতন করিয়া প্রাণ-প্রাচুর্য্যের সন্ধান পায়। সাকেরের সঙ্গে মোনাদিরের মাখামাখি আরো বেশী। আমজাদ পূর্ব্বে সাকেরকে এড়াইয়া চলিত। সে-ও আজকাল মোনাদিরের দেখাদেখি সাকের চাচার সঙ্গে সখ্য পাতাইয়াছে। মোনাদিরকে সে লাঠি খেলা শেখায়। দরিয়া-বিবি তা পছন্দ করে নাই। তার সুন্দর কিশোর পুত্র চোয়াড় না হইয়া যায়।

জলা-জাঙাল, গোঠ মাঠ নূতন ভাষা খুজিয়া পাইয়াছে। আমজাদও ফাইফরমাস শুনিতে চায় না, কেবল মোনাদিরের সঙ্গে ঘুড়িয়া বেড়াইতে ভালবাসে। আজহার বর্ত্তমানে পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছে সংসারের একজন প্রাণী বাড়িয়াছে বলিয়া। আমজাদকে এই সময় তার বেশী দরকার। সে কিন্তু ধরা ছোঁওয়া দেয় না।

চন্দ্র কোটালের সঙ্গে আজহার খাঁ শকরগঞ্জ আলুর চাষ করিয়াছিল। কচি লতায় নদীর চর পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। গোড়ায় আলু ধরে নাই তখনও। মোনাদির আমজাদের সঙ্গে এই কচি গাছ তুলিয়া মূলের মিষ্টতা আস্বাদ করিতে খুব ভালবাসে।

একদিন চন্দ্র কোটাল দুইজনকে হাতে নাতে ধরিয়া ফেলিল।

—সব আলু-মূল খাওয়া হচ্ছে।

একটী বাব্‌লা বনের আড়ালে তাড়ি গিলিয়া শুইয়া ছিল কোটাল। কিশোর কণ্ঠের আওয়াজে ঘুম ভাঙিয়া গেলে তার চোখে পড়িল এই অপচয়-দৃশ্য। চোখ আরো বড় করিয়া গোঁফ ফুলাইয়া সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, আলু মূল খাওয়া হচ্ছে, চৌকীদার—চৌকীদার—

এমন চীৎকার করিতে লাগিল, যেন গ্রাম জুড়িয়া ডাকাত পড়িয়াছে। আমজাদ ভয় পাইয়াছিল। মোনাদির পূর্ব্বে এই লোকটীকে দেখিলেও

এমন মূর্ত্তি তার দেখে নাই।

—না, কোটাল-চাচা, তুলে দেখেছিলাম, আলু হোয়েছে নাকি ?

—আলু হোয়েছে নাকি, আসুক চৌকীদার। পালিয়ো না খবরদার।

আমজাদ ওকালতী করিতে আসিল, ও আমার বড়-ভাই।

—তুমিও চোর। চৌকীদার দু'জনকেই ধরবে।

মোনাদির ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল, তার চোখে প্রায় পানী আসিয়া পড়িয়াছে।

চারিদিকে মাঠের প্রসারণ নীল-সবুজ রঙের মোহনা রচনা করিয়া চলিয়াছে। অবেলা মেঘে বর্ণ-কেলির সমারোহ নূতনতর মনে হয়।

কোটাল চারিদিকে চাহিয়া একবার হাই তুলিল।

—চৌকীদার আসছে না, তা হোলে আমাকেই নিয়ে যেতে হবে। দুই চোর। চলো আমার সঙ্গে—

আমজাদ থ' বনিয়া গেল। তার পা আর নড়ে না।

—আমি নাছোড়বান্দা। গোঁফে তা দিতে লাগিল কোটাল।

—তোমরা পায়ে হেঁটে যাবে না। ও বুঝেছি। তারপর চন্দ্র উবু হইয়া বসিয়া পড়িল ও বলিল ঃ আচ্ছা, দুই চোর আমার কাঁধে ওঠো।

মোনাদির অগত্যা কী বা করিতে পারে। সুশীল-সুবোধ ছেলের মত দুইজনে চন্দ্র কোটালের কাঁধে চড়িল। ভয় হয় তাহাদের, পাছে পড়িয়া যায়। দুইজনে কোটালের বাব্‌রী চুল কষিয়া ধরিয়াছিল।

—ওরে বাবা, সব পাঠানের বাচ্ছা, একদম ঘোড়া-চড়া করেছে। বলিয়া চন্দ্র হাঁটিতে লাগিল। আরোহীদের ভয়ের অন্ত নাই। আমজাদের চোখে পানী গড়াইতেছে। মোনাদির চুপচাপ।

কোটালের বপুর দোলনে আরোহীরা আনন্দ পায় না।

হঠাৎ হিহি শব্দে হাসিয়া উঠিল চন্দ্র কোটাল।

—এই চোর-চাচারা, চল্ সব চাচির থানায়। এলোকেশী ঘরে আছে নাকি কে জানে।

মোনাদির ও আমজাদ মাথার উপর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দুইজনের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

চন্দ্র কোটাল গান ধরিল, দু-জনের ঠোঁটে হাসি আর ধরে না।

প্রাণ যদি নিলে তুমি
প্রাণ-চোর শেষে……
কোকিল কেন রেখে গেলে।
এমন পোড়া দেশে।

মেঠো বাউলের সুরে প্রান্তরের বুক ভরিয়া উঠিতে থাকে। আমজাদ ও মোনাদির দূরে-দূরে দৃষ্টি ছড়াইয়া অবেলা উপভোগ করিতে লাগিল।

মোনাদির বলিল, চন্দ্র-চাচা, আমাদের নামিয়ে দাও।

—না, সেটি হবে না। তোমার চাচির থানায় চলো, লাল আলু আছে, সারা-রাত আলু খাওয়াব।

আমজাদ সব চিনিতে পারে। খালের সোঁতা পার হইয়া তাল গাছের সারি শেষে চন্দ্র-চাচার ঢিবি। সেই দিকেই কোটাল অগ্রসর হইতেছে। আর কোন ভয় নাই, কানে কানে সে মোনাদিরকে বলিল।

আকাশে রোদ পড়িয়া আসিতেছে। ধীর-সমীরে খড়ি-বনে শন্ শন্ শব্দ উত্থিত হয়। কোটালের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। বিরহিনী কোকিলের ডাকে জর্জ্জরিত হৃদয়, তারই বিলাপোক্তি কণ্ঠে বাজিতে থাকে শুধু।

ঢিবির উপর এলোকেশী চন্দ্রমণির উকুন বাছিতেছিল। উঠানে খেলারত যোগীন ও গোপাল। তারা এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়া খুন।

চন্দ্রমণি ডাকিল, ও দাদা, পায়ে পড়ি নামিয়ে দাও। পরের ছেলে পড়ে গেলে—

জোরে হাঁকিল চন্দ্র, পড়ে গেলে পণ্ডিত হোয়ে যাবে।

মোনাদির এইবার খিল খিল করিয়া কাঁধের উপর হাসিতে লাগিল।

—ও বাবা—থানার কাছে এসে চোরেদের আবার হাসি ছ্যাখো, চলো চাচির থানায়, খাওয়াবে লাল আলু।

আমজাদও হাসিতে থাকে।

চন্দ্রমণি বলিল, দাদা ভিটের উপর কাঁধে নিয়ে চড়ো না, তোমার ঘাড়টা ভাঙবে—

—খামাখা ভাঙবে। অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া দুই-তিন লাফে চন্দ্র একদম ঢিবির শীর্ষে পৌঁছিল।

কোটালের কাঁধ হইতে নামিয়া মোনাদির বড় লজ্জিত হয়। এই মাঠে সে আর কোনদিন আসে নাই। অপরিচিত জায়গা বলিয়া সে বিব্রত, নচেৎ অন্য কোন খটকা তার মনে নাই।

চোখ নামাইয়া গান করিতে লাগিল কোটাল। এলোকেশী চন্দ্রমণির উপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, ঠাকুর-ঝি, তোমার মাথায় রাজ্যের উকুন। দাদার মগজে আর বোনের মাথায়।

গান থামাইল চন্দ্র।

—আমার মগজে? কই বেছে দাও না। এলোকেশীর হাসি থামে না।

—মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মগজ দেখা যাবে কেন?

একটী মুগুর পড়িয়াছিল উঠানে। সেটী নির্দ্দেশ করিয়া চন্দ্র কপট-কোপন জবাব দিল।

—ঐটা দিয়ে দাও এক ঘা। মগজ বেরিয়ে যাক।

—চন্দ্রমণি ভারী রাগিয়া যায়।

—দাদা, তোমার মুখে যা' আসে তাই বলো, ভারী অনাছিষ্টি।

—নে, আবার নাকী-কান্না। লাল আলু থাকে ত' ছেলেগুলোকে খাওয়া।

আমজাদ যোগীন-গোপালকে চেনে, সে দৌড়াদৌড়ি শুরু করিয়া দিল বাস্তুর উপর।

হুঁকা-কল্কের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল চন্দ্র।

লাল আলু আনিয়াছিল কোটাল গঞ্জ হইতে। এলোকেশী বাঁশের ডোলে মুড়ি ও সেদ্ধ আলু মোনাদির ও আমজাদকে খাইতে অনুরোধ করিল।

বড় লাজুক মোনাদির এই সব ব্যাপারে। তবু ধীরে ধীরে ঠোঁট সঞ্চালন বন্ধ থাকে না।

কোটালের চোখের তারা বার বার নাচে।

—মিষ্টি আলু খাও যত পারো, আর গাছের কাছে যেও না। এবার ঠিক খোঁয়াড়ে দিয়ে আসব।

গোপাল মামার কথার প্রতিবাদ করিল, লোককে আবার খোঁয়াড়ে দেয়, মামা!

—দেয়, বাবা, দেয়। আমজাদের দিকে ফিরিয়া কোটাল বলিল: তোমার বাবাকে খোঁয়াড়ে রেখে আসব। ভারী ঘর ছেড়ে পালায়।

—ধেৎ

আমজাদ মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ঠোঁট বাঁকাইল। মোনাদির মুচকিয়া হাসিল শুধু।

বেলা-শেষ ধরিত্রীর বুকে সন্ধ্যার পূর্ব্বরাগ শব্দে-বর্ণে কুহর-কূজনে! ভিটার উপর হইতে দূরান্তের আবছা গ্রামগুলি এমন দেখা যায়, মোনাদির কোনদিন কল্পনা করে নাই। লাল আলু মুখে দিতে দিতে সে আনমনা হইয়া যায়। তার সুন্দর ডাগর চোখের চাহনি নিকটস্থ কোন বস্তুর উপর ক্ষণেকের জন্য আলোক-তরঙ্গ ছড়ায় না। ছবির মত স্তব্ধ তালগাছের সারি, নীচে সাদা গেঁয়ো পথ, হয়ত দু-একটী পথিক, পথ-ভ্রান্ত সাদা বাছুর, মেঘ আর পাখির ঝাঁক; তার বালক মনের পর্দ্দায় বিচিত্রার ইশারা রাখিয়া যায়।

চন্দ্র সকলের সঙ্গে তুড়ি দিয়া জমাইতেছিল। আনমনা কেবল মোনাদির।

—মুনি-ভাই সাঁঝ হোয়ে এলো, চলো বাড়ী সাই। আমজাদ তার চমক ভাঙাইল।

—আর একটু বস্ না। চাঁদনী রাত আছে, না-হোলে চন্দর-চাচা পৌঁছে দিয়ে আসবে।

অসম্মতি জানাইল চন্দ্র।—না, চাচা, আমার অনেক কাজ। গরু-বাছুর তোলা হয় নি। এই শীতে মুগ্‌রী-পাংগুলো রাখতে হবে। জোয়ার আসতে বেশী দেরী নেই।

আমজাদ কহিল, মরা গাঙে মাছ পড়ে?

চন্দ্র: না, চাচা, রান্নাটা চলে যায়।

মোনাদিরের গায়ে শার্ট ছিল। বাতাসে শীতের আমেজ তাকে তেমন কাবু করে না।

আমজাদের জন্যই অগত্যা উঠিতে হইল। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে দূর গ্রাম-সীমানায়। গৃহবাসীর স্নেহের প্রতীক্ষায় গোঁঠে-বাঁধা গাই হাম্বা-স্বরে আবেদন জানাইতেছিল।

দুই কিশোর হৃষ্টমনে গাঁয়ের পথ ধরিল। মোনাদির যেন বোবা হইয়া গিয়াছে। মাঠের এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ত সে কোনদিন আসে নাই।

হঠাৎ সে মুখ খুলিল ঃ চন্দর-চাচা একটা পাগল।

—আব্বাও ওই কথা বলে।

কিশোর মনের সিদ্ধান্ত এত সুনিশ্চিত যে প্রৌঢ়জনও হার স্বীকার করিবে। এই সাফল্যের গৌরবে যেন দুই ভাই খিলখিল শব্দে হাসিতে লাগিল।

আমজাদ বলিল, মুনি-ভাই তুমি গান জানো না?

—গান আমি গাইতে পারি, লজ্জা করে।

—একটা গান গাও, মুনি-ভাই।

মোনাদির চাচার আশ্রয়েও কারো তোয়াক্কা রাখিত না। রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া গেলে, সে গঞ্জের যাত্রা-শালে সারারাত্রি কাটাইয়া দিত। তম্বী চলিত পরদিন।

মোনাদির রাম-প্রসাদী বাউল ঢংয়ের গান আরম্ভ করিয়াছিল। তার অর্থ সে আদৌ বোঝে না। কণ্ঠের মিষ্টতায় কেবল মূর্চ্ছনা অপূর্ব্ব পুলকাবেশ সৃষ্টি করে কিষাণ পল্লীর প্রেয়সীদের বুকে। আমজাদ জানিত না মোনাদিরের কণ্ঠ এত মিষ্টি।

মুনি-ভাইয়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়া যায়।

গান শেষ হইলে সে বলিল, মুনি-ভাই তুমি চন্দ্র চাচার কাছে গান শেখো না কেন?

—গান জানে চন্দ্র চাচা?

ভাঁড়-নাচের দল ছিল, আর গান জানে না? শুনলে না, কেমন গায়?

—বেশ ভাল লাগে। আমি বলব আর এক দিন।

—আব্বা কিন্তু গান পছন্দ করে না। বলে ও-সব শিখলে মানুষ খারাপ হোয়ে যায়।

—দূ-র-র। আমি কিন্তু গান শিখব।

আমজাদ মাথা দোলাইয়া অন্ধকারে সায় দিল।

পরদিন পড়ন্ত দুপুরে হাসু-বৌর ঘরে আড্ডা জমিয়াছিল।

মোনাদিরের মতে, চন্দ্র কোটাল নামে এই গ্রামে একটী পাগল আছে। তার কাহিনী ফলাও করিয়া সে বর্ণনা করিতেছিল। আমজাদও এই বিষয়ে একমত। হাসু-বৌ ত অন্য কোন মতই দিতে পারে না।

সাকেরের মা ঘরে ঢুকিতে গল্প-স্রোত মন্দীভূত হইয়া গেল।

মোনাদিরকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, বেশ ছেলে বৌ-মা। থাকো ভাই, মার কাছে। পর কী কখন আপন হয়?

মোনাদির এই কাহিনী শুনিতে প্রস্তুত ছিল না!

সাকেরের মা বকিয়া যায়: জানো বৌ-মা। একেই বলে খুনের টান। চাচা সোনা-দানা দিয়ে মানুষ করত, শেষে একটা শ্লেট ভেঙ্গে ফেলেছিল তা সইল না। তোমার চাচা কী করে, ভাই?

মোনাদির স্তব্ধ হইয়া যায়।

—থাকো, মায়ের কাছ থাকো। পাঁচ-সাত বছর মায়ের কাছ-ছাড়া বলে কী আর মা পর হোয়ে যায়।

ভয়ানক বিরক্ত হয় মোনাদির মনে মনে। হাসু-বৌ শাশুড়ীকে দজ্জাল আখ্যা মনে মনেই দিতে থাকে। কাঠ-কুড়োনী বুড়ি বলিলে তবে আমজাদের গায়ের রাগ যায়।

সাকেরের মা কোন সাড়া না পাইয়া বকর-বকর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আবার ভাঙা আসর নূতন করিয়া জমিয়া উঠিল।

সাকেরের ঘরে আসবাব-পত্র বিশেষ নাই। তৈজস-পত্রই বেশী। এক কোণে একটী বড় তক্তপোশ পাতা। তারই উপর একদিকে

দেওয়ালে ঠেস দিয়া হাসু-বৌ উপবিষ্ট। বই হাতে মোনাদির। বালিশে আড় হইয়া শ্রোতারূপে আমজাদ।

আলী বাবা ও চল্লিশ দস্যুর কাহিনী পাঠ করিতেছিল মোনাদির। কাসেম রত্ন-গুহার মধ্যে আবদ্ধ। বাহিরে আসিবার মন্ত্র সে ভুলিয়া গিয়াছে। 'সিসেম খোল' এইটুকু শব্দ মোনাদিরের মুখে—আবার তাকে পাঠ থামাইতে হইল। সাকের-চাচা ঘরে ঢুকিয়াছে।

—কি গো চাচারা, গল্প পড়া হচ্ছে।

—জী।

হাসু-বৌ মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। গৃহে প্রবেশকর্তার দিকে তার চোখ সজাগ।

মোনাদির জিজ্ঞাসা করিলঃ কোথা যাবে, চাচা ?

—দাঙ্গার খবর আছে, লাঠি নিতে এসেছি। কোণে তার তৈলচিক্কন লাঠির উপর সকলের নজর গেল।

হাসু-বৌ মেঝের উপর দাঁড়াইয়া অনুরোধ করিল, না, কোথাও যেতে হবে না।

না, আগাম টাকা নিয়েছি। গম্ভীর কণ্ঠ সাকেরের।

মোনাদিরও চাচির পক্ষ গ্রহণ করিল।

—না, চাচা সন্ধ্যায় আমাদের খেলা শেখাবে। আজ কোথাও যেও না।

আমজাদ ওকালতীর প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করিল। লাঠি-হাতে সাকের কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। হাসু-বৌর শান্ত গম্ভীর মুখ তার চোখে পড়িয়াছিল বৈকি। কিশোর বালকগুলির জিদ বোধ হয় জীবনে তাকে প্রথম জিদ-ছাড়া করিল।

—বেশ, তোমরা গল্প করো, বলিয়া সাকের চলিয়া গেল।

গল্প আর পড়া হইল না। হাসু-বৌ নিজেই গল্প করিতে লাগিল। মোনাদিরকে কত স্নেহ-মমতায় ডুবাইয়া রাখিতে চায় সে।

—বেশ খোকা, বলিয়া হঠাৎ বিছানার উপর শায়িত মোনাদিরকে বুকে জড়াইয়া বার বার চুম্বন করিতে লাগিল। মাতৃস্নেহ যেন নূতন

আধার পাইয়াছে।

মোনাদির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে না। তার ডাগর চোখ, সুন্দর গৌর কচি-ঠোঁটে যুবতীর ওষ্ঠ, বিস্বাদ আনে এক রকমের।

বাড়ী ফিরিবার পথে মোনাদির আমজাদকে জিজ্ঞাসা করিল, এই—হাস্নু-বৌ চুমু খায় না কামড়ায় রে?

—কেন? অবোধ বালকের মতই প্রশ্ন করিল আমজাদ।

—এই দ্যাখ না, আমার গালে কত দাঁতের দাগ।

১৪

এই গ্রাম মোনাদিরের খুব ভাল লাগে। শূন্য ভিটা ছোট-খাট তরুলতার জঙ্গল, বনানীর নীচে কোথাও-কোথাও সরু পথ—তার মন আকর্ষন করে। লুকোচুরি খেলার এমন জায়গা তাদের গ্রামে ছিল না। এই পার্থক্য-টুকু তার মনোহরণ করে।

আমজাদ-ও আজকাল ঘর-পলাতক। দুইজনে বাউণ্ডেলের মত গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমজাদ-ও ধীরে ধীরে দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর ফাই-ফরমাস পূর্ব্বের মত সম্পন্ন হয় না, দরিয়া-বিবি মাঝে মাঝে খুব চটিয়া যায়। কিন্তু মোনাদির সম্বন্ধে সে খুব সচেতন। পাছে এতটুকু অনাদর-অবহেলার জন্য তাকে হারাইতে হয়। মোনাদিরের স্বভাব এমনই বেপরোয়া; মাথার উপর তম্বী করিবার লোক নাই, এই সুযোগে সে আরো বেপরোয়া হইয়া উঠিল।

গোরস্থানের জঙ্গলের পশ্চিম দিকে খেজুর-গাছের সংখ্যা অনেক। নীল থোকা-থোকা কাঁচা খেজুর পাক ধরিতে এখন-ও দুই মাস। অত ধৈর্য্য বালকদের নাই। আমজাদের সহিত যুক্তি করিয়া মোনাদির একদিন এক কাঁদি কাঁচা খেজুর কাটিয়া আনিল। তার জন্য অসীম দুঃসাহসের দরকার। বেত-বনের ঘন-ঝোপে বিষাক্ত সাপ-থাকা বিচিত্র নয়। তা-ছাড়া বুনো-লতায় গা হাত এমন কুটোয় যে অনেকেই খেজুর পাকিলেও এ-দিকে পা বাড়াইতে সাহস করে না।

মোনাদির পথ-প্রদর্শক। লতা-গুল্ম ফাঁক করিয়া সে অগ্রসর হইয়াছিল। বুনো-লতার স্পর্শ সে প্রথমে সহ্য করিয়াছে। কিন্তু আমজাদের গা কুটাইতেছিল ভয়ানক। জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। মোনাদির অগ্রজের মতই তা-কে শান্ত করিল। কিন্তু ঘরে দরিয়া-বিবি ক্ষোভে আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

—দু-জনে আমার মাথা খেয়ে ছাড়বি কোনদিন। পয়-পয় করে মানা করছি, কবরস্থানের দিকে যাসনে বাবা,—বাবারা কান কুলো করে বসে থাক্‌বে।

দুই ভাই কোন জবাব দিল না। দরিয়া-বিবি গরম পানীতে গামছা ভিজাইয়া পুত্রদের গা মুছাইয়া দিল।

—মুনি-ভাই বল্‌লে, কাঁচা খেজুর খেতে খুব মজা—আমজাদ মা-কে জবাব দিন।

প্রতিবাদ করিল মোনাদির: আমি বুঝি বলেছি মজা। খুব কষা।

আড়চোখে মোনাদিরের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া আমজাদের গা মুছাইতে লাগিল পুনরায় দরিয়া-বিবি। মোনাদির তখন মৌন। দরিয়া-বিবি ইহা লক্ষ্য করিয়া আবার মোনাদিরেব দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

—আয়, মুণি, তোর গা-টা আবার মুছে দিই।

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠ মোনাদিরের: না, থাক, আমার গা আর কুটোয় না।

দরিয়া-বিবি কোন প্রতিবাদ কানে তুলিল না।

—দ্যাখ দিকি, বাবা, গায়ে কাল-কাল দাগ পড়ে গেছে। অত ঘন জঙ্গলে আর যেয়ো না। বড়-বড় সাপ আছে।

—কি সাপ আছে, মা? আমজাদ জিজ্ঞাসা করিল।

—খুব বিষ সাপের, জাত-সাপ আছে।

মোনাদির হাসিয়া উঠিল,—হ্যাঁ, সাপ আছে না হাতি। কই, আমরা একটা সাপের লেজ-ও দেখিনি।

আমজাদ হাসিতে যোগ দিল। —মা, বড়-ভাই সাপের লেজ দেখেনি। সাপ কাট্‌লে লেজ খসে যায়। না, মা?

—হ্যাঁ।

মোনাদির বিশ্বাস করে না এই প্রসঙ্গ।

—হ্যাঁ কাট্‌লে লেজ খসে যায় না ঘোড়ার ডিম। আমার চাচার একটা বেড়ে কুকুর ছিল, সে এত লোককে কেটেছে, তার লেজ একদম থাকত না তাহলে।

দরিয়া-বিবি এতক্ষণ গম্ভীর হইয়া ছিল, সেও উচ্চ হাস্যে পুত্রদের আসরে যোগদান করিল।

—আরে আমার বোবা ময়না, কুকুরের আবার লেজ খসে!

মোনাদির গা চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে বলিল, তবে যে আমু বলে।

—তোর গা কুটোচ্ছে? জিজ্ঞাসা করিল দরিয়া-বিবি।

—না, মা।

— তবু আমার কাছে লুকোবে?

মোনাদির সস্নেহে হঠাৎ মার কোমর জড়াইয়া আমজাদের দিকে আঙুল বাড়াইল।—ঐ ত আমাকে নিয়ে গেল।

কৃত্রিম কোপন-দৃষ্টি প্রতিভাত হয় দরিয়া-বিবির।

আমজাদ অভিমান করিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে আর যদি কোথাও যাই, মুনিভাই।

পরদিন আমজাদ তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল। স্কুলের ছুটীর প'র দুজনেই গ্রাম-পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্যান্য ছেলেরা স্কুলের গ্রাউণ্ডে ফুটবল খেলে, মোনাদির সেখানে থাকিতে চায় না। ভয়ানক ছোট হইয়া যায় সে অন্যান্য পড়ুয়াদের নিকট। তাহাদের বেশভূষা স্বতন্ত্র, পরিচ্ছদে চিক্যতা থাকে। মোনাদির আমজাদের সঙ্গ-মাধুর্য্যে তাই পরিতৃপ্তির আস্বাদ পাইয়াছিল।

আজও স্কুলের ছুটীর পর দুইজনে মাঠের দিকে চলিয়া গেল। চন্দ্র কোটাল বাড়ী নাই, ফসল লইয়া গঞ্জে গিয়াছে—সেখানে ভাল জমিল না। আমজাদ মজা খালের একটী ধারে কতকগুলি চিলের পালক কুড়াইয়া মোনাদির-কে উপহার দিল। ভাল কলমের কাজ চলিবে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে লুকোচুরি খেলার সময় মোনাদির আমজাদের সঙ্গ-চ্যুত হইল। দুইজনে খেলার মাতামাতিতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। আমজাদের সঙ্গে দেখা না হইলেও মোনাদির বেশী বেগ পায় নাই। একটী বাঁক ফিরিতেই পরিচিত পথ দেখিয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিল। ওই শীর্ণ রাস্তাটী সাদা ফিতের দাগের মত আঁক-বাঁক সমন্বয়ে পাড়ার ওদিকে মিশিয়া গিয়াছে। দু-পাশে শুধু নানা রকমের গাছ। সন্ধ্যা

আসন্ন। ভয়াতুর মসৃণ অন্ধকার জমিয়া উঠিতেছে খান-খোন্দলে, পত্র-পুঞ্জের অনাবৃত বুকে। সাদা ঘাস ধূসরিমায় শিহরিয়া উঠিতেছে। পথের কিনারায় কেঁচো-মাটীর দাগ; পায়ের আঙুলে অস্তিত্বের প্রমান জানায়! কত ক্ষুদ্র টিলা! মোনাদিরের দৃষ্টি মিশিয়া যায় চারিদিকে। বোবার মত বিস্ময়ে সে চাহিয়া থাকে। একটু আগাইতে পালুতে মাদারের ঘন বেড়া চোখে পড়িল। নীচে কেবল লতার উলঙ্গ মূল, উপরে পাতার নীল আভরণ। পাশে একটী পানা-ছাওয়া ডোবা, জলের আলোড়ন-ধ্বনি শোনা গেল। কৌতূহলে মোনাদির উবু হইয়া দেখিতে লাগিল। সূর্যের লালিমা ডোবার উপর। রঙীন ঘাটের পৈঠায় একটী পিতলের কলস, গ্রাম্য কোন বধূ স্নান করিতেছে। তার গৌর মুখ দেখা যায়। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, এই ভয়ে মোনাদির পদক্ষেপ দ্রুত করিল। পুরাতন বড়ো আমের গাছ পড়িয়া ছিল, গুড়ি-সহ একটী মোটা ডাল পথের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। মালিকেরা সামান্য ডাল পালা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, ধড়টি এখনও বর্তমান। ফ্যাঁকড়া ডালের উপর বসিয়া মোনাদিরের দুলিতে ইচ্ছা করে। সময় নাই। আরো অন্ধকার হইয়া গেলে, ঘর-ফেরা দায় হইবে। কয়েক পা আগে একটী শূন্য ভিটে, পথ এখানে সামান্য উৎরায়ের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ভিটার তিনদিকে আমগাছের পাহারা; ফাঁক দিয়া দূরে সন্ধ্যাকাশের ম্লান অঙ্গনে হলুদ রঙের এত মেঘ! মোনাদির দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তার চোখে শূন্যতার এই আকার জ্ঞান-রাজ্যের কোন বার্তা বহিয়া আনে না; তবু অস্বোয়াস্তি অনুভব করে সে। আবার ঢালু-পথ সমান্তরাল কয়েক বিঘা মাত্র। এইটুকু শেষ হইয়া গেলে সে পাড়ার অন্দরে ঢুকিয়া পড়িবে। এই খানে সে হাঁটিয়াছে আরো কয়েক দিন, কৌতূহলের নেশা আর এমন কোনদিন চাপিয়া বসে নাই। অন্ধকার প্রলেপ টানিতেছে ধরিত্রীর উপর। মেঘের আলোয় সাদা পথের রেখা মুছিয়া যায় না। পানা-ভরা একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর পাড়ে বাঁশ-বনে নীড়-প্রত্যাগত বকের দল গুল্তান করিতেছে। শাবক-গুলির কঁক্-কঁক্ শব্দে উৎফুল্ল হয় মোনাদির। পুকুরের পাড়ের

কোণে জীর্ণ কয়েকটী সুপারি গাছ, পাশে গোয়াল-ঘর একটী বাছুর হাম্বারব ছাড়িতেছে। সড়কের পাশে, ইহার পর তাল-পাতার বেড়ার রেখা। ওদিকে গেরস্থদের সায়ং-জীবন শুরু হইয়াছে। জমাট ধোঁয়া উঠিতেছে গাছপালার ভেতর দিয়া। দ্রুত হাঁটিতেছিল মোনাদির। বেড়ার উপর শুষ্ক কলা-পাতার দোদুল রেখা-মূর্তি, বাতাসে দুলিতেছে। হঠাৎ পথের পাশে খড়খড় শব্দ হইল। ভয় পাইয়াছিল প্রথমে, পরে সে কৌতূহল-বশতঃ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। সাপ-খোপ নয় ত! এই খানে একটী শুষ্ক কাঁঠাল-গাছ বেড়ার খুঁটিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার শব্দ হইল। মোনাদির দৌড় মারিবার জন্য পা তুলিয়াছে!

এমন সময় বালিকা কণ্ঠের সাবধান-বাণী শোনা গেল: এই খোকা—

মোনাদির ভাবল কোন বর্ষীয়সী বোধ হয় তার গতি-বিধি লক্ষ্য করিতেছে। দৌড় বন্ধ করিয়া সে বেড়ার দিকে তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিল।

—এই খোকা—। কোন বর্ষীয়সী নয়, একটী কচি মুখ কলাপাতার আড়াল ফাঁক করিয়া মৃদু ঠোঁট সঞ্চালন করিতেছে।

বালিকার মুখের একাংশ মাত্র দেখা যায়। মরা কাঁঠাল গাছের গুঁড়ির উপর বাসয়া সে আড় হইতে কেবল মুখটি বাহির করিয়া দিয়াছিল। আকাশের আলোয় মুখাবয়বের ডান দিক শুধু আলোকিত।

কোন জবাব যোগাইতেছিল না মোনাদিরের মুখে। এমন অবস্থায় বালিকা তাকে যথেষ্ঠ সাহায্য করিল।

—কোন্ পাড়ার ছেলে?

আমতা আমতা করিয়া জবাব দিল মোনাদির: ঐ পাড়ার। আঙুলি নির্দ্দেশ করিতে সে বিস্মৃত হইল না।

—ঐ পাড়ায়।

ফিসফিস করিয়া মেয়েটী হাসিয়া উঠিল।—ঐ পাড়ার নাম নেই? তোমার নাম আছে?

বড় মুখরা ত মেয়েটা। মোনাদির রাগিয়া উঠিয়াছিল মনে মনে।

—আমার নাম নেই, তোর নাম আছে? 'তোর' শব্দটায় বেশ জোর দিয়াছিল সে।

—আমার নাম আছে, তোমার নামও আছে।

মোনাদির জিভ ভাসাইয়া শব্দ করিল : আমার···র···না···ম আছেই :···তারপর জিভ যদ্দূর সম্ভব বাহিরে প্রসারিত করিয়া বলিল : তোর নাম আছে ?

—ভারী বজ্জাত ছেলে ত। কা'দের ছেলে রে। মোনাদির আবার ব্যঙ্গ করিল। বেড়ার আড়াল ফাঁক করিয়া গুঁড়ির উপর সে সশরীরে বাহিরে আসিল। মোনাদির দেখিল ফালি পরা একটী সুডোল তনু, বছর নয় কী দশের বালিকা। চুলগুলি এলোমেলো পিঠের উপর দোল খাইতেছে। মুখটী গোলাকার, গৌর রঙের উজ্জলতা-উচ্ছল। টান চক্ষু-তারকা চড়ুই পাখীর মত ভ্রূর নীচে চঞ্চলতায় অস্থির।

—কা'দের ছেলে রে ? মেয়েটী ভেংচি দিতে বিলম্ব করিল।

মোনাদির এবার রীতিমত রাগিয়াছিল। পথের উপর ঢেলা ইত্যাদি কিছু না পাইয়া আক্রোশে সে ফুলিতেছিল।—দেবো পা ধরে নীচে ফেলে চিৎ পটাং।

মেয়েটী তাড়াতাড়ি পা গুটাইয়া ভেংচি কাটিয়া বলিল, আমার পা ধরে সালাম করবি নাকি ?

মোনাদির হাতের তালুর ভিতর অন্য হাতের মুঠি কচ্‌লাইতে লাগিল।

—দেবো পা ধরে ফেলে—

—দাঁড়াত রে বজ্জাত, বলিয়া মেয়েটী গাছের গুঁড়ি হইতে বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। তার পদধ্বনি শোনা যায়। ভয় পাইল মোনাদির। সে ছুট দিল এইবার সড়কের সোজাসুজি।

পশ্চাতে বালিকা কণ্ঠের ডাক শ্রুত হয় : এই খোকা শুনে যাও—কিছু বলব না তোমাকে—

মোনাদির আবেদনে কোন সাড়া দিল না। ভীত ত্রস্ত সে। কিছু দূর গিয়া, গাছের কোল-জোড়া অন্ধকারে থামিয়া একবার পশ্চাতে চাহিল। অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তি আলুলায়িত-কুন্তলা চকিত-দেখা কিশোরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হ্যাঁ সে-ই ত। ভুল হয় নাই কিছু।

কেমন যেন মনমরা হইয়া বাড়ী ফিরিল মোনাদির।

১৫

পরদিন দুপুরের আহার সমাপ্তির পর মোনাদির কৌতূহলবশতঃ পাড়ার পথে বাহির হইল। গত সন্ধ্যায় আবছা-দেখা সড়কের জগৎ। আজ দুপুরের রৌদ্রে চারিদিক আনমনা দৃষ্টি ছড়াইতে তার কাছে নূতন ঠেকিল সব কিছু। হারানো পথ-রেখা নূতন করিয়া সন্ধান করিতে লাগিল সে।

দু-পাশে তালপাতার বেড়া। মাঝখানে শুষ্ক কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি। জায়গাটা চিনিতে বেশী বিলম্ব হইল না। অবাক হইয়া পুনরায় মোনাদির অবলোকন করিতে লাগিল চারিদিক। কীট-পতঙ্গের ক্ষুদ্র জীবন-লীলা। শুষ্ক কাঠের সেতু বাহিয়া একদল পিপীলিকা আহার-মুখে অগ্রসর হইতেছে। ক্ষুদে লাল পিঁপড়ের সারি ছেঁড়া ঘুড়ির সূতার মত যেন বাতাসে কাঁপিতেছে। আঁকাবাঁকা গতি একটী তালপাতার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

মোনাদির একবার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইল। জোড়া সুপারি গাছের ওধারে গেরস্থ বাড়ি। ডিগ্ ডিগ্ শব্দে একটী ক্ষুদে পাখী তেঁতুল-বনে পতঙ্গ সন্ধান করিতেছিল।

—এই কা'দের বোকা ছেলে রে—বালিকা-কণ্ঠের ডাক। হঠাৎ ভয় পাইয়া মোনাদির পেছনে ফিরিবে কী, আর একটী কোমল হস্তে সে বন্দী। গত সন্ধ্যায় দেখা সেই বালিকাই! তার হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। মোনাদির প্রস্তুত ছিল না। মেয়েটী হাত ধরিয়া তাকে টানিতে টানিতে গেরস্থ বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। মাকড়শার জালে যেন পতঙ্গ পড়িয়াছে।

প্রতিবাদ করিবার অবসর নাই, দু-মিনিটের ভেতর ভোজবাজির মত কি যেন ঘটিয়া গেল। আর একটী গেরস্থর আঙিনায় সে এতক্ষণে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়াছে।

— ওমা, শিগ্‌গীর বেরোও, দেখো কা'দের ছেলে।

খিল খিল শব্দে হাসিতেছিল মেয়েটী।

—কি রে আম্বিয়া। আঙিনার সম্মুখে একটী খোড়ো চালের ঘর, তার দাওয়া হইতে একজন মেয়ে জবাব দিল। সে ঘরের দেওয়ালে মাটীর ছোপ দিতেছিল।

আম্বিয়া আর একবার সমস্ত হাসি নিঃশেষ করিয়া দিল।

— কি চুরি করবে বলে আজ বেলাবেলি বেরিয়েছে, মা।

মেয়েটী কর্ম্মব্যস্ত। সে একবার এইদিকে চাহিয়া কাজ বন্ধ করিল।

—আম্বিয়া, কাঁদের এমন সুন্দর ছেলে ?

হাসির স্রোতে ভাটা নাই।

—সুপুরি-গাছের কাছে দাঁড়িয়েছিল, ধরে এনেছি।

লাল-মাটী মাখা ন্যাকড়া হাতে মেয়েটী দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল। আম্বিয়ার মার নাম আমিরন।

—খোকা, কোথায় থাকো ?

এমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া যাইবে মোনাদিরের মত চট্‌পটে ছেলে, বিশ্বাস করা যায় না। আজ তার কণ্ঠে বাক্য হোচট খাইতেছিল।

— আ—মি—খাঁ পাড়ায় থাকি।

আমিরণ বদ্‌নার পানী লইয়া হাত ধুইয়া ফেলিল।

—খাঁ পাড়ার কার ছেলে ?

মোনাদির সঙ্কোচে মিশিয়া যাইতেছিল মাটীর সঙ্গে। আর যাই হোক, আজহার খাঁ তার পিতা নয়।

—আমার মা দরিয়া-বিবি।

আমিরণ দরিয়া-বিবির চেয়ে বয়সে বড়। প্রৌঢ়ত্বের ছাপ মুখাবয়বে স্পষ্ট। রোগা শরীর। গাল দুটী সুষমায় উজ্জ্বল হইলেও, বয়সের দাগ পড়িয়াছে। এক রকমের কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে তার মুখখানি ছাওয়া।

অভ্যর্থনার হাসি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে।

— দরিয়া-বুবুর ছেলে, দরিয়া-বুবুর ছেলে, বলিতে বলিতে আমিরণ আগাইয়া আসিল। আম্বিয়া তখনও হাসিতেছিল।

কৃত্রিম-ক্রোধে তার দিকে ফিরিয়া আমিরণ বলিল, "হতচ্ছাড়ী হিড়্‌হিড় করে কা'কে ধরে আন্‌লি। মাফ চা"।

আত্মীয়তার যোগসূত্র আছে এই কিশোরের সঙ্গে আম্বিয়া তা কল্পনা করে নাই।

—তুমি এসেছো শুনেছি, বাবা। গরীব মানুষ, কাজকর্ম্মে সারাদিন যায়। খেটে-খেটে আর পারি না। আজ ক'দিন যে খাঁ-পাড়ার দিকে যাইনি।

আম্বিয়া কৌতূহল-দৃষ্টি দিয়া মা ও আগন্তুক কিশোরের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ নখে মাটী খুঁটিতে লাগিল সে।

আমিরণ হাঁক দিলঃ এই হতচ্ছাড়ি—একদম ভিজে বেড়াল-ছানা ব'নে গেলি যে, দাওয়ায় একটা বসবার জ্যাগা দে। চলো, বাবা।

আম্বিরা মার আদেশ নীরবে পালন করিল। মোড়ার উপর যন্ত্র চালিতের মত বসিয়া পড়িল মোনাদির। তার পাশে বসিয়া আমিরণ সংসারের কাহিনী-জাল বুনিতে থাকে।

মোনাদির এতক্ষণ মুখ খোলে নাই।

আমিরণ বিবি বলিল, বাবা, একদম বোবার ব্যাটা। কথা বলো।

—আজকে আসি চাচি।

—না, একটু বসো। কিছু খাও।

—আমি ভাত খেয়ে এসেছি।

কোন প্রতিবাদ শুনিল না আমিরণ। ডোলে করিয়া সামান্য মুড়ি তাহার সম্মুখে পরিবেশন করিল।

—গরীব চাচি। কিছু কী ঘরে আছে, চাঁদি। তোমার চাচা আজ দু-বচ্ছর হোলো ইন্তেকাল করেছে। ঐ হতভাগীকে নিয়ে জ্বলে-পুড়ে মরছি। কথা শুন্‌বে না, খালি গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।

জননী কন্যার দৃষ্টি বিনিময় হইল। ভারী গম্ভীর হইয়া গিয়াছে আম্বিয়া।

—তুমি ক'দ্দিন এসেছো?

—অনেকদিন হোয়ে গেল। মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে জবাব দিল মোনাদির।

—ফুরসুৎ নেই, বাবা। সকাল থেকে কত কাজ, গাই-গরু আছে একটা। মুরগী হাঁস ছাগল-পাগল আর ঐ (আম্বিয়ার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ) পাগলী—আমার সংসারে এক ফোঁটা দম-ফেলার উপায় নেই। খাঁ-পাড়ার মুখ দেখি নি ক'মাস।

মোনাদির অনুভব করিল, তার নূতন চাচি অনর্গল বকিতে অপটু নন। মাথা দোলাইয়া আমিরণ নিজের কথায় সায় দেয়ঃ বেশ সুন্দোর ছেলে। আমার দরিয়া-বুবু কেমন? তার ছেলে রাজপুত্তুরের মত দেখ্‌তে হবে না?

লজ্জায় রাঙা হইতে থাকে মোনাদিরের কিশোর দুই কপোল।

—কোন রকমে বেঁচে আছি, খোকা। কপালে মেহনৎ ছাড়া আর কিছু লেখন নিয়ে আসিনি। তোমার চাচা ভাল লোক ছিলেন। তোমার এই বাপের মত দশ চড়ে মুখ খুলত না। তার ফল আজ ভোগ করছি। দু-তিন বিঘে জমি ছিল সব পরের গন্ডে।

তারপর ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে কথা বলিতে বলিতে আঙুল বাড়াইয়া আমিরণ আঙিনার ওপারে কয়েকটী খড়ো চাল দেখাইল।

—ওই যে আম্বিয়ার মেজ চাচা। একদম খান্নাস। বেওয়া মানুষ তার দু-বিঘে মেরে নিলে। ফসল দিত না, শেষে লুকিয়ে রেজেষ্টারী করে নিজের জমির সাথে ঢুকিয়ে দিলে। নিক হতভাগারা, আল্লা তার ইন্‌সাফ করবে। কত কত জিনিষ আনে, বাবা। এতিম মেয়েটার হাতে যদি একটু ছোঁয়ায়। সত্যো আছে কী?

মোনাদির ম্রিয়মান শিশুর মতই কাহিনী কান পাতিয়া শুনিতেছিল। আম্বিয়া-ও তার মত এন্তিম। মনের কোনায় কোনায় মৃদু নিঃশ্বাস রুদ্ধ আবেগের ঝটিকা-ফুৎকার রচনা করে। তবুও বিদায়ের জন্য উস্‌খুস্‌ করিতেছিল মোনাদির।

—গেলো বছর বর্ষায় ঘরে এক মুঠো চাল নেই। ধার করতে গেলাম। এক কুন্‌কে চাল দিল না। মা-বেটী একদিন উপোশ করে মরি। আমার জমি নিলে, আমার পেটে দানা নেই।

আমিরণের চোখের কোনায় পানি জমিয়া উঠিতেছিল, আঁচলের খোঁট

দিয়ে সে মুছিতে লাগিল।

মোনাদির 'আসি চাচি' বলিয়া উঠিয়া পড়িল। আর কেউ হোক করুণ কাহিনীর শ্রোতা। কিছুই ভালো লাগে না তার।

আন্‌মনা সড়কের সম্মুখে আসিয়া সে পেছনে তাকাইল একবার। কখন অজানিতে পিছু পিছু আসিয়াছিল আম্বিয়া, সে লক্ষ্য করে নাই। বাচাল-মুখরা একদম নিস্তব্ধ। মোনাদিরও কোন কথা না বলিয়া সড়ক ধরিল। একবার উৎকর্ণ হইল মোনাদির। হ্যাঁ, কান্নার-ই আওয়াজ। আমিরণ চাচি মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে অশ্রু বিসর্জন দিতেছে।

১৬

আমজাদ একদিন খবর আনিল, শৈরমীর পুত্র মারা গিয়াছে। তার পঙ্গু জীবনের অবসানে জননী অন্ততঃ স্বোয়াস্তি পাইবে। দরিয়া-বিবি পুত্রের সঙ্গে সেই সূত্রে নিজেদের বহু কাহিনী টানিয়া আনিল। বেচারা শৈরমী !

দরিয়া-বিবি বলিয়াছিল, শৈরমী-কে একবার ডেকে আন্‌বি। মোনাদির ও আমজাদ বাগ্‌দী পাড়া হইতে পরদিন ফিরিয়া আসিল। শৈরমী-ও শয্যাশায়ী। প্রতিবেশীরা এতদিনে তার প্রতি কৃপা-পরবশ। শৈরমীর দূরাত্মীয় এক বিধবা ননদ তার সেবা-শুশ্রূষার ভার লইয়াছে।

আরো দুইদিন কাটিয়া গেল। আমজাদ রোজ-ই তার খবর লইয়া আসে।

আজ অপরাহ্ণে আসিয়া সে বলিল, মা, শৈরমী আর বাঁচ্‌বে না।

—বাঁচবে না ! দরিয়া-বিবি ম্রিয়মান মুখে পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

—না গো, মা। একে পাৎলা চেহ্‌রা, রোগে-শোকে বুড়ি-কে চেনা যায় না।

দরিয়া-বিবি বাগ্‌দী এই রমণীর সখিত্বের বহু স্মৃতি স্মরণ-পথে টানিয়া আনিল। বন্ধক ঘড়াটি আর ছাড়ানো হয় নাই। মাসে সংসারের খরচা বাড়িতেছে। আয়ের সংস্থান কোথায় ? চন্দ্র কোটাল নূতন কোন ব্যবসা ফাঁদিবার আয়োজন করিতেছে। মূলধন-হীন কোন ব্যবসা আরম্ভ করা যায় কি না। কয়েক মাসে শুধু যুক্তি-পরামর্শ-ই সার হইয়াছে। দরিয়া-বিবি ভাবিল, সন্ধ্যায় একবার দেখা যাক, ঘড়া ছাড়ানোর টাকাটা যদি কোথাও থেকে যোগাড় করে আন্‌তে পারি। প্রাচীন সামগ্রী ঘর-ছাড়া হইবে। কিন্তু শৈরমী কার কাছে বন্ধক রাখিয়া আসিয়াছে, সে জানে না।

দরিয়া-বিবি আবার জিজ্ঞাসা করিল, বাঁচবে না ?

আমজাদ মাথা দোলাইল, না গো-মা। মোনাদির তার সঙ্গে গিয়াছিল, সে–ও মন্তব্য সমর্থন করিল।

ঘড়া চুলোয় যাক, একবার শৈরমীর সঙ্গে কি দেখাও হইবে না। এই চিন্তা দরিয়া-বিবি-কে বেশী পীড়িত করিতেছিল। বাগ্‌দী পাড়া দূর নয়। পনর মিনিটের পথ। গা-ঢাকা অন্ধকারে আব্রু ও পর্দ্দা বাঁচাইয়া সে সহজেই শৈরমী-কে দেখিয়া আসিতে পারে। কিন্তু আজহার রাজী হইবে কী? এই একটী বিষয়ে দরিয়া-বিবি আজহার-কে ভয় করে। চাষী-বাসীর সংসারে পর্দ্দার অত ঝামেলা নাই। পাড়া পড়শীদের সঙ্গে দরিয়া-বিবি স্বচ্ছন্দে দেখা করিতে যায়। কিন্তু ভিন-পাড়ার, বিশেষ করিয়া বাগ্‌দী পাড়ার ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়িলে মুসলমান পাড়ায় আর তাদের কোন ইজ্জত থাকিবে না।

হৃদয়ের ঐশ্বর্য জাতি-ধর্ম্মের বালাই লুকাইয়া রাখে। শৈরমীর সরল প্রাণের পরিচয়-পত্র যতই দরিয়া-বিবির নিকট গাঁথা-স্মৃতির সড়ক বাহিয়া উড়িয়া আসিতে লাগিল, সে ততই অস্থির হইয়া উঠিল। আমজাদের ছোট-বেলায় একবার খুব ম্যালেরিয়া হয়। জীবনের কোন আশা ছিল না। শৈরমী প্রতিদিন তাকে দেখিতে আসিত। একদিন সে কয়েকটী বাতাসা আনিয়া দরিয়া-বিবির হাতে দিয়াছিল।

—কি হবে, শরীদি?

—খোকা-কে খাইয়ে দাও একটা!

—কিসের বাতাসা?

শৈরমী মিথ্যা কথা বলে নাই। গ্রামের বারোয়ারীতলায় শিবালয়ে সে হরি-লুট দিয়া আসিয়াছে আমজাদের নামে। তার–ই বাতাসা।

ধর্ম্মে বাধেই ত। দরিয়া-বিবির মনেও খট্‌কা লাগিয়াছিল। মরনাপন্ন পুত্রের শিয়রে দরিয়া-বিবি কারো প্রাণে আঘাত দিতে রাজী ছিল না। যদি বাছার গায়ে 'বরদোয়া' লাগে। শৈরমীর - সম্মুখেই সে আমজাদকে বাতাসা খাইতে দিয়াছিল। আল্লা কি মানুষের মন দেখেন না, যিনি সব দেখেন? অখ্যাত-পল্লীর জননী হৃদয়েও সেদিন এই প্রশ্নই বারবার জাগিয়াছিল।

প্রত্যহ শৈরমীর জীবনের বহু অধ্যায় কল্পনায় পাঠ করিতে লাগিল দরিয়া-বিবি। দুঃখের দিনে প্রতিবেশীদের কাছে যে-লজ্জা বিরাট দীনতার প্রকাশ, দোসর পাইলে তার চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। শৈরমীর মত দোসর দরিয়া-বিবির দৈনন্দিনতায় আকস্মিক আসিয়া জুটিয়াছিল।

—তোর পিসি কথা বল্‌তে পারে, আমজাদ ?

—বড় ক্ষীণ গলার আওয়াজ।

—একবার তা-কে দেখ্‌তে যেতে ইচ্ছে করে।

আমজাদও মুরুব্বি-চালে বলিল, তুমি বাগ্‌দীপাড়া যাবে ?

—যেতে দোষ কী ? তারা মানুষ নয় ?

মোনাদির বলিল, মা তুমি অতদূর যেতে পারবে না, তোমার এই শরীর !

দরিয়া-বিবি নিজের শরীরের দিকে চাহিয়া লজ্জিত হইল। তার স্ফীত জঠর পুত্রের চোখে-ও ধরা পড়িয়াছে। আর এক সমস্যা। পূর্ণ গর্ভবতী একটী মেয়ে নিশাচর সাজিয়া বাগ্‌দী পাড়া গিয়াছে শুনিলে আজহার তা-কে খুন করিয়া ফেলিবে। এই ব্যাপারে স্বামী কেউটে সাপের চেয়ে-ও বিপদজনক ; অথচ কত নিরীহ আজহার। এই নিরীহ লোকটী ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানে ত্রুটী দেখিলে কেন এই রূপ রক্তোন্মত্ত হইয়া যায়, দরিয়া-বিবি ভাবিতে লাগিল।

পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল তিনজনের মধ্যে। আজহার ঘুমাইয়া পড়িলে আমজাদ, মোনাদির ও দরিয়া-বিবি শৈরমী-কে দেখিতে যাইবে। শুধু হাতে রুগ্ন সখীর নিকট যাওয়া অশোভন। অন্ততঃ দু-আনা পয়সা দরকার। যা, হাত-টান। সে-ভার গ্রহণ করিল আমজাদ। আসেক্‌জানের নিকট হইতে সে দু-আনা পয়সা আদায় করিয়া আনিবে।

সুযোগ আসিল সহজে। সারাদিনের খাটুনির পর আজহার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সেদিন। তিনজনে গ্রামের অন্ধকার পথে পাড়ি দিল।

ফিস্‌ ফিস্‌ কণ্ঠে পথ-চলার সময় দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসা করিল, আমজাদ, পথ চিনিস ?

—খুব। রোজ এই রাস্তা চষে ফেল্‌লাম।

মোনাদির পথটীর সহিত বিশেষ-ভাবে পরিচিত নয়, সে চুপ করিয়া রহিল।

সরু সড়কের পাশে ঘন ঝোপ-জঙ্গল। বাতাস বহিতেছিল। পিঞ্জরা-বদ্ধ পাখির আকাশ-বিহারের মত নেশা লাগে দরিয়া-বিবির গায়ে। ঘরের আনাচ-কানাচ, বড় জোর প্রতিবেশীদের সীমানা ছাড়াইয়া পৃথিবীকে দেখিবার খুব বেশী সুযোগ ঘটে নাই তার।

প্রহর দুই রাত্রি অতীত। চাষীদের সদরে পিদিম জ্বলিতেছ এখন-ও। তাসের আড্ডা চলিয়াছে, বোধ হয়। পথে লোক-জন নাই। দরিয়া-বিবি নিঃসঙ্কোচেই হাঁটিতেছিল। অন্ধকারেও সরু পথের শুভ্র দাগ চক্‌চক্ করিতেছে।

শৈরমীর ঘরে ঢুকিয়া দরিয়া-বিবি শিহরিয়া উঠিল। ঝুপ্ড়ী ঘর। পুরাতন হাঁড়িকুড়ি-পূর্ণ। ময়লা মাদুরের উপর আরো ময়লা একটী বালিশ মাথায় শৈরমী শুইয়াছিল। ঘরের চারিদিকে কোন জানালা নাই। ঝড়ের উপদ্রব জীর্ণ কুটীরের পাঁজরে সহ্য হইবে না, তাই এই ব্যবস্থা সহজে মানিয়া লয় গরীব কৃষকেরা। দম আটকাইয়া যাইতেছিল দরিয়া-বিবির। তবু মমতার বিজয়ী আহ্বান সব অস্বোয়াস্তির চিহ্ন মুছিয়া ফেলে। শৈরমী চোখ খুলিয়া বিস্ময়ে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

দরিয়া-বিবি ডাক দিল, সই।

শৈরমী জবাব দিল না। হাত-ইশারায় উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। দরিয়া-বিবি দ্বিরুক্তি করিল না। শৈরমীর আত্মীয়া শিয়রে বসিয়া পাখা দোলাইতেছিল।

দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন আছো ?

—কোথায় ভালো, মা। আত্মীয়া মেয়েটী ম্রিয়মান কণ্ঠে জবাব দিল।

আবার ডাক দিল দরিয়া-বিবি : সই। কেমন আছো ?

গলায় কফ জমিয়াছিল শৈরমীর। ঘড় ঘড় শব্দ হয় শ্বাসনালীর ভিতর। সে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করিল।

নারীকণ্ঠের ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল : ভালো—ভালো—

আবার হাঁপাইতে লাগিল শৈরমী।

বিধবা মেয়েটী আদিখ্যেতা শুরু করিল : কপাল দেখো, মা। গরীব আমরা, দেহটা যদি ভাল থাকে। শোকের ওপর আবার এই রোগ।

ভগবানের কী ফুটো চোখও একটা আছে।

দরিয়া-বিবির দিকে অদ্ভুত ক্লান্ত-স্তিমিত দৃষ্টি মেলিয়া শৈরমী চাহিয়াছিল, চোখের পাতা আর পড়ে না। দরিয়া-বিবিরও চক্ষু ফিরাইবার সামর্থ ছিল না যেন।

শৈরমী এবার গলা পরিষ্কার করিল কয়েকবার থক্ থক্ কাশিয়া।

—সই, ভালো হই, যাব।

দরিয়া-বিবি তার রেখাঙ্কিত ময়লা হাতটি স্পর্শ করিয়া দেখিল। জ্বর নাই বোধ হয়। শীতল, ঠাণ্ডা হাত।

হ্যাঁ, এসো আবার।

মাথা দোলাইল শৈরমী।

—সই।

—সই।

—তোমার ঘড়াটা, জয়া দাও তো। কথা বলিতে রীতিমত কষ্ট হইতেছিল শৈরমীর। ঘরের হাঁড়িকুঁড়ির জঙ্গলের দিকে সে হাত বাড়াইল।

আবার মৃদু ঠোঁট সঞ্চালিত হইলঃ আমি—আমি ছাড়িয়ে এনে রেখেছিলাম, টাকাটা পরে দিও।

শৈরমীর চোখের কোণ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। জয়া একটী পিতলের ঘড়া দরিয়া-বিবির সম্মুখে রাখিল। সে-ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার ব্যজন-রত হইল।

শৈরমীর চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হয়, বহু-কথন প্রয়াসী সে। কিন্তু চুপ করিয়া রহিয়াছে। শ্বাস-নালীর শব্দ আরো দ্রুত হইতেছে। বসিয়া রহিল দরিয়া-বিবি নির্ম্মম পাথরের মত। দারিদ্রের হিংস্র রূপ তার কাছে অপরিচিত নয়। কিন্তু এত বিভীষিকা-ময় তার অট্টহাস্য, দরিয়া-বিবি আর কোনদিন শোনে নাই। শিহরিয়া উঠিতেছিল সে বার বার।

চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল।

ছেলে দু'টী নির্বোধ দর্শকের মত বসিয়াছিল। তাহাদের চোখের পাতায় ঘুম। দরিয়া-বিবি আর বিলম্ব করিল না। জয়ার হাতে দুয়ানিটী গুঁজিয়া দিয়া বিদায় লইল। তবু একজন সমব্যথী পাইয়াছে শৈরমী। মেয়েটী ভিটার

নীচে আগাইয়া আসিল।

—কপাল, মা। তবু ভিন পাড়া থেকে এসে দেখে গেল। কেউ চোখ-ও দেয় না। রাতটা কাট্‌বে না। আর দেরী করব না। কফ্‌টা আবার এলো কি না।

দ্রুত চলিয়া গেল জয়া।

ঘড়াটী মোনাদিরের বগল-দাবা। আকাশে মেঘ জমিয়াছিল। চাঁদ আরো ঘনীভূত অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে। জঠরের সন্তানের প্রতি মমতা-বশতঃই বোধ হয় দবিয়া-বিরি সন্তর্পনে পা ফেলিতেছিল, নচেৎ চলৎ-শক্তি তার রহিত হইয়াছে।

ঘন বাঁশ বনে বাতাসের আর্তনাদ মাথা কুটিতেছিল। হঠাৎ শৈরমীর ভিটা হইতে আকস্মিক রোদন-নিনাদ শোনা গেল।

—একবার থাম, আমু।

দরিয়া-বিবি ক্রমশঃ নিরস্ত হইয়া উৎকর্ণ হইল! জয়ার বুক-ফাটা চীৎকার। হাঁ, চীৎকার।

আমু বলিল, মরে গেল গো পিসী। দরিয়া-বিবি দাঁড়াইয়া রহিল জড়-পদার্থের মত। রক্ত মাংসের নীচে মানুষে-মানুষে সঙ্গীভূত হওয়ার যে পরিপ্লাবী উৎস-ধারা যুগ-যুগান্তের শিকড় উৎপাটন করিয়া নব-নব সভ্যতার বীজ ছড়াইয়া যায়—তারই সর্ব্ব-স্বীকার-হীন চঞ্চল আর্তনাদ তরঙ্গের মত দরিয়া-বিবির বুকে আছড়াইয়া পড়িতেছিল। তার-ই আহ্বান ত এত নিশীথ রাত্রে ঘর-ছাড়া করিয়া আনিয়াছে তার মত গর্ভবতী জননী-কে।

দরিয়া-বিবি শৈরমীর ভিটার দিকে মুখ ফিরাইল।

আমজাদ বলিল, কোথা যাও, মা। হিন্দুদের মড়া, হিন্দুদের ঘর, সেখানে গিয়ে তুমি কী করবে?

উচ্ছ্বাসিত কান্নায় বুক চাপিয়া পথের উপর বসিয়া পড়িল দরিয়া-বিবি।

সকালে শৈরমীর মৃত্যু-সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। দরিয়া-বিবির কেমন মায়া বসিয়াছিল বাগ্‌দী এই রমণীর উপর। সাংসারিকতার ভেতরও সেদিন মন হাল্কা করিতে পারিল না আজহার-পত্নী।

মোনাদিরের জিদেই বিকালে আমিরণের বাড়ী গেল দরিয়া-বিবি।

অবেলায় মুর্গী-হাঁস লইয়া ব্যস্ত ছিল আমিরণ। বহুদিন পরে দরিয়া-বিবির আগমনে সে উৎফুল্লা হইয়া উঠিল। আম্বিয়া মোনাদিরকে দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

দুই পল্লী-রমণী সংসারের খেদোক্তি জুড়িয়া দিল। মোনাদির আমজাদ চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পাত্র নয়। আম্বিয়ার সঙ্গে প্রাঙ্গন ছাড়িয়া তাহারা সড়কের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

পল্লীর এই অংশে গাছ-পালা থাকিলেও, ঘন-জঙ্গল মনে হয় না। আমজাদের এই জন্য এলাকাটা খুব পছন্দ। মার্বেল খেলিবার এমন সুপ্রশস্ত চত্বর অন্যদিকে নাই।

দুই ভাই খেলা করিতে লাগিল। আম্বিয়া দর্শক মাত্র।

গাবুর ভেতর মার্বেল 'পিল' করিতে করিতে মোনাদির বলিল, আম্বিয়া তুই মক্তবে যাস?

—মক্তবে যাব না কেন? বুড়ো হোতে বসেছি লেখা-পড়া শিখব না?

বড় পাকা কথা। কথার চেয়ে ঝাঁঝ আরো বেশী।

—আরে আমার দাদী সাহেবা। কৈ চল্, কী পড়িস দেখ্‌ব।

মোনাদির মার্বেল খেলা ছাড়িয়া দিল।

—চলো। আম্বিয়া হাত ধরিয়া সেদিনের মতই তাহাকে টানিতে টানিতে অঙ্গনে প্রবেশ করিল। সে পড়ার বই বাহির না করিয়া একটী ছড়ার বই হাজির করিল মোনাদিরের সম্মুখে। শিশু-পাঠ্য সুন্দর প্রচ্ছদ-পট একটী পুস্তক। ছড়া ও ছবি-পূর্ণ। মোনাদির এমন পুস্তক পূর্বে দেখে নাই। বেশ মজা পাইতেছিল সে।

—তুই, এই বই পড়তে পারিস?

ঠোঁট উল্টাইয়া আম্বিয়া জবাব দিল, পারব না কেন?

একটী ছড়া মিহি কণ্ঠে সে আবৃত্তি করিতে লাগিল।

—বেশ ত। এই বই পেলি কোথায়?

মক্তবে রহিম বখ্‌শ চৌধুরীর মেয়ে পড়ে। তার-ই কোন আত্মীয়

পুস্তকটা উপহার পাঠাইয়াছে।

মন্তব্যে মোনাদিরও পশ্চাৎপদ নয়।

—তুই বেশ কাজের বুড়ি। পাকা বুড়ি।

মুখ ভেংচাইয়া উঠিল আম্বিয়াঃ বুড়ি বল্‌বার কে তুমি? মোটে সাত বছর বয়েস।

আমজাদ সশব্দে হাসিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ চলিল ছড়া-পাঠ। অবেলার বাতাসে শিশু-কণ্ঠের গুঞ্জন।

—তুমি এসো আর একদিন অন্য বই আনব। আমজাদ মোনাদিরের কাছে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আগন্তুক বালকের উপর তার হিংসা হয়, কিন্তু তা নিবৃত্তির একটা সহজ উপায়-ও সে এই কয়েক মাসে আয়ত্ত করিয়াছে। মার উপর তার দরদ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

দর্শকের মত আমজাদ ছড়া-পাঠের সভায় যোগ দিয়াছিল।

আমিরণ-চাচি হাঁক দিলঃ এই হতচ্ছাড়ি, এই বই নিয়ে হল্লা কেন এত। ক'দ্দিন বা তোকে মক্তবে পাঠাতে পারব।

দরিয়া-বিবি ধমক দিলঃ খামাখা তুমি মেয়েকে ধমকাও। বেশ লক্ষ্মী মেয়ে! চালাক, পড়া-শোনায় ঝোঁক আছে।

—চালাক। পাঁচ বছর বাদ বুকে পাথর হোয়ে বস্‌বে ঐ মেয়ে। বেওয়া মায়ের আবার স্নেহ-যত্ন-শান্তি।

—খোদার দিন খোদা চালায়। ভেবে-ভেবে আমার-ও পাঁজরা ঝাঁঝরা হোয়ে গেল! ভাবি, দূর-ছাই আর চিন্তা করব না, তবু সব গোল পাকিয়ে আসে।

মোনাদির তখন একটা ছড়া আবৃত্তি করিতেছিল। শেষ হইলে আম্বিয়া উচ্ছসিত হইয়া বলিল, আর একটা পড়ো না মান্নু-ভাই। তোমার মুখে বেশ মানায়।

প্রশংসায় মোনাদির বুক ভরিয়া উঠিতেছিল। তবু ধমক দিয়া বলিল, যা, আর ফাজলেমি করতে হবে না। বদ্‌মাইস।

মোনাদির আর একটা ছড়া আবৃত্তি করিল। জননীদের মধ্যে তখন দুঃখ-দারিদ্রের কথোপকথন চলিতেছিল। আমিরণ চাচির পাড়ার

আত্মীয়রা মোটেই সদয় নয়। ভিটে মাটি ছাড়া হইলে, এই কয়েকটি গাছ-পালা ও পুকুর-পুষ্করিণীর উপর দৌরাত্ম্য করিতে পারিলে তারা সন্তুষ্ট হইবে।

দরিয়া-বিবি অতীত-আত্মীয়দের ব্যবহারের স্মৃতি বয়ান করিতে লাগিল।

বহুদিন এই দিকে দরিয়া-বিবি আসে নাই। বড় পরিচ্ছন্ন আমিরণ-বিবি। দীনতার ভেতর এমন সৌন্দর্যের তৃষ্ণা বাঁচিয়া রহিয়াছে। উঠান-ঘাটের-পথ দাওয়া ঝক্‌ঝকে; গৃহ-লক্ষ্মীর স্বর্গ রহিয়াছে মাচাঙ, সব্জী ও গাছ্‌পালার উপর।

সন্ধ্যা নামিতেছে। আর দেরী চলে না, ছড়ার আসরও ভাঙিতে হইল। মোনাদির এখানে পরিচিত মনের সন্ধান পাইয়াছে। কয়েকদিন আগেকার অসোয়াস্তি ভুলিয়া গেল। আম্বিয়া ও আমিরণ সড়ক পর্যন্ত আগাইয়া আসিল।

সড়কে আবার ভারী হইতে থাকে দরিয়া-বিবির মন। এতক্ষণ বেশ ছিল সে। শৈরমী শাঁকের বোঝা মাথায় অবসন্ন সন্ধ্যায় সড়কে হাঁটিতেছে যেন, তারই সম্মুখে।

১৭

শকর-গঞ্জ আলুর চাষে অনেক লোকসান গিয়াছিল। চন্দ্র কোটাল হাসি মুখেই বলিল, খাঁ সাহেব, আমাদের কপালটা পাথর-চাপা।

আজহার নিরুত্তর ছিল। সংসারে পোষ্য-সংখ্যা বাড়িতেছে। আয়ের অঙ্ক যদি নড়-চড় না হয়, বাঁচার আর কোন আস্বাদ থাকে না।

চিন্তায় আজহারের ঘুম হয় না ঠিকমত। তার মস্তিষ্কের কলকব্জা এমনই চালু নয়। মনের অন্ধকারে হামাগুঁড়ি দেওয়ার মধ্যেই সে শান্তি পায়।

চন্দ্র কোটাল অলস নয়। রোজগারের পন্থা সে সহজে আবিষ্কার করে। আজহার অবাক হইয়া গেল। চন্দ্র কোটাল বাস্তর ঢিবির পাশেই আর একটী চালা ঘর তুলিয়াছে। তার ভেতর একটী ভাঙা হারমোনিয়াম, পুরাতন বেহালা, পরচুলা আর বাইজী-সাজার পোষাক। চন্দ্র ভেতরে বসিয়া একজক যুবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিল।

—এ কি, চন্দ্র? আজহার জিজ্ঞাসা করিল।

—এসো, মাদুরের উপরে আগে বসো। সব বলছি। একটা ভাঁড়-নাচের দল করলাম আবার।

—আজহার মাদুরের উপর বসিয়া তামাক ফুঁকিতে লাগিল।

—ছ্যা ছ্যা। শেষে আবার বুড়ো বয়সে এই সব কাজে হাত দিলে?

জঠরের উপর হাত বুলাইয়া চন্দ্র হাসিয়া উঠিল।

—বুড়ো বয়স। কিন্তু এই জায়গাটা বুড়ো হোতে জানে না।

চন্দ্র পেট ফুলাইয়া দেখায়।

আজহার বলিল, তোমাদের মহড়া চল্‌ছে?

চন্দ্র। খুব জোরে-সোরে চল্‌ছে। এবার 'বস্ত্র-হরণ পালা' করব।

আজহার। ওটা তুমি ভাল-ই করতে। এত সাজগোজ। টাকা পেলে কোথা?

চন্দ্র পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকের পিঠে হাত থাপ্‌ড়াইয়া জবাব দিল, এই

যে আমার রাজেন্দ্র ভায়া আছে। ও বহুত দিন শহরে ছিল। শহরের ছাঁট-কাট এনেছে, কিন্তু পয়সা আনতে পারেনি।

রাজেন্দ্র এই গ্রামের কৃষক পল্লীর সন্তান। সত্যই তার ছাঁট-কাট শহুরে। পরনে ধুতি, গায়ে হাফ শার্ট। চুল দশ-আনা ছ' আনা।

রাজেন্দ্র লজ্জিত হইয়া বলিল, আর কেন ও-সব চন্দ্রদা। এতেও যে পয়সা আসবে মনে হয় না। তবে ফুর্তি করে দিনটা কাটানো যায়।

চন্দ্র। দাও না ভাই একটা গান শুনিয়ে।

তৌবা বলিয়া আজহার মুখ কাচুমাচু করিল। রাজেন্দ্রের গান-গাওয়ার তেমন উৎসাহ ছিল না, গুণগুণ করিতে লাগিল। চন্দ্র একটু অপ্রস্তুত হইল বৈকি।

চন্দ্র। দেখো খাঁ-ভাই, এবার যখন রাজেন্দ্র-কে পেয়েছি, দল ঠিক চলবে। ওর হাত গলা দুই সমান চলে। বেহালার ছড়ি ধরতে ওর জুড়ি নেই। যাত্রার দল সব 'ফেল' মারবে। দেখো।

আজহারের এই আবহাওয়া ভাল লাগে না। কয়েকটী পুরাতন শাড়ী ঝুলিতেছিল আলনায়। জিজ্ঞাসা করিল, ও গুলো কী নাচের সাজ ?

জবাব দিল চন্দ্র, হাঁ। রাজেন্দ্র এনেছে সঙ্গে করে। আজহার সহজেই সব কিছু গ্রহণ করিতে পারিল না। রাজেন্দ্রের বদনাম অনেক। বাউরী পাড়ার একটী বিবাহিতা মেয়ে লইয়া সে উধাও হইয়াছিল দেশ হইতে সাত বছর পূর্ব্বে। বাউরী মেয়েটীর স্বামী ও দেবর গত বৎসর মারা গিয়াছে। নচেৎ রাজেন্দ্র দেশে ফিরিতে সাহস করিত না। তার প্রবাস-জীবনের কত কাহিনী গুজবের আকারে পল্লী গ্রামে আসিয়া পৌছিয়াছে। বাউরী মেয়েটী এখন নিষিদ্ধ পল্লীতে আশ্রিতা। রাজেন্দ্র তার উপার্জ্জনে আশ্রিত। থিয়েটারের এক বাইজী রাজেন্দ্রের প্রেমে পড়িয়াছিল। তার পশ্চাতে সে খোয়ার হইয়া বর্ত্তমানে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। বহু টাকার মালিক রাজেন্দ্র দাস, অধর দাসের পুত্র। হাতেম বখ্শ খাঁর সন্তানেরা শহরে তার কল্যাণে ময়ুর উড়াইয়া বেড়াইতেছে কার্ত্তিকের মত। গুজবের শেষ নাই।

এই জন্য আজহার রাজেন্দ্রের পরিচয় পাইয়া বড় বিগড়াইয়া গিয়াছিল

মনে মনে। রাজেন-কে চেনা দায়। রংটী ফর্সা। শহরের ছায়ায় আরো জৌলুষ খুলিয়াছে; সংলাপে কৃষক-পল্লীর কোন খুঁৎ ধরা পড়ে না। যেন কতদিন সে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছে।

এমন লোকের সঙ্গে চন্দ্র জঘন্য ব্যবসা ফাঁদিতে গেল। কোটাল নেশা করে, সুতরাং অচিরেই সে গোল্লায় যাইবে। মুখ ফুটিয়া আজহার কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

চন্দ্র কোটালের উৎসাহের অন্ত নাই। সুদীর্ঘ গোঁফে সে ঘন-ঘন তাও দিতে লাগিল।

—দেখো, আজহার-ভই, এবার ফসল যদি ভাল হয়, আমাদের বায়নার অভাব হবে না।

—ফসল আল্লার মেহেরবানী। নিস্তেজ কণ্ঠে জবাব দিল আজহার।

রাজেন্দ্র হারমোনিয়াম টানিয়া রীড্ টিপিতে লাগিল। পড়ন্ত দুপুর। চন্দ্র কোটাল মাদুরের উপর তাল দিতে ব্যস্ত। আজহারের কোন কথা মুখে নাই।

আজহার-ভাই, চন্দ্র মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া উঠিল।

আজহার কিছু বুঝিতে পারে না। নূতন রোজগারের পন্থা জুটিয়াছে। মরীচিকার স্বপ্নে চন্দ্র কোটালের মুখে আনন্দের বন্যা আসিয়াছিল। নিষ্ক্রিয় আজহার-কে সে ডাক দিল, কিন্তু তার মধ্যে বিদ্রূপের ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল। আজহার ইহার বিন্দু-বিসর্গ উপলব্ধি করিতে পারিল না।

—তোমার সঙ্গে আমার আরো কথা আছে, চলো আজহার-ভাই।

রাজেন্দ্রর দিকে কোটাল দৃষ্টি-বিনিময়ের সাহায্যে তা-কে অপেক্ষা করিতে বলিল।

—খাঁ-সাহেব, তুমি-ও আমাদের দলে ঢুকে পড়ো।

আজহার চন্দ্রের মুখের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

কোটালের দাওয়ায় বসিয়া আজহার আরো বিস্মিত হইল। শ্রী লাগিয়াছে তার ঘরে। বাঁশের নড়বড়ে খুঁটি বদলাইয়া একটী কাঠের খুঁটি লাগাইয়াছে সে। আলুচাষে নিশ্চয় কোটাল তাকে ফাঁকি দিয়াছে। চন্দ্রমণির অসুখ সারিয়া গিয়াছে। সাদা পরিষ্কার থান কাপড় পরনে।

খানিক আগে পান খাইয়াছিল। রাঙা ঠোঁটে তা-কে বেশ মানায়, দুই সন্তানের জননী বলিলে ভুল করা হইবে। আজহার কোটাল সম্বন্ধে কোন নীচতা মনে প্রশ্রয় দিতে পারে না। ফাঁকি দেওয়ার লোক সে নয়। নূতন দলের জন্য রাজেন্দ্র বোধ হয় খরচ করিতেছে। তার সম্বন্ধে এত গুজব তবে ভিত্তিহীন নয়।

আজহারের অভ্যর্থনার ত্রুটী হয় না কোথাও। কোটাল বলিল, আজহার ভাই, সত্যি বুড়ো বয়সে কোমর-ঢুলনি আর ভাল লাগে না। রাজেন্দ্র ছোঁড়াটা ধরে বস্‌ল। দেখি কপাল ঠুকে—যা আছে ভাগ্যে।

চন্দ্র কোটাল পূর্ব্বে ভাঁড়-নাচের দলে কাজ করিত। দশ-বিশ মাইল দূরে গঞ্জে গঞ্জে তাহাদের ডাক পড়িত। এমন প্রবাস-জীবনের সময় এলোকেশী-কে সে এক মাহিষ্য বাড়ীতে সঙ্গিনীরূপে পাইয়াছিল। এলোকেশী তার বিবাহিত স্ত্রী নয়। রাজেন্দ্রর কীর্ত্তি-কলাপের খোঁটা দিয়া চন্দ্রের নিকট আজহার কোন অভিযোগ করিতে সাহস করিল না।

স্তিমিত স্বর আজহারেরঃ চেষ্টা করে দেখো। আমার সঙ্গে আর একটা চাষবাস করো।

—নিশ্চয় নিশ্চয়। জাত-ব্যবসা আমি ছাড়ব না।

ওটা ত বাড়তি কাজ। বায়না পাব, কি না পাব কে জানে।

—সংসারে আর ভাল লাগে না।

—আমার-ও ওই দশা।

চন্দ্রমণি বেশ ফুটফুটে প্রজাপতির মত। স্বাস্থ্যের জৌলুসের সঙ্গে তা-কে আরো সুন্দরী মনে হয়। ছেলে দুইটী উঠানে লাফালাফি করিতেছে। আজহার কল্পনায় এমন-ই সাংসারিক চিত্র আঁকিতে লাগিল। তার সংসারে কী স্বাচ্ছন্দ্যের এমন হাওয়া লাগিবে না?

তামাক নিঃশেষ করিয়া আজহার উঠিয়া পড়িল। বলিল, ভেবে দেখো, চন্দ্‌র। যদি পুঁজি পাও।

—আচ্ছা, আচ্ছা।

কোটালের কণ্ঠস্বরে আনন্দের উচ্ছাস। হিংসা হয় আজহারের

মুহূর্ত্তের জন্য।

মাঠের নিঃসঙ্গ পথে ঔদাসিন্যের বোঝা আজহারের বুকে জগদ্দলের মত চাপিয়া বসিতেছে যেন। হারমোনিয়ামের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল। জুড়ি-গান ধরিয়াছে রাজেন্দ্র ও চন্দ্র কোটাল।

১৮

আঁতুর-ঘরে আর কোন দিন এত দীর্ঘকালব্যাপী দরিয়া-বিবি-কে পড়িয়া থাকিতে হয় নাই। সুঠাম স্বাস্থ্য তার। পাঁচ দিন পার হইলেই সে আবার সংসার গুছাইয়া লইত। আসেক্‌জান এই কয়দিন তা-কে সাহায্য করিত। বর্তমানে তার দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত—অকেজো বুড়ি সংসারের কোন কাজে লাগিল না। আমিরণ-চাচির শরণাপন্ন হইল আজহার খাঁ। সে-ও বিধবা মানুষ। সংসারের আগল-পাগল লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু আমিরণ-চাচি সহজে রাজী হইয়া গেল। তার সিদ্ধান্ত সত্বর সংসার-শৃঙ্খলার ছবি আঁকিয়া লইল। গরু দু'টী এই কয়েকদিন আর মাঠে ছাড়া হইবে না। গোয়ালে শুইয়া-শুইয়া খড় খাক্। মুর্গী হাঁস আম্বিয়ার তদারকে। নিশ্চিন্ত আমিরণ-চাচি।

দরিয়া-বিবি কৃতজ্ঞতায় ডুবিয়া গেল।

আসেক্‌জানের ঘরটী বর্তমানে আঁতুর-ঘর। অন্ধকার। দিনের আলো সেঁধোয় না। কোণে কোণে পুরাতন ঝুল জমিয়া রহিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর গন্ধে দম বন্ধ হইয়া আসে। ইহার ভেতর দরিয়া-বিবি শুইয়াছিল। পাশে সদ্যোজাত শিশু মেয়েটী। অর্ধ-পরিষ্কৃত ন্যাকড়ায় প্রস্তুত কাঁথার উপর যেন পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। মার আদল নব-জাতকের চোখে মুখে।

দরিয়া-বিবি শিশুর দিকে চাহিয়া বলিল, আমি-বুবু. তোমার দয়ায় এ-যাত্রা হয়ত বেঁচে যাব।

—হি হি, বুবু। তোমাকে শক্ত মেয়ে মনে করতাম। তুমি এত কাতর হোয়ে পড়ছে?

—আর কোন দিন এমন হয়নি। শরীর খুব ভাল ঠেক্‌ছে না।

দাওয়ায় আস্তানা পাতিয়াছিল আসেক্‌জান। তার কানে কথাটা সহজে প্রবেশ করে। সে খেদোক্তি আরম্ভ করিল: আমারও নসীব, আমি-বৌ। চোখের মাথা খেয়ে বসে আছি। আগে তবু ফাই-ফরমাস

এই অকালে শুন্‌তে পারতাম।

দরিয়া-বিবির জ্বর হইতেছিল অল্প অল্প। কবিরাজ আসিয়াছিল একদিন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ডিস্পেন্সারী হইতে বর্তমানে ঔষধ আনা হয়। কবিরাজের ঔষধে কিছু-ই ফল হইল না। কিন্তু ডিস্পেন্সারী প্রায় তিন মাইল দুরে। আমজাদ ও মোনাদিরের মুখ রৌদ্র তাতে শুখাইয়া যায়। আজহার খাঁ জমির কাজ ও টাকা ঋণের উপায় লইয়া ব্যস্ত।

সংসার লণ্ডভণ্ড। সময় মত সকলের খাওয়া হয় না। নঈমার দুই চোখে এমন পিঁজুটী জমে যে, দুপুরের আগে সে চোখ খুলিতে পারে না। দাওয়ায় বসিয়া আসেক্‌জানের নিকট সে নাকী কান্না কাঁদিতে থাকে। শুইয়া-শুইয়া দরিয়া-বিবি তিরস্কার করে। তখন মুহূর্তের জন্য সে থামে। আবার শুরু হয় ক্রন্দন।

আমিরণ-চাচি-কে কোন দোষ দেওয়া চলে না। গৃহিণী-পনায় সে কম নয়। পরের সংসার অনভ্যাসের ফলেই গুছাইতে এত বিলম্ব।

মোনাদির স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মার পাশে গিয়া আর বসিয়া থাকিতে ভালবাসে না! দরিয়া-বিবির আহ্বানে সাড়া দিলেও, কোন উৎসাহ পায় না সে। এই আবহাওয়া সে যেন বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। কিন্তু বোনটীর দিকে চাহিয়া সে এক রকমের লজ্জা অনুভব করে। কোন সচেতন কারণ অবশ্য তার উপলব্ধির বাহিরে। সৌন্দর্যের পুত্তলি। মোনাদিরের দুই চক্ষু কোন আনন্দের উপকরণ খুঁজিয়া পায় না। এইজন্য মোনাদির পাড়ার গাছ-গাছালির তলায় বেশীক্ষণ থাকিতে ভালবাসে। সঙ্গে আম্বিয়া বা আমজাদ। অথচ মার ফাই-ফরমাসের জন্য এই সময় তাদের ঘরে থাকা উচিত।

খোলা টাঁটির ফাঁক দিয়া বাহিরের জগৎ যা, দরিয়া-বিবির চোখে পড়ে। কর্ম্মনিষ্ঠ চঞ্চল তার মন-ও স্থিতি পায় না এই অন্ধকারে। শুইয়া-শুইয়া খবরদারী গ্রহণে তার কার্পন্য নাই। মুনি খেয়েছে কিনা, আমু কোথা, নঈমার চোখ কি রকম। হাজার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন। জেলা বোর্ডের ডিস্পেসারীর ডাক্তার বিছানায় শুইয়া থাকিতে আদেশ দিয়াছিল। প্রসূতি কতটুকু বা তা' পালন করিতে পারে? উঠিতে হয় বৈকি দরিয়া-

বিবি-কে। আমিরণ-চাচি এই জন্য বড় বিব্রত। প্রস্রাব-পায়খানা ফেলিবার ভারটুকু সে অতিকষ্টে দরিয়া-বিবির নিকট হইতে গ্রহণ করিল।

—তুমি ভাল হোয়ে নাও তারপর-শোধ দিও।

—শোধ! বলিয়া মুখ কুঞ্চিত করিল দরিয়া-বিবি। নবজাতক হাত-পা নাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিতে সে তাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। পুরাতন সূত্রের আবার খেই চলেঃ শোধ—এ-জন্মে নয়। আমার মোনাদিরটা বড় হোক।

চুপ করিয়া গেল দরিয়া-বিবি। মাথায় যন্ত্রণা হইতেছে।

আমিরণ-বিবি জিজ্ঞাসা করিল, একটু মাথা টিপে দিই।

—না। তুমি রান্না সেরে ফেল।

—হ্যাঁ, সেরে ফেলি। এক দৌড় বাড়ী যেতে হবে। ডাবায় পানী দিতে বলেছিলাম গরু হু'টোকে। ও কী ছোট বাল্‌তি করে পানী তুলেছে কি না কে জানে। সারাদিন শুকিয়ে মরবে।

—তা যেয়ো। তুমি যা দিলে বোন,—শোধ—শোধ আর ইহজন্মে কেউ করতে পারে না।

এত কাঙালী-পনা কেন? অথচ দরিয়া-বিবির প্রশান্ত মনের সম্মুখে ঝড়-ঝঞ্ঝা কত তুচ্ছ। কাতুরে কিশোরীর মত দরিয়া-বিবি।

—কিছু ভেবো না। সব-দুঃখ আল্লাই তরাবেন।

—আল্লা—আল্লা

বিদ্রূপের ভ্রূকুটী খুলিয়া গেল দরিয়া-বিবির মুখের উপর।

—আল্লাহ-ই যদি সব করেন, তবে আমাদের এত দুঃখ দিয়ে কী পান তিনি? আমার ঈমান নেই, নষ্ট হোয়ে যাচ্ছে, বুবু।

—ছি, ও-কথা মুখে আন্‌তে নেই।

—থাক্ আল্লা। রোগ হোলে ওষুধ খেলে ভাল হয়।

—এই ভাল হওয়ার রাস্তাটা ত মানুষ-কে খুঁজে বের করতে হোয়েছে। ওটা ত আল্লা মগজে ঢুকিয়ে দেন নি। তবে আর আল্লার কথা কেন মুখে। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট রোগ-বালাই সব-কিছুর পিতিকার আমাদের-ই করতে হবে। আল্লা থাকে থাক্। না থাকে না থাক্। দু'তিন বছরে

আমার ঈমান গেছে।

স্তম্ভিত আমিরণ-চাচি!

—কি বল্‌ছো রোগের ঝোঁকে। ওসব আমি বুঝিনে। তৌবা!

দরিয়া-বিবি ক্লিষ্ট বেদনায় চোখ বন্ধ করিল। তার জগতের উপর কাল-ছায়া নামিয়াছে।

আবার উন্মীলিত-পক্ষ্ম দৃষ্টি আমিরণের সর্ব্বাঙ্গ কৃতজ্ঞতায় লেহন করিতে থাকে।

—রাগ করো না, বুবু। তুমি নামাজ পড়ো। আমি পড়া ছেড়ে দিয়েছি। মন বসে না। খামাখা যাতে মন নেই তা করে কোন লাভ নেই।

আমিরণ-চাচি দরিয়া-বিবির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, এখন চুপ করো। তোমার মাথা ঠিক নেই।

—হুঁ!

পায়ের গিঁটে অসহ্য যন্ত্রণা, সটান পা লম্বা করিতে লাগিল দরিয়া-বিবি।

—ঘুমোও তুমি। আমি কাজ সেরে আসব।

—খোকাদের একটু ডেকে দাও।

—আচ্ছা, বলিয়া আমিরণ-বিবি রান্না ঘরের দিকে নিষ্ক্রান্ত হইল।

খোকারা কেউ এই তল্লাটে ছিল না। হাসু-বৌ মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর লইয়া যায়। দরিয়া-বিবির শারীরিক পরিচর্যা সে ফুরসৎ-মত সম্পন্ন করে। বেশীক্ষণ বাহিরে থাকার যো নাই তার। শাশুড়ী এই নির্ব্বোধ রুগ্ন বধূটীকে চোখে চোখে রাখিতে চায়। জীণ-ভূতের পাল্লায় সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে তার। সংসারে বংশধর না আসিলে পুত্র আর ঘর মুখো হইবে না। বধূর উপর খর-মেজাজ ফলাইলেও সাকেরের মা আসলে করুণা-পরবশ! ছেলেগুলিকে কয়েকদিন নিজের কাছে রাখিতে চাহিয়াছিল হাসু-বৌ। দরিয়া-বিবি রাজী হয় নাই। তাহাদের সংসারও খুব স্বচ্ছল নয়। আত্মীয়তার দৌরাত্ম্যে মনের সাধারণ মিল-টুকু পাছে হারাইতে হয়, দরিয়া-বিবি সে-আশঙ্কা করিয়াছিল। কিন্তু

তার পুত্রবর্গ গাছ-গাছালির উৎসঙ্গে আদর না পাইলে হাসু-বৌর কাছেই ছুটিয়া যায়, সেখানে আহাদারি করে না। মোনাদির মার কড়া হুকুম পালন করিত। হাজার সাধাসাধির পরও সে হাসু-বৌর বাড়ীতে কোন খাবার হাতে লইত না।

কাঁচা দুপুরে তারই অভিনয় চলিতেছিল। হাসু-বৌর হাতে কয়েকটী সন্দেশ। তক্কেতোষে আমজাদ, আম্বিয়া ও মোনাদির।

হাসু-বৌ। লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে ফেলো। 'হাম হাম্' শব্দ করিল হাসু-বৌ।

—না, আমি খাব না। মা বক্‌বে।

—মা দেখ্‌তে আস্‌ছে নাকি?

—এরা বলে দেবে।

—ওরাও যে খাবে।

মোনাদিরের আর কোন ভয় নাই। হাত পাতিয়া সে সন্দেশ গ্রহণ করিলে। তারপর যৌথ 'হাম-হামের' পালা। হাসু-বৌ হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

সাকেরের মা ঘরে ঢুকিয়া একচোট হাসিয়া লইল।

—বৌমা রান্না-বান্না দেখো। আভাগীর বেটী কপাল এনেছিস কী ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করবি।

হাসু-বৌ পাথর হইয়া যায়। আমজাদ ইত্যাদিরা সন্দেশে কামড় দিয়া বসিয়া থাকে আর মুখ নাড়ে না।

আপন মনেই বকিতে লাগিল বুড়িঃ যত-সব আভাগীর কপাল। একটা ছেলের হা-পিত্যেশ মিট্‌ল না। সাকেরটা গেছে কোথা লাঠি নিয়ে। কোনদিন কী কপালে আছে আল্লা জানে।

বাহির হইয়া গেল বুড়ি। বুড়ি ত নয় আপদ! ঘরে আবার হাসির হর্‌রা।

মোনাদির একটী গল্পের বই পড়া শুরু করিল। সকলে মন দিয়া শোনে। হাসু-বৌ মোনাদিরের নিকটে। তার চাল-চলন, পঠন-ভঙ্গী বড় সুন্দর দেখায়।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মোনাদির গল্প শেষ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। দুপুর ঢলিয়া পড়িতেছে। না, আর বসা যায় না। ক্ষুধা লাগিয়াছে তার।

আম্বিয়াকে সে বলিল, চল্‌না, বাড়ী যাবি না?

চলো না, মুনি-ভাই।

হাসু-বৌ বিরক্তপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, আম্বি, তুই যেতে চাস্‌ যা। আবার ওকে কেন টানাটানি।

—আমি ওর সঙ্গে যাব। কাচুমাচু খাইয়া আম্বিয়া জবাব দিল।

—না, আমিও যাব।

মোনাদির তক্তপোষ হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। হাসু-বৌ আক্রোশ বিফল দেখিয়া অনুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, মুনি, আমিও দরিয়া-বুবুকে দেখে আসব।

—তবে চলো।

খুব উৎফুল্ল নয় মোনাদির। স্বাভাবিক শালীনতা যেন সে এই বয়সে আয়ত্ত করিয়াছে।

হাসু-বৌ জবাব দিল: আমি তোমাকে হেঁটে যেতে দিচ্ছিনে। আমার কোলে চড়ো দেখি, সোনা।

বাধা দিল মোনাদির: আমি কি খোঁড়া, না আমার পায়ে মেহ্‌দী দিয়েছি।

কোন বাধা হাসু-বৌ স্বীকার করিল না। মোনাদিরকে সে কোলে তুলিয়া লইল।

আমজাদ 'ফুট' কাটিল: ধেড়ে ছেলে কোলে উঠেছে। শাসাইয়া জবাব দিল হাসু-বৌ: তোর কী রে। দশ-এগার বছর বয়সে যদি ধেড়ে, তুই কী?

মোনাদির কোলে চড়িয়াছিল, কিন্তু আরাম নাই তার বুকে। পাড়ার লোক হাসিবে বৈকি!

গমন-উদ্দেশ্যে পা বাড়াইয়া হাসু-বৌ মোনাদিরকে বলিল, লক্ষ্মী, আমার গলাটা জড়িয়ে ধরো, না-হলে আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে।

ঘরে আদৌ মন টেকে না মোনাদিরের। হাসু-বৌ দরিয়া-বিবির

মাথা টিপিয়া দিতেছিল। মোনাদির কয়েক মিনিট মার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া উঠিয়া গেল, আমিরণ-চাচি সকলের খাবার দিতেছিল। আজহারের ভাত রান্নাঘরে চাপা থাকে। মাঠের কাজ ছাড়া চন্দ্র কোটালের সঙ্গে যে কোথায় কী করিতেছে তার কেউ হদিস জানে না।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর মোনাদির একটী-বার মার ঘরে উঁকি দিয়া পাড়ায় উধাও হইয়া গেল। আম্বিয়া দুপুর বেলা ঘরে গিয়াছে; সেদিকেই খেলা ভাল জমিবে।

হাসু-বৌ ডাক দিয়া কোন সাড়া পাইল না। দরিয়া-বিবি বিষণ্ণ মুখে বলিল, আমি বিছানায় পড়া-অব্দি ওর যে কী হোয়েছে।

হাসু-বৌ জবাব দিল: এই ক'দিন আমার কাছে না হয় থাক্‌ত। তুমি আবার রাজী হও না।

—না-বৌ। সে হয় না। একে অনেক-কষ্টে ও ফিরে এসেছে। আমার চোখে-চোখে থাক।

—খুব ত তোমার চোখে-চোখে আছে।

হাসু-বৌ খানিকপর চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় কিন্তু এলোমেলো সাংসারিক জটাজাল কুণ্ডলী পাকাইয়া গেল।

ভর-সন্ধ্যা। তবু একটী ছেলে ঘরে ফেরে নাই। আসেক্‌জান আজকাল রাত্রি কাটাইবার সুযোগ অন্য কোথাও পাইলে এখানে থাকে না। কী বা সাহায্যে লাগে সে। নঈমা দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইতে জানে শুধু। সন্ধ্যার পর সে-ও ভাল দেখিতে পায় না। হাসপাতালের ডাক্তার চোখ দেখিয়া পথ্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। অত পয়সা খাঁ-পরিবারে কারো নাই যে আহার্য রোগের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হইবে। আমিরণ-চাচি মুর্গী হাঁস তুলিতে কিছুক্ষণের জন্য বাড়ী গিয়াছে।

দরিয়া-বিবি করুণ স্বরে ডাকিতেছিল, একটু পানী দিয়ে যা—কণ্ঠস্বর তার রোগে-শোকে ক্ষীণ। অনেকক্ষণ কারো জবাব না পাইয়া সে প্রাণপণে একবার চীৎকার করিয়া উঠিল, তোরা কী মরে গেছিস সব?

নঈমা জবাব দিয়াছিল। অক্ষমের আর কোন চারা নাই। এই সময় আজহার খাঁ ফিরিয়া আসিল। তখন-ও তার কাঁধে লাঙল। দরিয়া-বিবির আর্ত্তনাদ শুনিয়া আজহার আর গোয়াল-ঘরে লাঙল রাখিতেও যাই নাই।

—কি হোলো, দরিয়া-বৌ ?

—একটু পানী।

উঠানেই লাঙল রাখিয়া কলস হইতে পানী গড়াইল আজহার। দরিয়া-বিবি নিশ্চিন্তে পান সমাধা করিয়া গ্লাস স্বামীর হাতে দিয়াছে, দেখা গেল উঠানের উপর আমজাদ একটী কঞ্চি হাতে অগ্রসর হইতেছে, পশ্চাতে মোনাদির।

গ্লাস মাটিতে নামাইয়া আজহার খাঁ তীরবেগে ছুটিয়া আসিল। কোথায় ছিলি হারামজাদারা? দাঁড়া—বলিয়া সে আমজাদের কান ধরিয়া চপেটাঘাত ও পরে আছাড় দিয়া উঠানে ফেলিয়া দিল। ইহার পর শুরু হইল মোনাদিরের উপর ঐ প্রচণ্ড শাস্তি। হাতের কঞ্চি লইয়া আজহার খাঁ দুইজন-কে একই সঙ্গে বেদম প্রহার শুরু করিলঃ যত-সব পর-খেগো হারামীর বাচ্চা—খেয়ে খালি টই-টই ঘুরে বেড়াবে। শুয়োর-বাচ্চা মরণ হয়না তোদের—

নঈমা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল। তার পরিবেশে কী ঘটিতেছে সে না দেখিলেও নির্ম্মমভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল। তারই ফলে ক্রন্দন ও চীৎকার।

আজহার খাঁ ছুটিয়া আসিয়া তা-কেও দু'ঘা চাব্‌কাইল।

উঠানে হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গিয়াছে। নিরীহ আজহার খাঁ যে হঠাৎ এমন পাষণ্ড হইতে পারে, কল্পনার বাহিরে।

দরিয়া-বিবিও বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। সেও চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেঃ দাঁড়াও তোর মরদের গুষ্টিতুষ্টি করেছে। এত বড় বুকের পাটা আমার ছেলেদের গায়ে হাত—। ছুটিয়া আসিল দরিয়া-বিবি উঠানের উপর। দাওয়ার উপর হইতে পীড়িত শরীরে কিরূপে অবতরণ করিল, সেই মুহূর্ত্তটুকু তার জবাব দিতে পারে।

আজহার রণে ভঙ্গ দিয়া লাঙল কাঁধে দহলিজের দিকে চলিয়া গেল।

উঠানের উপর ধূলি-লুণ্ঠিত অবস্থায় মোনাদির ও আমজাদ। কয়েক জায়গা ফাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে শরীর হইতে।

দরিয়া-বিবি আগাইয়া আসিবার পূর্ব্বে স-চীৎকার মূচ্ছিত হইয়া পড়িল মাটীর উপর।

একটু পরে আসিল লণ্ঠন-হাতে সাকের, হাসু-বৌ ও তার শাশুড়ী।

১৯

আমিরণ-চাচির সেবার অপূর্ব্ব দক্ষতায় এই যাত্রা সত্যই বাঁচিয়া গেল দরিয়া-বিবি। গরীবের সংসারে বিনা চিকিৎসায় বিনা পথ্যে শুধু মনের জোরেই নিজকে চাঙ্গা করিয়া তুলিল খাঁ-পত্নী। এই তিন সপ্তাহে সে আরো একটী দোসর পাইয়াছে জীবনে। আমিরণ ও আম্বিয়া। রোগ-শয্যায় শৈরমীর দীন-মৃত্যুচ্ছবি দরিয়া-বিবির মানসপটে ফুটিয়া উঠিত। হয়ত তেমনই মৃত্যু হইবে তার। আমিরণ-চাচি ধীরে ধীরে তার মানসিক স্বাস্থ্যও ফিরাইয়া আনিয়াছে। নূতন কচি মেয়েটীর দিকে চাহিয়া দরিয়া-বিবি ক্ষুব্ধ মনে মনে। এই রূপরাশি দরিদ্রের কুটীরে তামা হইয়া যাইবে। আমজাদ ও মোনাদির-কে লক্ষ্য করিয়া দরিয়া-বিবি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

এই কয়েকদিনে পুরাতন স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিত দরিয়া-বিবির। মোনাদির তা-কে দাগা দিয়া গিয়াছে। তার কোন খোঁজ নাই। মার খাইয়া সে বিছানায় মুখ গুজিয়া পড়িয়াছিল। পরদিন ভোর-বেলা হইতে সে নিরুদ্দেশ। সাকের দরিয়া-বিবির আগেকার বাড়ীতে সন্ধান লইয়াছিল। মোনাদির সেখানে যায় নাই।

কান্নাকাটির কসুর করিল না দরিয়া-বিবি। আজহারের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দৈনন্দিনতার চাকায় মিশিয়া গিয়াছিল দরিয়া-বিবি। স্ত্রীর সমস্ত কর্ত্তব্য সে সম্পন্ন করে। কিন্তু নির্বাক্। তার নির্ম্মম মুখের দিকে চাহিয়া আজহার কথা বলিতে সাহস করে না। সংসারে দুই জন জীব একসঙ্গে বসবাস করিতেছে মাত্র। পশুর মত একে অপরের ভাষা বোঝে না, সেইজন্য বাক্যালাপেরও কোন প্রয়োজন্ নাই।

চন্দ্র কোটাল ভাঁড়-নাচ লইয়া খুব মজিয়াছিল। কয়েকটী মঞ্চে ইতিমধ্যে সে আসর জমাইয়া আসিয়াছে। দরিয়া-বিবির অসুখের সময় এলোকেশী চন্দ্রমণিকে কয়েকদিন আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিল। মোনাদির

আজহারের তিরস্কারে এই ঘর পরিত্যাগ করিয়াছে, তা-ও জানিত চন্দ্র কোটাল। কিন্তু তা লইয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিঃশব্দের পাহাড় মাথা তুলিয়াছে, এই সংবাদ তার জানা ছিল না।

আজহার একদিন সমস্ত বৃত্তান্ত কোটাল-কে বলিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

—তোমারও রাগ আছে তা-হলে ?

হাসিতে লাগিল চন্দ্র। মেনী বিড়ালেরা মাঝে মাঝে রুই মাছের মুড়া গিলিয়া ফেলে। আজহার রাগিতে পারে, আশ্চর্যের বিষয় নয়।

—হঠাৎ। অমন মারা উচিত হয়নি।

—ভাবীর পায়ে ধরেছো ?

গোঁপে তা দিতে লাগিল চন্দ্র।

—তৌবা। তুমি একবার গিয়ে বলো, এমন করে সংসার চলে ?

—চলুক। বেশ ত, দশ বছর কথা বলেছ, এখন কথা না বললে চলবে না ?

—দূর পাগল।

এই বার ভাল ফসল হইয়াছিল। আজহার খুব সংসার-বিব্রত নয়। কল্পনায় ছবি আঁকিতে সেও ভালবাসে।

চন্দ্র কোটাল সেইদিন দরিয়া-বিবিকে হাস্য-কৌতুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

—ভাবী। আমার ভাঁড়-নাচ তোমাকে দেখাতে পারলাম না। যা' ধর্ম্মের কড়াকড়ি তোমাদের।

—একদিন দেখে আসব তোমার বাড়ী গিয়ে। টাঁটির আড়াল হইতে দরিয়া-বিবি জবাব দিল।

—আমার সঙ্গে কথা বলছ। আর খাঁয়ের সঙ্গে কেন কথা নেই ?

চুপ করিয়া গেল দরিয়া-বিবি। একটু পরে আসিল উত্তর : আমার ছেলেকে যদি কেউ তাড়িয়ে দেয় —

—সেটা নিশ্চয় অপরাধ। আমি যদি মুণি-খুড়োকে এনে নিই।

—আগে এনে দাও।

—নিশ্চয় এনে দেব। নিশ্চয়।

—আমজাদকে মারল আমি রাগ করিনি। কিন্তু একটা হতভাগা এখানে ঠাঁই নিয়েছিল, তার উপরও হাত চালালে। আমার দিকে একবার দেখ্‌লে না।

—সেটা ভারী অন্যায় করেছে।

চন্দ্র কোটালের বাক্য সমাপ্ত হওয়ার আগে দরিয়া-বিবি বলিতে লাগিল, বড় দুঃখী আমার মুনি, তার গাঁয়ে হাত দিলে—হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল দরিয়া-বিবি। চন্দ্র কোটাল তা উপলব্ধি করিতে পারে। হাস্য-প্রিয় তার মত মানুষটী আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

দহলিজে ফিরিয়া আজহার খাঁকে সে খুব ধমক দিল।

— সত্যি খাঁ ভাই, ভারী অন্যায় করেছো। বোঝ না ছেলের মায়া?

আজহার গুড়ুক ফুঁকিতেছিল। বলদের মত নিস্তেজ দুই চক্ষু বুজিয়া সে জবাব দিল, হুঁ।

চন্দ্র কোটাল আজ হারিয়া গিয়াছে। সে চুপ করিয়া রহিল।

—খোঁজ করে দেখো না, চন্দর।

—আমি লোক লাগাচ্ছি। আমার বায়না আছে শ্যামগঞ্জে। দেখা যাক।

চন্দ্র কোটাল আজ বিশেষ ভনিতা না করিয়া উঠিয়া পড়িল।

আজহার গুড়ুক ফুঁকিয়া যায়। নিঃস্পৃহ হইয়া উঠিতেছে সে সব বিষয়ে।

বিঘে দুই জমির ভাল ফসল পাইয়াছিল। এই বৎসর সংসারে মাস তিন টানাটানি চলিতে পারে। টাকা পাইয়া আজহার দরিয়া-বিবির জন্য একটী তাঁতের সাদা শাড়ী কিনিয়া আনিল। কথাবার্তা নাই দম্পতির ভেতর। তক্তপোষে শাড়ী রাখিয়া দরিয়া-বিবির উদ্দেশ্যে সে কয়েকটী কথা বলিয়াছিল মাত্র।

কয়েকদিন পরে আরো ফসল আসিল ঘরে। আজহার দেখিল তার দেওয়া কাপড় পরিয়া রহিয়াছে আসেক্‌জান। চাহিয়া রহিল সেই দিকে কিয়ৎক্ষণ। নিরীহ মানুষটীর বুকেও শত প্রশ্নের কল্লোল উঠিয়াছে।

সেইদিন বৈকালে আজহার খাঁ সুতা কন্নিক সুর্মি হাতে ভিন গাঁয়ের পথ ধরিল।

পরদিন আমজাদ একবার পিতার প্রসঙ্গ তুলিয়াছিল। তাহাকে ধমকে স্তব্ধ করিয়া দিল দরিয়া-বিবি।

২০

আলু পেঁয়াজের গস্ত করিতে ইয়াকুব গঞ্জে আসিয়াছিল। সেদিন ভাল ব্যাপারী জোটে নাই। বেশী মাল কেনা হইল না। পাঁচ ক্রোশ বাড়ী ফিরিয়া আবার গঞ্জে আসা মহা হাঙ্গামা। আজহারের বাড়ী নিকটে, পুরাতন আত্মীয়তা ঝালাই করা হইবে তবু। তা-ই ভাবিয়া সে বহু বছর পরে গরীব মামাতো ভাইয়ের অঙ্গনে পা বাড়াইয়াছিল।

দরিয়া-বিবি ইয়াকুবকে সহজে চিনিতে পারে নাই। কয়েক বছরে তার চেহরা বেশ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে।

—আমাকে চিন্‌তে পারলে না? আমি তোমার সেই দেবর—যে বড্ড বেশী বিরক্ত করত।

—এসো, এসো। দরিয়া-বিবির সম্ভাষণে স্মৃতিশক্তি পুনরুজ্জীবন লাভ করে।

—ভাবী, গঞ্জে এসে মুশ্‌কিলে পড়েছিলাম। মাল কেনা হয়নি।

—তাই বুঝি গরীবের কুঁড়ে-ঘরে হাতী—

ইয়াকুব কথা লুফিয়া লইল, "হাতী নয় বরং চাম্‌চিকে বলুন, তা-ও সহ্য হবে"।

বহুদিন আগে ইয়াকুব এই বাড়ী আসিয়াছিল। তার বেশভূষার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে লম্বা-কোঁচা ধুতি পরিয়াছিল। নাকের সোজা-সুজি টেরি, চুলগুলি ঢেউ খেলানো, পায়ে কালো পাম-সু, গায়ে ঝুলা-পাঞ্জাবী। পানের দাগ দাঁতের গোড়ায়। হাসির ভেতর বাঁকা মনের পরিচয় ফুটিয়া ওঠে।

ইয়াকুব সম্পর্কে আজহারের ফুপাতো ভাই। জোত-জমি আছে শ' বিঘা। তার ধান,—তাছাড়া মরসুমে আলু, পটল, পেঁয়াজ, পাট ইত্যাদি লইয়া সে ব্যবসা করে। গত কয়েক বছরে সে বেশ পয়সা রোজগার করিয়াছে, এ সংবাদ দরিয়া-বিবি জানিত। তার আরো প্রমাণ, বর্তমানে

তার সংসারে দুই স্ত্রী বর্তমান। কয়েক মাস আগে আর একটী বিবাহের যোগাড় করিয়াছিল। প্রতিবেশী ও দ্বিতীয় স্ত্রীর আত্মীয়দের জুলুমে ইয়াকুব সে সদিচ্ছা পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিল।

—আজহার-ভাই কোথা? একটী মাদুরের উপর বসিয়া ইয়াকুব জিজ্ঞাসা করিল।

দরিয়া-বিবি আগে এক গ্লাস পানী দিয়াছিল। এখন ইয়াকুবের জন্য পান সাজিতেছিল। সে পান-ই সাজিতে লাগিল, কোন জবাব দিল না।

ইয়াকুব আবার প্রশ্ন করিল: ভাই কোথা?

আমি কী জানি? আজ পনর দিন বেরিয়েছে। একটা খবর পজ্জন্ত দেয়নি।

—আচ্ছা মজার লোক। খালি দোকান-দোকান আর ব্যবসার ঝোক। ও-সব ভাল-মানুষ দিয়ে ব্যবসা হয় না।

ইয়াকুবের হাতে পানের খিলি দিয়া দরিয়া-বিবি জবাব দিল, কে বোঝাবে বল। মাঝে মাঝে খেয়াল চাপে।

—আজহার-ভাই ওই রকম। কত জায়গায় কত রকমের ব্যবসা ফেঁদেছে। শেষ পর্যন্ত টিকে থাক্‌তে পারে না। সেটাও মহা দোষ।

অবেলা। দিনের আলো ক্রমশঃ নিভিয়া আসিতেছিল। ইয়াকুব হাসির ঢেউ তুলিয়া পকেট হইতে একটী দশ টাকার নোট বাহির করিল।

—ভাবী কিছু মনে করবেন না। আমি রাত্রে খিচুড়ী খাব। ঘি আর ভাল চাল কিনে আনাও। মুর্গী পাড়ায় পাওয়া যায়?

—পাড়ায় পাওয়া যায় না, তবে আমার ঘরে আছে।

—বহুত আচ্ছা।

দরিয়া-বিবি নোট গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। এমন মেহ্‌মান না আসাই ভাল। অপমানিত হওয়ার ক্লিষ্টতা তার বুকে গিয়া বিঁধিল। ইয়াকুব নাছোড়-বান্দা। আমজাদ ও নঈমা পাশে দাঁড়াইয়া পিতার ফুপাতো ভায়ের কাণ্ড দেখিতেছিল।

ইয়াকুব দুই জনের হাতে দু'টী পাঁচ টাকার নোট গুঁজিয়া দিল।

—খোকা-খুকী, তোমরা মিষ্টি কিনে খেয়ো।

দরিয়া-বিবি আরো প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু ইয়াকুব কর্ণপাত করিল না।

—এমন ব্যাপার করলে আমার বাড়ী এসো না, ভাই। আমরা গরীব।

অভিমান-ক্ষুণ্ণ ইয়াকুব কহিল:—আমার ভাইপো-ভাইঝিরা আমার পর? বেশ, তুমি যা-খুশী বলো। আজহার ভাই আসুক না।

আবার প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল ইয়াকুব, সে যেন কত রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছে।

দরিয়া-বিবিকে অগত্যা উঠিতে হইল। খাতিরদারীর সরঞ্জাম অল্প নয়।

আমজাদ নিজের নোটটী সযত্নে ভাঁজ করিয়া মার হাতে দিল। তার ফুরসৎ নাই। ঘিয়ের জন্য কৈবর্ত্ত-পাড়ায় যাইতে হইবে। এমন মজুরী পাইলে সে কাজে অবহেলা করিতে রাজী নয়। একটী বোতল হাতে সে চলিয়া গেল।

মুর্গী জবাই করা হইল তখন-ই। দরিয়া-বিবির একটী বড় মোরগ ছিল, সে-টী এখনও বাড়ী ফেরে নাই। কত দেরী হইবে কে জানে। বাড়ীর মুর্গী নষ্ট করিলে আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যায়। ডিম আর বাচ্চা রোগীর জন্য অনেকে ক্রয় করে।

রান্না-ঘরে দরিয়া-বিবি খুব ব্যস্ত। ছোট খুকীটা ভয়ানক কান্না জুড়িয়াছিল।

ইয়াকুব অভয় দিল, ভাবী, রান্না করো। আমি খুকীকে কোলে নিই।

খুকীর কান্না থামিয়া গেল। তাকে কোলে লইয়াই ইয়াকুব রান্না ঘরে প্রবেশ করিল। দরিয়া-বিবি বসন সংযত করিতে সময় পায় না।

অপ্রস্তুত হইয়া ইয়াকুব বাহিরে ফিরিয়া বলিল, ভাবী, তোমার খুকীটা বেশ।

হ্যাঁ ভাই। বেশ সুন্দর হয়েছে মেয়ে।

ইয়াকুব আবার খুকীকে দোলাইতে-দোলাইতে রান্না ঘরে প্রবেশ করিল।

হাসিয়া সে বলিল, তা হবে না, মা কেমন ?

লজ্জায় রাঙা হইয়া ওঠে দরিয়া-বিবির মুখ। গোস্তের হাঁড়িতে মশলা দিতেছিল সে। ধনে ভাজা নাই। একটী তাওয়া' চড়াইয়া দিল দরিয়া-বিবি। ইয়াকুবের উপস্থিতি একটু অসোয়াস্তিকর।

দরিয়া-বিবি ডাকিল, ইয়াকুব ভাই।

—জী।

—বাইরে যাও না। তুমি কী রান্না শিখবে ?

—কে শেখায়, ভাবী।

—থাক, আর শিখে কাজ নেই! তুই বাঁদীর ঘর—তার আর রান্না শিখতে হয় না।

—হয় বৈকি।

—তুমি খুকীকে বাতাসে নিয়ে যাও। যা-ধোঁয়া এখানে।

দরিয়া-বিবি নিজ মনে রান্না করিতে লাগিল।

ইয়াকুবের কথা যেন শেষ হয় না। সে আবার আসিল খুকীকে কোলে করিয়া।

ভাবী, আজহার ভাই পনর দিন গেছে, খবর দেয়নি ?

—না।

—তুমি বলে তার সংসার করো। এমন লোক, খবর দেবে না তা বলে।

আমরা ত তার কেউ নই।

দরিয়া-বিবি চুলায় ফুঁক দিতেছিল বাঁশের চোঙ্গার সাহায্যে। ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিতেছিল সারা রান্না-শাল।

—আহা। এমন সুন্দর খুকী, তার মায়া তাকে বেঁধে রাখতে পারে না।

বড় বিরক্ত বোধ করিতেছিল দরিয়া-বিবি।

—টাকার মায়া সব চেয়ে বড়। আবার কোথাও কিছু ফেঁদে বসেছে, লাখ টাকা কামাবে। সেবার চন্দ্র কোটাল ওর খোঁজ পেয়ে তবে ফিরিয়ে আনে।

—দেখা যাক্, আমি-ও চেষ্টা করব।

—অত দয়ায় কাজ নেই। নেই আসুক সে।

ইয়াকুব দরিয়া-বিবির চোখের দিকে চাহিল, জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। হয়ত ধোঁয়ায়, হয়ত সাংসারিক তাড়নার আঘাতে। ইয়াকুব তা উপলব্ধির চেষ্টা করিল।

দরিয়া-বিবি কোন সহানুভূতি চায় না। ইয়াকুব উঠিয়া গেলে সে সন্তুষ্ট হয়। আড়-চোখে তার দিকে চাহিয়া দরিয়া-বিবি ধূমায়িত চুলায় আরো ধোঁয়া করিতে লাগিল, তারপর বলিল, উঠে যাও না, ভাই। খুকীদের বড় চোখের দোষ হয় ধোঁয়া লেগে।

ইয়াকুব অনিচ্ছা-সত্ত্বে উঠিয়া গেল।

গেরস্থালির কাজ, মেহ্‌মানের জন্য বিশেষ রান্না। বহু দেরী হইয়া গেল। দু-টী মাত্র ঘর, ইয়াকুবের শোয়ার জায়গা, আর এক সমস্যা। আজ আমজাদকে দাওয়ায় শুইতে হইল!

গঞ্জের কাজ সারিয়া আরো তিন দিন ইয়াকুব এইখানে রহিয়া গেল। আজহারের তল্লাসী করিতেছে সে। কৃতজ্ঞতায় গলিয়া দরিয়া-বিবি, খাতিরদারীর ত্রুটী না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিল। দু-হাতে খরচ করিতেছিল ইয়াকুব। সন্দেশের স্বাদ এই বাড়ীর ছেলেরা মৌলুদ শরীফ বা পাড়ার কোন বিশেষ উপলক্ষে চাখিতে পায়। ইয়াকুব নানা রকমের মিষ্টি কিনিয়া আনিয়াছিল। ময়দা, ঘি, পরাটা আরো চর্ব্য-চুষ্যের ব্যবস্থা সে রীতিমত করিতেছিল।

বাড়ীতে ধূম লাগিয়াছে উৎসবের! আসেক্‌জানকে পর্যন্ত ইয়াকুব বাহির হইতে দেয় নাই। সে-ও অতিথি এই বাড়ীর।

দরিয়া-বিবি চক্ষু-লজ্জার জন্য কোন কথা ইয়াকুবকে বলে নাই। নচেৎ সে-ও এই মহসিনী-পনা খুব ভাল চোখে দেখিতেছিল না।

আরো দুই দিন থাকিয়া বিদায় লইল ইয়াকুব। আমজাদ অনেক দূর তার সঙ্গে আসিল।

২১

হাসু-বৌ আমজাদকে দুপুর বেলা ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ী যায় নাই সে। পাড়ার এক টেরে গাছের ছায়ায় একটী গুঁড়ির উপর দুই জনে বসিল।

—কেন ডেকে আন্‌লে, আমজাদ জিজ্ঞাসা করে।

—লক্ষ্মী ছেলে, বসোনা—সন্দেশ কিনে দেব।

—না, জল্‌দি বলো।

হাসু-বৌ ইতস্ততঃ করিতেছিল।

—মুনি, আর আস্‌বে না?

—আমি কি জানি। মা কত কাঁদে। আব্বার সঙ্গে কথা বলে না।

হাসু-বৌ বলিল, তোর আব্বা চলে গেল। মুনি-ছেলেটা ভারী বদ।

আমজাদ সায় দিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখচোরা ভাব কাটিয়া যাইতেছে।

—বদ! তুমি ভারী ভালো?

হাসু-বৌ আমজাদকে আদর করিতে লাগিল। না, সে বেশ ভাল। আমজাদ একটু দুরে সরিয়া গিয়া আবার ব্যঙ্গ করিল, আমাকে আদর করতে হবে না। মুনি-ভাই নেই, তাই,—

হাসু-বৌ অবাক হইয়া যায়। এইটুকু ছেলে, তারও মনে ঈর্ষার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে।

হাসু-বৌ তার নিকটে সরিয়া আসিল। আবার তার চুলের উপর হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিল। না, তুমি বেশ ভাল ছেলে।

আমজাদ জবাব দিল না।

হাসু-বৌ পুনরায় বলিল, যদি তুমি একটা কাজ করো, তোমাকে বেশী আদর করব।

—কি শুনি।

—একবার মুনির খবর নিতে পারো।

—আমি কি করে নেব ?

হাসু-বৌ আনমনা, গাছ-পালার ফাঁক-অতিক্রান্ত দূরের আকাশের দিকে চাহিয়াছিল।

খোঁয়ার কাটাইয়া সে আবার বলিল, তুমি তাদের গাঁয়ে যাও না।

আমজাদ অক্ষমতা জানাইল।

—খুব বেশী দূর নয়। আমি গোরুর গাড়ীর পয়সা দেব।

—মা যে বক্‌বে।

—না। স্কুলে যাওয়ার নাম করে চলে যাবে।

হাসু-বৌ আঁচলের গিঁঠ খুলিয়া একটা আধুলি বাহির করিল।

—এই নাও, তোমার কাছে রেখে দাও, কতক্ষণ আর লাগ্‌বে।

—মা যদি শোনে ! শঙ্কিত-দৃষ্টি আমজাদের চোখে।

—না, কেউ বল্‌বে না।

মহেশ-ডাঙায় গাছপালা এত ঘন। এই জায়গাটা আরো নীরব। বাতাসের মৃদু নিনাদ ঝোপেঝাড়ে এক দল বুনো পাখী কোথায় অদৃশ্য থাকিয়া হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল।

—তুমি যাবে ?

হঁ্যা। মাথা দোলাইল আমজাদ।

—বেশ লক্ষ্মী ছেলে।

হাসু-বৌ সুকুমার-মতি বালকের চোখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আনমনা আলিঙ্গনে জড়াইল আমজাদকে। বেশ লক্ষ্মী ছেলে তুমি। মৃদুভাবে বন-ক্রোড়ের নীরবতা হঠাৎ চমক খাইতে থাকে।

—বেশ লক্ষ্মী ছেলে তুমি।

—আমাকে ছেড়ে দাও।

—না।

—মুনি-ভায়ের মত আমার গালে কামড়ে দিয়ো না যেন, হাসু-চাচি। হাসু-বৌ স্তব্ধ হইয়া আলিঙ্গন শ্লথ করিয়া দিল, দূরে সরিয়া গেল সে।

আমজাদ হাসিতে থাকে। বলে, "হাসু-চাচি, মুণি-ভাই একটা খ্যাপা।

প্রজাপতি ধরে বলে ওর রঙ্ তুলে গায়ের জামা রাঙাব।"

নিরুত্তর হাসু-বৌ।

—আচ্ছা, চাচি, প্রেজাপতির রঙে জামা রঙ্ করা যায়?

—হ্যাঁ। আমি তোমার জামা রঙ্ করে দেব। তুমি একবার মুনির খবর এনে দাও। দেখো না, তোমার মা কত কাঁদে।

মার নামে আমজাদের করুণা হয়! দৃঢ়কণ্ঠে সে জবাব দিল: নিশ্চয় যাব। চার আনা গোরুর গাড়ীর ভাড়া। আমি চার আনার মুড়ি কিনব।

হাসু-বৌ হাত বাড়াইল আমজাদের দিকে। সে তখন এক দৌড়ে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

২২

দরিয়া-বিবি ছোট মেয়েটীর নাম রাখিয়াছিল শরীফন। ডাক-নাম শরী। শৈরমীর স্মৃতি একবার তার মনে জাগিয়াছিল বৈকি। সেই দীন-জীবনের করুণ অবসান-মুহূর্ত! ডাক-নামে শৈরমীর স্মৃতি বাঁচিয়া থাক। দেশের বিশাল মানচিত্রের এক কোণে নামহীন গ্রাম্য-জননীর দীন প্রচেষ্টা, জাতি-ধর্ম্ম যেখানে মানবতার উপর নৈরাজ্যের কোন ফনা মেলিতে পারে না।

কিন্তু গ্রামে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল।

রোহিনী চৌধুরী ও হাতেম খাঁর মধ্যে গত কয়েক বছর একটী বিঘা-পঞ্চাশের জলাশয় লইয়া মন-কষাকষি চলিতেছিল। এতদিন জলাশয় চৌধুরীদের দখলে ছিল। দলীলে হাতেম খাঁর প্রাপ্য হইলেও সে ইহার কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই। জলাশয় জমা লইয়াছিল কয়েক জন মুসলমান জেলে। ইহাদের ভদ্রবংশীয় মুসলমানেরা আত্‌রাফ বলে। বিলের আয় মন্দ নয়। হাতেম খাঁ কয়েকজন আত্‌রাফ-কে হাত করিয়া খাজনা বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্ররোচনা দিল। তাহারা সেই-মত খাজনা বন্ধ করিয়াছে। রোহিনী চৌধুরী এই শলা-পরামর্শ ভালরূপ আঁচ করিয়াছিল। তিনি বাগ্‌দী ডোম-শ্রেণীর কৃষক-হিন্দু হাত করিয়া গ্রামে তিনি দাঙ্গার প্ররোচনা দিতে লাগিলেন।

হাতেম বখ্‌শ ইদানীং ঘোরতর মুসলমান সাজিয়াছে। তার পুত্রেরা অন্দর মহলেই শরাব পান করেন। তিনি কোন কথা বলেন না। নিজেও নামাজ-রোজার ধার ধারেন না। বর্তমানে জুম্মার নামাজের সময় হাতেম বখ্‌শ-কে মস্‌জিদে দেখা যায়। তাঁর কালো-সাদা দাড়ী শ্বেত-খেজাফে আরো শুভ্র রং ধারণ করিয়াছে। সাদা পিরহান হাঁটু পর্যন্ত ঝুলাইয়া একটী 'আশা' (ছড়ি) হাতে গ্রামের অন্ধকারে দারোয়ান সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান। বৈঠক, শলা-পরামর্শ আর যুক্তির

বছর। নামাজের সময় না হইলেও তিনি এত্তেলা দেন। নামাজ 'কাজা'-করা শক্ত গোনাহ। হাদিছ-কোরানের সম্প্রতি এজেন্সী লইয়াছেন তিনি। গ্রামের মক্তবগুলির জীর্ণ-দশা। এক পয়সা তিনি খরচ করেন নাই। বর্ত্তমানে তিনি একটী 'তা'মদারী' করিয়া গ্রামের মুসলমানদের পোলাও-কোর্ম্মা খাওয়াইলেন। কাফের হিন্দু জমিদার মুসলমানদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িবে, এই কথা পাকেপ্রকারে প্রচারণার খোলসে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

নিস্তেজ মহেশ-ডাঙার জীবনে তবু চাঞ্চল্য ফিরিয়া আসিয়াছে। হিন্দু-পাড়ায় রোহিনী চৌধুরীর কার্পণ্য নাই। প্রচারণা শক্তি তাঁর-ও কম নয়।

সাকেরকে হাতেম বখ্শ এতদিন আমল দিত না। তার লাঠির জোর দশ গাঁ জানে। হাতেম বখ্শ দাওয়াৎ খাওয়াইয়া, টাকা-পয়সার ঘুষে তাহাকে ক্রয় করিয়া ফেলিল। সে-ও হাল-ফিল ভয়ানক মুসলমান হইয়া উঠিয়াছে। ঈমামের পেছনে 'ইমামের যা নিয়ৎ আমার-ও তাই' বলিয়া ঈদ এবং বকর-ঈদে সে বছরে দুইবার মাত্র নামাজ পড়িত, সে-ও নামাজ শিখিতেছে। বাংলা নামাজ-শিক্ষা গঞ্জ হইতে কিনিয়া আনিয়াছে। ঠিকমত আরবী উচ্চারণ হয় না, তা লইয়া হাসাহাসি করিতে গিয়া হাসু-বৌ ভয়ানক তাড়া খাইল। নূতন কাক নাকি বিষ্ঠা খাওয়ার যম, এমন মন্তব্য করিয়াছিল নিরীহ বৌ'টী। 'সুপারি খাওয়া ছাড়ো, তোমার জিভ সরল হোক'।

চন্দ্র কোটাল পালের গোদা সাজিয়াছে। শেখ-পাড়ার একজন মুসলমানের সঙ্গে জমির আল লইয়া গত বৎসর তার বচসা হইয়াছিল। রোহিনী চৌধুরীর মোসাহেবরা সেই উপলক্ষ্য যথারীতি কাজে লাগাইল। পাড়ায় পাড়ায় চন্দ্র কোটাল বলিয়া বেড়াইতেছে, মুসলমানেরা যদি টুঁ-শব্দ করে উড়িয়ে দাও তুড়ি দিয়ে।

জলাশয়ের পাশে একদিন দুই প্রজা-দলে ছোট-খাট সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। কয়েকজন জখম হইয়াছিল। আদালতে মামলা দায়ের হইল। আহতদের পয়সা নাই। চৌধুরী ও হাতেম বখ্শের যখন পয়সা আছে

তখন কোন কিছুর অভাব হইবে না।

গ্রাম থমথম করিতেছে।

এমন-ই আসন্ন অপরাহ্নে আজহার খাঁ ফিরিয়া আসিল। কাঁধে ঝোলানো থলে। তার ভেতর মণিহারী দ্রব্য। লাটিম, আল্‌তার ডিপা, ছোট মেয়েদের হাতের চুড়ি ইত্যাদি।

নঈমা ও আমজাদ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রত্যেকে উপহার পাইয়াছে। আমজাদের জন্য খাতা-পেন্সিল, লাল রবার। লাট্টু-লত্তি জোর করিয়া সে আদায় করিল। নঈমার সওগাত কান্‌ফুল, কয়েকটী রেশমী চুড়ি।

দরিয়া-বিবি স্তব্ধতা ভাঙিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানের সেতু তেমন-ই যোগ-ছিন্ন। তিরিশটী টাকা আনিয়াছিল আজহার খাঁ। চার মাস সে বেকার বসিয়া থাকে নাই। তবে দোকান সে করিয়াছিল গত এক মাস। দোকানদারী পোষাইল না।

দরিয়া-বিবির হাতেও টাকা ছিল। ইয়াকুব দেদার খরচ করিয়া যায় এইখানে। গঞ্জের দিনে সে প্রায়ই আসে। আজহার ফিরিয়া না আসিলে, তার কোন হাত-টান হইত না। আমজাদের স্কুলের বেতন পর্যন্ত ইয়াকুব মাস-মাস দিবে বলিয়া শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেয় নাই, তিন মাসের টাকা অগ্রিম দিয়া গিয়াছে।

গ্রামের কথা শুনিয়া আজহার থ' হইয়া গেল। আমজাদ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিতে লাগিল পিতার নিকট। সাকের-চাচা নাকি বলিয়াছে, রোজগারের মরসুম এসেছে। সে দুই জমিদারের নিকট টাকা লুটিতেছে। রোহিনী চৌধুরীকে সে আশ্বাস দিয়াছে, দাঙ্গার দিন লাঠি ধরব না, কসম করছি—ব্যস, দেখব হাতেম বখ্‌শ কত লেঠেল আনে। হাতেম বখ্‌শকে সাকের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, পাঠানের বাচ্চা শেষ লাঠি-খেলা দেখিয়ে যাব।

আজহার খাঁ বিলম্ব করিল না। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া একদম মাঠের দিকে গেল। বাজে ঝঞ্ঝাটের চেয়ে মাঠের অবস্থা তার প্রথমে জানা দরকার। মাঠ, ফসল, তার কাম-ধেনু। ওই বছর ফসল পাইয়াছিল

বলিয়া সংসারের শ্রী বজায় আছে।

সকলে রবি-ফসলের চাষ দিতেছে। গরু-বাছুরের জুলুমের জন্য কয়েকজন চাষী বাখারীর বেড়া প্রস্তুত করিতেছে। পটল দিবে সকলে এবার। তরমুজ গত-বছর ভাল ফলে নাই। কুমড়া আর মূলোর চাষ চলিতেছে।

দেরী হইয়া গিয়াছে তার। তা হোক। 'নাবি' ফসল হইবে। সে-জন্য আজহার বেশী অনুতাপ করিল না।

চন্দ্র কোটালের সঙ্গে দেখা-করা দরকার। চন্‌দর। মনে মনে হাসিয়া উঠিল আজহার। সন্ধ্যার পদক্ষেপে শূন্য মাঠের আইল বিচিত্র বর্ণে অদৃশ্য হইতেছে।

চন্দ্র দাওয়ায় বসিয়াছিল, আজহারকে সে অভিভাষণ জানাইল না, বসিতে পর্যন্ত বলিল না।

— চন্দ্র।

সে নিরুত্তর।

এলোকেশী একটী পিড়া বাহির করিয়া আজহারকে বসিতে দিল। চন্দ্রমণি আসিল পিছু পিছু।

আজহার ডাকিল, চন্দ্র।

কোন জবাব দিতেছে না সে। এলোকেশীর দিকে ফিরিয়া আজহার বলিল, কি, আজ চন্দ্র নেশা করে বসে আছে?

এলোকেশী ভয়ানক রাগিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল: ও কী, বসে আছ যেন সং। লোক এলো কথা বলো। গাঁয়ে হিঁদু মুসলমানে ঝগ্‌ড়া তো ভা'-য়ের সঙ্গে কী। যতসব অপদিষ্টি, হতচ্ছাড়া লোক।

এলোকেশী বলিতে লাগিল: জমিদারে জমিদারে ঝগ্‌ড়া। বড় লোকে বড় লোকে দলাদলি, তোদের কী? তোদের জমিদারী দিয়ে যাবে—ওই যে বসে আছে, রোহিনী বাবু জলাশয়টা ওকে দিয়ে যাবে। তাই নিয়ে দিন-রাত টইটই হিঁদুপাড়ায় ঘুর্‌ছে।

যার উদ্দেশ্যে বাক্যবর্ণ বর্ষিত হইতেছিল, সে নির্জীব মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। বোকা-চোখ মিট্‌মিট করিয়া সে আজহারের দিকে

চাহিয়া আবার চোখ ফিরাইয়া লইল।

কল্কে সাজিয়া আনিল চন্দ্রমণি। আজহার নীরবে টানিতে লাগিল। ধোঁয়া-ছাড়ার অবকাশে সে আবার ডাকিল: চন্দর।

আজহার স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। বড় ক্ষুণ্ণ কণ্ঠ তার: চন্দর! আমি এতদিন দেশ-ছাড়া। জানি চন্দর আছে। বড় লোকে বড় লোকে দলাদলি আমরা গরীবেরা কেন ওর মধ্যে?

এলোকেশী আবার এক পশলা বর্ষণ করিয়া গেল। দাওয়ায় একটা মাদুরে আড় হইয়া চন্দ্র হুঁকা পান করিতে লাগিল। ভীষ্মের শরশয্যা আরম্ভ হইল। এলোকেশীর বাণ তা-হইলে ব্যর্থ হয় নাই, কিন্তু ভীষ্ম দেব শরে কাতর নন, কণ্ঠস্বরে কাতর হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। একবার সে হাই তুলিল।

সন্ধ্যায় গ্রাম ছাইয়া গিয়াছে।

উঠানে নীরবতা। দূরে মাঠে বাছুর ডাকিতেছিল।

আজহার উঠিবার পূর্ব্বে বলিল, যোগীনের মা, আবার কাল আসব, আজ ওর মেজাজ ঠিক নেই।

ভিটার উপর হইতে নামিয়া পড়িল আজহার অন্ধকার প্রলেপিত মাঠে; তার মনের মতই শূন্য। সে বাতাসের পদ-সঞ্চালন-ধ্বনি শুনিতে লাগিল।

একবার উৎকর্ণ হইল আজহার। চন্দ্র কোটাল গাল পাড়িতেছে: না আমার দু-চোখ নেই আর মুসলমানদের দেখি—দু-চোখ নেই—

এলোকেশীর কণ্ঠস্বর তার সঙ্গে: তা থাক্‌বে কেন? তাড়ি গিলে গিলে চোখের মাথাও যে গিলেছে।

আবার ভর্ৎসনার শর-জাল: চুপ শালী।

এলোকেশীর জবাব: আমার বোনের সঙ্গে অত কেন। নিজের বোন-কে দিয়ে এসো না রোহিনী বাবু-কে। এখনো ত বয়স রয়েছে—পীরিতি করবে—

আজহার চলিতে লাগিল। এই একটীমাত্র আত্মভোলা মানুষকে চিনিয়াছিলো, সে তার কত নিকট। এতটুকু দরদের জায়গা আর নাই তার পৃথিবীতে।

পেছনে ফিরিয়া আজহার অব্যক্ত বেদনায় কোটালের ভিটের দিকে আবার চাহিল। দুই চোখ তার জলে ভরিয়া উঠিল। দরিয়া-বিবি কি মরিয়া গিয়াছে ?

পরদিন বিকালে আজহার রবি-ফসলের জন্য জমি তৈয়ারী করিতেছিল। বহুদিন মূলা চাষ করে নাই সে। এইবার মূলা ও তরমুজ দেওয়া হইবে এইখানে। জমির কিনারায় শকর-গঞ্জ আলু। আমজাদও সঙ্গে আসিয়াছিল। আজকাল আজহারকে সে খুব এড়াইয়া চলে। কিন্তু পিতার নিস্তব্ধ গাম্ভীর্যের সম্মুখে সে ভয়ানক ভীরু। মাঠে কাজ করা তার ভাল লাগে না। স্কুলের পড়ুয়া, সে কেন সাধারণ চাষীর মত এই বয়সে জমির খবরদারী করিবে ?

পিতার আদেশ সে নীরবে পালন করে। কয়েকটী বাঁশ কাটিয়া আনিয়াছিল আজহার। আমজাদ তার বাখারী তুলিতেছিল। গরু-বাছুরের যা' জুলুম, বেড়া না দিলে ফসল আদায় হইবে না।

আরো কৃষক দূরে দূরে কর্ম্মব্যস্ত। এক মাসে এই খানে সমীর-চঞ্চল ধান-বন রং-রেখায় মাঠগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এখন শূন্য ক্ষেত। খামারে খামারে গাদা উঠিয়াছে। অবেলার শূন্যতার মধ্যেও তেমন ভ্রূকুটীর ছায়া নাই। গ্রীষ্মকালে সমস্ত প্রান্তর যেন গ্রাস করিতে আসে।

আজহার সমগ্র মাঠের দিকে তাকায় না। আমজাদ নীরবে কাজ করিতেছিল।

শীষ-ধ্বনি শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। নিশ্চয় চন্দ্র-কাকা আস্‌ছে, কয়েক বিঘা দূরে-ই তার জমি। খালের ঢালু পাড় হইতে চন্দ্র কোটালের অবয়ব ক্রমশঃ দৃশ্যমান হইতে লাগিল।

আমজাদের কাজে মন নাই। এখনি চন্দ্র-কাকা আসিয়া পড়িবে। তখন হয়ত তাহাকে কোন কাজ-ই করিতে হইবে না। তার মৃদু হাস্যে কপোল রাঙিয়া উঠিতেছিল।

চন্দ্র কোটাল সোজা এই জমির দিকে আসিল না। একটী কলাগাছের আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু তার স্বতঃস্ফূর্ত শীষ বহু আগে নিভিয়া গিয়াছে।

আমজাদ-ই প্রথম সম্ভাষণ জানাইল—ও চন্‌দর কাকা। চোখাচোখি দুইজন। হাস্য সম্বরণ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল কোটাল।

ও, কাকা!

কাকা কোন জবাব দিল না।

আজহার কোদাল চালাইয়া জমি পরিপাটী করিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া আবার চক্ষু-অবনত করিল।

আমজাদ হাসি-মুখে অগ্রসর হইতে গেল। আজহার ধমক দিল, কাজ কর, আমু।

চন্দ্র কোটাল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তার দৃষ্টি অন্য দিকে। আজহার নীরব, নত-মুখে কাজ করিতে লাগিল। দু-জনে যেন কোন পরিচয় নাই। আমজাদ মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছিল। গাঁয়ে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। তার-ই কী ফল এই?

চন্দ্র কোটাল জমির পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল গাছপালার আড়ালে। সন্ধ্যার বেশী দেরী নাই।

আমজাদ জিজ্ঞাসা করিল, চন্দর কাকা কথা বল্‌ল না যে?

'না।'

পিতার জবাবের ধাঁচ দেখিয়া আমজাদ আর অন্য প্রশ্ন করিল না।

শীষের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল। নিশ্চয় চন্দ্র কাকা। আমজাদ সায়ং-বিষণ্ণ, মাঠের দিকে বারবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

২৩

চন্দ্রমণির সঙ্গে আজহারের পথে হঠাৎ দেখা হইয়াছিল। মাঝে মাঝে চন্দ্রমণি গ্রামের ভেতরে আসে। চন্দ্র-ই কেবল গ্রাম-ছাড়া, তার অন্যান্য আত্মীয়রা এখন-ও পূর্ব্ব-পুরুষের ভিটায় বাস করিতেছে।

আজহার অন্য-মনস্ক পথ হাঁটিতেছিল। 'ও দাদা' শব্দে সে চমকিত হইয়া প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইল। না, চন্দ্রমণিকে সহজে চেনা যায় না। তার খোলস-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বেশ পরিষ্কার কাপড় পরনে, পানের কষে ঠোঁট দুটি রাঙা। বিধবা বলিয়া চন্দ্রমণির যেন কোন পরিচয় নাই। আজহার চন্দ্রমণিকে কোন যুবতী পর-স্ত্রী মনে করিয়া হঠাৎ অপ্রস্তুত বোধ করিতেছিল।

'ও দাদা', আমি চন্দ্র-মণি।'

আজহার সেদিন বৈকালে চন্দ্রমণির এই রূপ দেখে নাই। অবাক হইয়া গেল সে। চন্দ্র কোটালের আয়-উপার্জ্জন নিশ্চয় বড়িয়াছে। রাজেন্দ্রের সঙ্গে ভাঁড়-নাচের দল গড়িয়া সে ভাল-ই করিয়াছে।

—ও মণি, তুই! আমি ত ভাবছিলাম আর কেউ।

চন্দ্রমণি কিশোরীর মত হাসিতে লাগিল। এক বছর আগে ম্যালেরিয়া-জ্বরে কি 'ছিরি' না হইয়াছিল তার।

—তুমি আর যাও না যে, দাদা!

আজহার লজ্জায় মুখ নীচু করিল।

—কি করে যাই! চন্দর একদম কথা পর্যন্ত বলে না।

—ও নিয়ে বৌদির সঙ্গে রোজ ঝগ্‌ড়া বাধে।

চন্দ্রমণি এলোকেশীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

—চন্দ্র-কে সেদিন দেখ্‌লাম। ওর শরীরটা খারাপ।

রাখালেরা একপাল গরু তাড়াইয়া আসিতেছিল। চন্দ্রমণি ও আজহার পথের এক-পাশ হইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

– শরীর খারাপ হবে না। কত তাড়ি গেলে। আর আজকাল দাদা কি যেন হোয়ে গেছে।

—কি হোয়েছে?

– সে মন-মেজাজ আর নেই। আমাকে দেখ্‌তে পারে না। কথায় কথায় গালি-গালাজ।

—খামাখা?

—হ্যাঁ, দাদা।

আজহার চন্দ্রকোটালের এই অধঃপতনে কোন দুঃখ প্রকাশ করিল না। গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আরো একপাল গরু আসিতেছে। আজহার সেইদিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল, চন্দ্র আসলে ভাল মানুষ। ও কেন এমন হোয়ে গেল?

—কি জানি।

—রাজেন্দ্রের পাল্লায় পড়েছে?

চন্দ্রমণি হঠাৎ কোন জবাব দিল না: চুপ করিয়া গেল।

আজহার প্রসঙ্গ-স্রোত বন্ধ করিল না: রাজেন্দ্র ছোঁড়াটা তেমন ভাল নয়। ওর সঙ্গে বেশী তাড়ি গেলে বোধ হয়।

—না, দাদা! রাজেন্দ্র—

চন্দ্রমণি অস্বোয়াস্তি বোধ করিতেছিল, কণ্ঠস্বরে তার প্রমাণ।

—গাঁয়ের বড় লোকদের ঝগড়া থেকে দাদার মেজাজ আরো বিগ্‌ড়ে গেছে।

সত্যি, মণি। আমি-ও রাগে সেদিন চন্দ্রের সঙ্গে কথা বল্‌লাম না। ও মাঠে এসেছিল। আমার-ও মেজাজের ঠিক নেই।

চন্দ্রমণি আবার হাসিতে লাগিল। আমার দুই দাদা-ই পাগল। আজহারকে রসিকতা স্পর্শও করিল না।

পুরাতন খেই টানিতে ব্যস্ত সে: আজকাল্ রোজগার কেমন করছে?

—তা মা লক্ষ্মীর কৃপায় বেশ। নাচের দলে দু-পয়সা হয়।

আজহার হঠাৎ হিংসুকের মত বেদনা অনুভব করে। বেশ আছে চন্দ্রকোটাল।

—আমি যাই দাদা, আর একদিন আস্‌বেন।

চন্দ্রমণি আর সেখানে দাঁড়াইল না।

২৪

দুই জমিদারে মামলা বাধিয়াছে। গ্রামে আর কোন গোলমাল নাই। সাময়িক উত্তেজনা নিভিয়া গিয়াছিল। চন্দ্রকোটাল আজহার-কে এড়াইয়া চলে। দুই পরিবারে পূর্ব্বের মত সদ্ভাব নাই। এলোকেশী কোনদিন ঝগড়া-কলহ পছন্দ করে না। কোটালের সঙ্গে তার মত-বিরোধ প্রায় দেখা যায়। আজহার বহুদিন চন্দ্রের বাড়ীর ভিটার পাশে গিয়া-ও তার সঙ্গে সাক্ষাত করা সাহসে কুলাইয়া উঠিতে পারে নাই। সাকের আবার রোহিণী চৌধুরীর সঙ্গে খাতির পাতাইয়াছে। কিষাণেরা রবি-ফসল লইয়া ব্যস্ত। জমিদারের কোন্দলে কারো কোন উৎসাহ নাই।

এলোকেশী একদিন স্বেচ্ছায় দরিয়া-বিবির সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। আজহার বাড়ী ছিল না, আলু-বীজ ক্রয় করিতে ভিন-গাঁয়ে গিয়াছিল।

দরিয়া-বিবি রৌদ্রে বসিয়া পান্তা খাইতেছিল তখন।

এলোকেশী হাসিয়া বলিল, ঠিক সময়ে এসেছি।

—এসো, দিদি।

শশব্যস্ত দরিয়া-বিবি একটী পিঁড়া আগাইয়া দিল।

কিন্তু এলোকেশী আরো বেশী ব্যস্ততা দেখাইতেছিল।

—তুমি খেয়ে নাও, আমি এখ্‌খনি উঠব।

—এত তাড়া কেন? ও, আমার সঙ্গেও ঝগড়া আছে নাকি? এলোকেশী হাসিতে লাগিল।

—কেন, বলো দিদি। সব জায়গায় খালি কোন্দল। গাঁয়ে, আমার ঘরে।

—কোটালের সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

দরিয়া-বিবি যথা-দ্রুত আহার সম্পন্ন করিল। এলোকেশী তারপর দশটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, দিদি, এই টাকা ক'টা রেখে দিও। জমা রাখ্‌লাম।

—আমার কাছে কেন ?

—রেখে দাও।

পরে কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া সে বলিল, রেখে গেলাম। ঘরে কী রাখার যো আছে ?

—আজকাল নাচে বেশ পয়সা আস্‌ছে ?

—তা আস্‌ছে। রাজেন্দ্র ছোঁড়াটা বেশ কাজের। এখন বলে, যাত্রার দল করব।

আরো সাংসারিক কথা হইতেছিল। উঠানে হঠাৎ আগন্তুকের ছায়া পড়িল। এলোকেশী লোকটীকে কখনও এখানে দেখে নাই। সে তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা টানিল।

দরিয়া-বিবি উঠানের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

—এসো, ভাই। দরিয়া-বিবির ঠোঁটে কৌতুক-মাখা হাসি। আগন্তুক ইয়াকুব। দরিয়া-বিবি এলোকেশীর কানে কানে বলিল, আমার দেওর।

ইয়াকুব দাওয়ায় একটী মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল। হাতে একটী পুঁটলী ছিল। সে খবরদারীর ভার দিল দরিয়া-বিবির উপর।

—সব ভালো ? দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসা করিল। এলোকেশী লজ্জায় কলা-বৌ সাজিয়া বসিয়া ছিল। ধমকের সুরে দরিয়া-বিবি বলিল, ঘোম্‌টা খোল না, বৌ। ও আম্নাদের দেওর।

এলোকেশী ঘোমটা খুলিয়া ইয়াকুব-কে ভালোরূপে দেখিয়া লইল। —শরীর ভালো নয়, ভাবী। আজ চার দিন জ্বর। তোমার এখানে এসে পড়লাম।

—বাড়ী থেকে দু'দিন—তা-হলে জ্বর গায়ে-ই বেরিয়েছ ?

—হ্যাঁ।

এলোকেশী বিদায় হইল।

দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসাবাদে কসুর করে না।—জ্বর গায়ে বেরিয়েছ?

—হ্যাঁ।

—এ কি! আর কেউ ছিল না ব্যবসার জন্য? এতক্ষণ ইয়াকুব কোন অস্থিরতা দেখায় নাই। হঠাৎ সে চাপিয়া বলিল, ভাবী, একটু ঘুমোবার জায়গা করে দাও।

—দিচ্ছি। কিন্তু আমার বোনেরা কেমন-ধারা মেয়ে! তোমার জ্বর, অথচ গঞ্জে আস্‌তে দিল?

চুপ করিয়া রহিল ইয়াকুব। রৌদ্রের উত্তাপ তার শরীরে মনোরম লাগিতেছিল। সে বাহিরে মাথা বাড়াইয়া দিল। ছেলেদের পড়ার ঘরে দরিয়া-বিবি শয্যা রচনা করিয়া ফিরিয়া আসিল। তার মুখের কামাই নাইঃ ভারী খারাপ কথা। তোমার জ্বর। অথচ ছেড়ে দিল। কেউ খোঁজ নেয়নি, বোধ হয়?

নিঃস্তব্ধতা যেন ইয়াকুবের জবাব। তবু সে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, না। খোঁজ নিয়েছিল বৈকি। আমার মাথাটায় হাত দিয়ে ছাখো।

দরিয়া-বিবি কপালের উষ্ণতা পরীক্ষা করিল। ভারী গরম। তোমার মুখ দেখে অসুখ হোয়েছে বলে মনে হয় না। ওঠো, গিয়ে শুয়ে পড়।

দরিয়া-বিবি আবার বলিল, বাড়ীর লোকগুলো কী! এত জ্বর ছেড়ে দিলে?

ইয়াকুব জবাব দিল, আমি গঞ্জ থেকে আস্‌ছি। আসলে ইয়াকুবের মত মিথ্যাবাদী সংসারে অল্প। দাম্পত্য-জীবনে তার সুখ নাই। প্রায়ই দুই স্ত্রী কোন্দল বাধাইয়া থাকে। তা-ছাড়া তার মত পেশাদার লম্পটের কীর্তি-কাহিনী স্ত্রীদের কানে-ও প্রবেশ করে বৈকি।

স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছিল। দরিয়া-বিবি ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানে না। গ্রামের সঙ্গতিপন্ন মানুষদের মধ্যে ইয়াকুবের প্রতিপত্তি খুব বেশী। কারণ সে তাদের সমগোত্রীয়। ধান-আলু পেয়াজের কারবারে ইয়াকুব কত উপার্জ্জন করে, তা দরিয়া-বিবির অবগতির বাহিরে।

গত কয়েক মাস ইয়াকুব যাতায়াত করিতেছে। তার খোলা মন

স্বতঃই সমীহা আকর্ষণ করে। কোন ক্রুটী রহিল না দরিয়া-বিবির সেবায়। মাথায় উত্তাপ উঠিয়াছিল। ঠাণ্ডা পানী দিয়া তাহা সে ধুইয়া দিল। মোটা কাঁথা বিছাইয়া দিল তক্তপোষে। অবশ্য তা ইয়াকুবের টাকায় কেনা। গায়ে একটি ধোয়া তাঁতের চাদর দিল দরিয়া-বিবি।

আসেক্জান নিজে ঘর হইতে বাহির হয় না। সে আমজাদের নিকট খবর সংগ্রহ করিত। একটী পুরাতন শাল ছিল তার সিন্দুকে। কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি, আত্মীয়রা দান করিয়াছিল। দরিয়া-বিবি চাদরের জায়গায় শালের আবরণ চড়াইল বড় নির্ঝঞ্ঝাট গৃহ-সুখ অনুভব করিতেছিল ইয়াকুব, আমজাদ নিজে মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। নঈমা পিচুটী-ভরা চোখ লইয়া কৌতুহলে সব-কিছু দেখিতেছিল।

আজও ইয়াকুব কুটুম্বপনার কোন খুঁত রাখে নাই। ছেলেদের জন্য মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাবার আনিয়াছিল। পুঁটুলি নয় ছেলেদের রত্ন-ভাণ্ডার। ছোট খুকীর কথা পর্যন্ত ইয়াকুব ভোলে নাই। তাঁর পাৎলা জামা আনিয়াছিল।

দরিয়া-বিবি পথ্য তৈয়ার করিয়া আনিল। ইয়াকুব নিস্তেজ চোখে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে। বড় আরাম তার।

দরিয়া-বিবি বলিল, ডাক্তার ডাকাই, ভাই।

ঘোর আপত্তি জানাইল ইয়াকুব। না, এম্নি সেরে যাবে। ওষুধ-গেলা আমার ভাল লাগে না।

একটী নোট বাহির করিল সে, কথা ও সাগু শেষ করিয়া।

দরিয়া-বিবি কোন আপত্তি জানাইল না। কারণ এই ক্ষেত্রে অনিচ্ছা বৃথা। ইয়াকুবের হাত হইতে নিস্তার নাই। হাজার কথা বলিতে শুরু করিবে।

দুপুরে ইয়াকুব জ্বরের ঘোরে উঁ-উঁ শব্দ করিতেছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না। হঠাৎ খুট শব্দে সে জাগিয়া উঠিল। দরিয়া-বিবি তার সম্মুখে।

খাঁ-পত্নী জিজ্ঞাসা করিল, শরীর ভাল?

—না, ভাবী।

তারপর ইয়াকুব কাতরোক্তি আরো বাড়াইয়া কহিল, মাথা ভেঙে পড়েছে। একটু টিপে দিলে ভাল লাগে।

দরিয়া-বিবি কয়েকবার আমজাদকে ডাকিল, কোন জওয়াব নাই। ইয়াকুব ইঙ্গিত করিল বিছানার উপর বসিতে।

—আচ্ছা আমি টিপে দিচ্ছি। ছেলেগুলো এমন বজ্জাৎ। বলিয়া দরিয়া-বিবি ইয়াকুবের মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল।

ইয়াকুব নিরুত্তর। সে নীরবে একবার চক্ষুরপাতা খুলিতেছিল, পর মুহূর্তে বন্ধ করিতেছিল।

—ভাবী, তোমার কাছে বেশী ঋণ কচ্ছি।—

—ধার। আমি বরং—

ইয়াকুব হঠাৎ হাত তুলিয়া তার মুখে চাপা দিতে গেল। দরিয়া-বিবি মুখ তার নাগালের বাহিরে রাখিয়া বলিল, ঋণ আমরা-ই করছি।

ইয়াকুব আবার একটী নোট বাহির করিল। —তবে আর একটু ঋণ বাড়াও ভাবী। না হলে আমি মরে যাব। আমার শেষ জ্বর।

এমন মানুষ। জ্বরের বিকার নয় ত? দরিয়া-বিবি নোটটা নাড়া-চাড়া করিয়া ইয়াকুবের ব্যাগেই রাখিয়া দিল। নিঃশব্দে লক্ষ্য করিল ইয়াকুব, আর কোন কথা বলিল না।

—ডাক্তার ডাকি। কি বলো ভাই।

—না। যদি ডাক্তার ডাকো আমি জ্বর-গায়েই বাড়ী ফিরব।

দরিয়া-বিবি নিরুপায়। বড় এক-রোখা ইয়াকুব। সামান্য কয়েক মাসের পরিচয়ে সে উপলব্ধি করিয়াছিল। চুপ করিয়া গেল সে।

ঘুমাইয়া পড়িল ইয়াকুব কয়েক মিনিটে। দরিয়া-বিবি মাথা টেপা বন্ধ করিল। আমজাদের গলার আওয়াজ পাইয়া সে বিছানার পাশ ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। বেশী বেলা নাই। সংসারের হাজার কাজ অপেক্ষা করিতেছে।

সন্ধ্যার একটু পূর্বে বস্তা মাথায় ফিরিয়া আসিল আজহার। পটলবীজ পায় নাই। পটল-'আলে'র দাম বেশী। যা' মেলে তাও প্রায় শুষ্ক।

ইয়াকুব এখানে জ্বরে ভুগিতেছে। সে-সংবাদ তার কানে গেল। তার সঙ্গে সাক্ষাতের তেমন কোন উৎসাহ দেখাইল না আজহার।

হাত-মুখ ধুইয়া, কিছু আহারের পর সে দাওয়ায় তামাক নিঃশেষ করিতে লাগিল।

দরিয়া-বিবি বলিল, একবার দেখে এসো। তোমার কী একটু মেন্‌সত্বে (মনুষ্যত্ব) নেই। কি মনে করবে।

আজহার এই ধমকে সন্তুষ্ট হয়। সংসারের কাজে দরিয়া-বিবি আবার পরামর্শ করিতেছে তার সহিত। সহযোগিতার দরদ-ই ত সে প্রত্যাশা করে।

ইয়াকুবের সহিত অনেক কথা হইল। সংসার, চাষ-বাস, ছেলেদের লেখা-পড়া, নঈমার চোখের অসুখ ইত্যাদি। পটল-আলের কথাও বলিল আজহার।

ইয়াকুব পকেট হইতে কুড়িটী টাকা আজহারের হাতে দিয়া বলিল, বড়-ভাই, আপনি কত জায়গায় ঘুরছেন। আমার সঙ্গে ব্যবসা করুন। কোন কিছু আটকাবে না।

আজহার নোট লইয়া বসিয়া রহিল। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সে গ্রহণ করিল এই দান।

— জবাব দিন্।

— হ্যাঁ। কত কষ্ট করছি। তোমার সঙ্গে ব্যবসা করব, সে-ত ভাল কথা।

আজহার আরো গল্প ছাড়িল।

কয়েক প্রহর রাত্রি অতিবাহিত। দরিয়া-বিবির ধমকে আজহার গল্প সমাপ্ত করিল।

ভাত পরিবেশনের সময় দরিয়া-বিবি হাসিয়া বলিল, ওর সঙ্গে দেখা করছিলে না, এখন যে আঠার মত জড়িয়ে গিয়েছ?

২৫

বৈশাখের এক ঝঞ্ঝা-উতোল রাত্রে আসেক্‌জান মরিয়া গেল। কেহ খোঁজ-ও রাখে নাই। আমজাদ অন্য ঘরে ঘুমাইত আজকাল। পরদিন অনেক বেলা হইয়া গেলে, আসেক্‌জান উঠিল না। খোঁজ লইতে গেল দরিয়া-বিবি। বৃদ্ধার ঠাণ্ডা মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করিল দরিয়া-বিবি। আমজাদ, নঈমা, আজহার বোবার মত চাহিয়া রহিল অনেকক্ষণ। বুড়ির আত্মীয় স্বজন কেহ-ই ছিল না। প্রতিবেশীদের সহায়তায় দফন-কাফন শেষ করিল আজহার।

আসেক্‌জানের একটী পেঁট্‌রা খোলা হইল। দশ-বারোটী খুচ্‌রা টাকা ও কয়েকখানি কাপড় পাওয়া গেল। বিশেষ লাভ হয় নাই দরিয়া-বিবির। কাফনেই দশ টাকা গিয়াছে।

এই অসহায় বৃদ্ধার কথা বার বার মনে পড়ে দরিয়া-বিবির। তার জীবনের পরিসমাপ্তি কিরূপে ঘটিবে, সে কি জানে? হয়ত এমন অপমৃত্যু তার-ও কপালে লেখা আছে। কত দিন হইল শৈরমী মরিয়া গিয়াছে। কত দিন!

এক সপ্তাহে আসেক্‌জানের নাম মিটিয়া গেল এই বাড়ী হইতে। চতুর্থ দিনে পাড়ার দুইজন ভিক্ষুক-কে খাওয়াইয়া দরিয়া-বিবি 'চাহ্‌লাম' সমাপ্ত করিল।

আমজাদ কিন্তু ভয়ে একা ঘুমাইতে পারিল না কয়েকদিন। মোনাদির নাই কাছে। নিজের ছোট কুঠ্‌রীতে শুইতে তার বড় ভয় লাগে।

দরিয়া-বিবি ধমক দিয়া বলিল, ভয় কি, ব্যাটা। তোমার দাদি-আম্মা, তার ভেস্ত-নসীব হয়েছে। ভয় কী?

আমজাদের তবু ভয় কাটিল না।

কয়েকদিন দরিয়া-বিবি শরীফন-কে লইয়া আমজাদের ঘরে আস্তানা পাতিল।

স্কুলে পণ্ডিতের মুখে আমজাদ ভূতের কাহিনী শুনিয়াছিল। মন হইতে তা সহজে মুছিয়া যায় না।

মা-কে সে জিজ্ঞাসা করিল: মা, মরে গেলে ভূত হয় মানুষ?

—যারা খারাপ লোক, তারা ভূত হয়।

আসেক-দিদি কি হোয়েছে?

—ছিঃ, ভয় কি, আমু। সে ভাল-মানুষ। আল্লা তার ভেস্ত নসীব করেছে।

—ভালমানুষ আবার পরের বাড়ী খায়।

—গরীব ছিল যে —। গরীব —

দরিয়া-বিবি ঈষৎ বিচলিত হয় মনে মনে। জবাব যেন ছেলের মন-মত হয় নাই।

—আমার ভয় করে। দাদি রাত্রে আমার পাশে ঘুমোয়।

থুথু-কুঁড়ি ছড়াইল দরিয়া-বিবি পুত্রের গায়ে।

—তার পাশে শুয়ে এত বড় হোলে কি না, তাই মনে হয়।

—আমার ভয় করে কেন, মা?

—বেটা ছেলে। তোর বুকের পাটা নেই?

—ইশ্ শ্।

আমজাদ তবু রাত্রে দরিয়া-বিবির কোল ঘেঁষিয়া ঘুমাইত। বাহিরে কাঁঠাল গাছের বনে বনে দমকা বাতাস লাগিলে সে মা-কে জড়াইয়া ধরিত। গোরস্থান হইতে আসেক্জান-দাদি লাঠি হাতে কারো চাল্লিশা খাইতে যাইতেছে।

ব্যাপারটা আজহারের কানে গেলে সে একদিন আমজাদ-কে মক্তবের মৌলবী সাহেবের কাছে লইয়া গেল। তিনি গায়ে ফুঁক দিয়া দিলেন। সঙ্গে এক গ্লাস পানী-পড়া। গোটা একটী টাকা বাহির হইয়া গেল দুই ফুঁকের ঠেলায়।

মৌলবী সাহেব জুম্মাবারে আর একবার আমজাদ-কে আনিতে

বলিল, আজহার তা শুনিল মাত্র। আবার এক টাকার বন্দোবস্ত আর কি। আজহার মনে মনে যোগ করিল।

আমজাদের ভয় সহজে কাটিল না। আজকাল সন্ধ্যায় একা-একা সে দাওয়ায় বসিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু মার কাছে সে সব চাপিয়া গেল। বাগাড়ম্বরে তার বুকের পাটা কয়েক মাইল চওড়া।

আমজাদের ভয় গেল এক ঘটনার ধাক্কায়।

আজহারের হাতে ইয়াকুবের দেওয়া টাকা ছাড়া আরো কিছু টাকা জমিয়াছে। আসেক্‌জানের একটী ছোট বাক্স তার কাছে গচ্ছিত ছিল। দরিয়া-বিবি তাহা জানিত না। ভেতরে আরো গোটা কুড়ি টাকা ছিল। এই ব্যাপার ঘুণাক্ষরে দরিয়া-বিবির কানে ওঠে নাই।

গোটা পঞ্চাশেক টাকা। মাছের ব্যবসা অথবা অন্য কোন ব্যবসা করা চলে। ইয়াকুব-কে সে পছন্দ করে না। তার টেরি ও রঙীন লুঙ্গি অথবা কোঁচা-ঢিল ধুতি আজহারের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। সে তা কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম নয়। তার সঙ্গে ব্যবসা-ও সম্ভব নয়। সে বয়সে ছোট, তার ইশারায় চলা, আজহার সমীচীন মনে করে না। ব্যবসায় পুঁজি তার। সুতরাং অঙ্গুলি-হেলনে ওঠা-বসা ছাড়া উপায় নাই।

চন্দ্র-কে পাওয়া যাইত। চন্‌দর। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে মন-টানাটানি লইয়া সে আর এদিক মাড়ায় না। এলোকেশী সেদিন-ও আসিয়াছিল। কি বুদ্ধিমতী মেয়ে। দাদা, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ আমরা উলুখড়। তা-তে মাথা ভাঙতে যাই কেন? এলোকেশী ঠিক বলে। কিন্তু চন্দরের কাহিনী স্বতন্ত্র। তার আশা আজহার খাঁ ছাড়িয়া দিয়াছিল।

এই গ্রামে দুই মতাবলম্বী বাস করে। হানাফী ও লা-মজহাবী। 'লা-মজহাবীরা' সংখ্যায় অধিক। হাতেম বখ্‌শ খাঁ হানাফী। তারই ইদানীং উৎসাহে গ্রামে বিরাট 'ওয়াজের' বন্দোবস্ত হইল। দুই সম্প্রদায়ের মুসলমানের সায় ছিল তার পেছনে। এই উপলক্ষ্যে তিন চার জন মৌলানা নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম্ম-ভাব স্তিমিত হইয়াছিল। জল-কর লইয়া কিছুটা

চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। হাতেম বখ্‌শ তবু সন্তুষ্ট নয়। সব কাফের হইয়া যাইতে বসিয়াছে। কয়েকজন মুসলমান এখনও রোহিনী চৌধুরীর পক্ষে। আরো ধর্ম্ম-ভাব উদ্দীপিত্-করা দরকার। মুসলমানেরা সংঘবদ্ধ হইতেছে না, হাতেম বখ্‌শ খাঁর বড় আফশোষ। ইসলামের অবনতি দেখিয়া তার বুকে কত শত ফাটল দেখা দিয়াছে।

গ্রামের ঈদ্‌গাহে ওয়াজের মজ্‌লিশ বসিয়াছিল। বিরাট সামিয়ানা পাতা হইয়াছে। মৌলানাদের আসনের জন্য তক্তপোষ পাতা। নীচে মাদুর-সতরঞ্জ বিছানো। পাশ্ববর্তী গ্রামের বহু মুসলমান আসিয়াছে।

ওয়াজ শুরু হইল।

এখন মৌলানা বক্তৃতা শুরু করিলেন।

ভাইগণ—

ভাইগণ সকলে উৎকর্ণ হইল। ইসলামের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া মৌলানা কাঁদিয়া ফেলিলেন। অশ্রু-আপ্লুত কণ্ঠেই ঢোক গিলিয়া তিনি বলিলেন, ইসলাম বিপন্ন। শুধু হাতেম বখ্‌শের মত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি জীবিত আছেন বলিয়া ইসলাম জেন্দা রহিয়াছে। হয়ত তার গোরস্থান-গমনে ইসলাম না গোরস্থানে চলিয়া যায়। সব মুসলমান কাফের হইতে বসিয়াছে। ইহার জন্য ফেরেশ্‌তারা পর্যন্ত কাঁদিয়া আহাজারী করিতেছে। তবু মুসলমানের খেয়াল নাই। আল্লার না-ফরমান (অবাধ্য) বান্দারা আল্লার বুকে শূলের মত বিঁধিতেছে। হায়, আল্লা।

তিনি আর এক দফা অশ্রুপাত করিলেন। সম্মুখে সতরঞ্জির উপর বসিয়াছিলেন হাতেম বখ্‌শ খাঁ, তিনি ঘন-ঘন রুমালে চোখ মুছিতে লাগিলেন।

শ্রোতাদের চক্ষু না সিক্ত হইলে-ও হৃদয় ভিজিয়া গেল।

—পেয়ারা ভাইগণ—, আমার আল্লা, আলেমুল গায়েব কোরানে ফরমাচ্ছেন, তোমরা এক হও। এক রশী পাক্‌ড়ে ধরো। কষে-মজ্‌বুত—

মৌলানা দৃঢ়-মুষ্টি ধরিলেন।

—মজ্‌বুত করে ধরো। হাতেম বখ্‌শ সাহেব যেমন মজ্‌বুত করে ধরেছেন—

বার বার হাতেম বখ্‌শের নাম উচ্চারিত হওয়ার ফলে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান অস্বোয়াস্তি-বোধ করিতেছিল। ঈর্ষা অবশ্য মূল কারণ।

আবার শুরু হইল ঃ পেয়ারা ভাইগণ, আল্লার হুকুম যদি না পালন করেন, দোজখের আগুনে সব জ্বলে পুড়ে খাক হোয়ে যাবেন। আখেরাতে আপনারা রসূলের সুপারিশ পাবেন না—হরগিজ্‌ না— হরগিজ না, হরগিজ না —

সভায় সকলের মাথা নড়িয়া উঠিল। মৌলানা দম লইয়া বলিলেন, আপনারা দরুদ শরীফ পড়ুন। ‘বালাগোল উলা বেকামালেহি’-রব সভায় অনেকক্ষণ শোনা গেল।

—দোজখের আগুন কোনদিন নেভে না। শক্ত গুনাগার বান্দাদের জন্য শক্ত সাজা—এত আগুন—গর্ম্মি এত—তার সেদ্দাতে (উষ্ণতায়)—

মৌলানা দোজখের বর্ণনা দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল, বোধ হয় আগুনের উত্তাপে। তিনি এক গ্লাস পানি গলাধঃকরণ করিলেন। একটী ঢেকুর তুলিয়া তিনি পুনরায় দোজখের আগুন দেখাইতে লাগিলেন। গরমের দিন। সভা আরো গরম হইয়া উঠিল।

এক জন শ্রোতা গোলাব ছিটাইয়া দিলেন ইতিমধ্যে। বাতাসে গন্ধের আমেজ। সভা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ইহার পর দ্বিতীয় মৌলানা উঠিল। তিনি লা-মজহাবী মুসলমান কর্ত্তৃক দাওয়াৎ পাইয়াছিলেন।

তিনি-ও প্রথমে কিছুক্ষণ ইস্‌লামের দুর্দ্দশার বর্ণনা করিলেন।

তাঁর মুখে গ্রামের অন্যান্য মাতব্বর মুসলমানদের নাম শোনা গেল। তাঁরাই এক মাত্র আদর্শ মুসলমান রূপে গণ্য। হাতেম বখ্‌শের নাম ঐ লিষ্টে নাই। তিনি মনে মনে ঈর্ষা-পোষণ করিতেছিলেন।

ইহার পর মৌলানা আলম ইস্‌লামের আখ্যায়িকা শুরু করিলেন। হজরত আলির মত মুসলমান আর জন্মগ্রহণ করে না। তিনি ছিলেন সৌম্য-শান্ত দীর্ঘকায় পুরুষ, নাভি পর্যন্ত তার শ্মশ্রু-রাজি লম্বিত।

অন্য এক জন মৌলানা প্রতিবাদ করিলেন। না, হজরৎ আলি দীর্ঘকায়

ছিলেন না। তাঁর দাড়ী অত লম্বা নয়।

—চুপ করুন।

ধমক দিলেন প্রথম মৌলানা।

—কেন, চুপ করব ?

—চুপ করুন, হজরতদের নাম নিয়ে এমন বেয়াদবী করবেন না।

—বেয়াদবী। ইমাম আবু হানিফা ভুল বলেছেন।

—আবুহানিফা কে?

—ইমাম।

—ইমামের কথা ঠিক নয়।

লা-মজহাবীরা খুব সন্তুষ্ট। সভায় তাদের দলে আনন্দের-গুঞ্জন শুরু হয়। কিন্তু হানাফিরা মৌলানার উপর চটিয়া উঠিতেছিল।

প্রথম মৌলানা আবার বলেন, চুপ করুন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি চুপ করার বান্দা নন।

—কোন্ দলিলে এমন আজ্গুবি কথা পেয়েছো ? তিরমিজী-শরীফে আছে, হজরৎ আলির দাড়ী নাভি পর্যন্ত নয়।

—ঝুট্ তোমার তিরজিমী।

হানাফিরা তাহাদের মৌলানার সমর্থক। তাহারা আর চুপ করিয়া থাকে না। সভায় ফিস্ফাস শব্দ শুরু হয়।

—চুপ করুন।

—না, আমি চুপ করব না।

—বেয়াদব।

কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি চলিল। তুমুল বাক-যুদ্ধ।

প্রথম মৌলানার ধৈর্য আর টেকে না। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, তুমি বেয়াদবের বাচ্চা।

দ্বিতীয় মৌলানা হেফ্জুল্লা সাহেব প্রাথমিক তাল সাম্লাইয়া প্রথম মৌলানা ফখরুদ্দিনের লা-জবান গালাগাল শুরু করিলেন।

সভায় হট্টগোল। দুই দল সমর্থক ছুটিয়া আসিল। মৌলানাদের দ্বন্দ্ব মুরীদানদের মধ্যেও হাতাহাতির সুযোগ খুলিয়া দিল।

—মারো শালা লা-মজ্‌হাবীদের—মারো শালা হানাফিদের। ওয়াজের মজ্‌লিশে ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ভ্রাতারা হঠাৎ খিস্তী বয়ান শুরু করিলেন।

হাতেম বখ্‌শ এতক্ষণে সক্রিয়। প্রথম মৌলানার সমর্থনে তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন। হাতাহাতি থামিল না দেখিয়া তিনি অন্ধকারে গা আড়াল দিলেন। ইজ্জৎ বাঁচাইলেন চতুর-জনের মত।

আজহার খাঁ-ও এই ওয়াজের মজ্‌লিশে আসিয়াছিল। সে নিরীহ ব্যক্তি। কিন্তু এই ব্যাপারে সে পাক্কা মুসলমান। এমন বর্ব্বর হইয়া উঠিতে পারে সে। হাত আজহার কম চালায় নাই। মজ্‌লিশের বাতি নিভিয়া গিয়াছিল। মনের সুখে সে হাতের সাধ মিটাইল। গলা-ফাটা চীৎকার করে সে: শালা হানাফিদের খতম করে দাও। কে বলিবে, আজহার নিতান্ত বেচারা মানুষ। পাকা মুসলমান। ধর্ম্মের অপমান সে সহ্য করিতে পারে না।

দাড়ী লইয়া বিরোধ বাধিয়াছিল। সভা-শেষে অনেকেই অক্ষত অবস্থায় ঘরে ফিরিতে পারিল না, কয়েকজন জখম হইল। শুধু তাই নয়, দুই গ্রাম দুই শিবিরে পরিণত হইল।

পরদিন লা-মজ্‌হাবী পাড়ার লোক হানাফিদের সুযোগ পাইয়া মারি দিল। হানাফিরা তার পাল্টা প্রতিশোধ লইল। মৌলানা-গণ ইস্‌লামের সেনাপতি-রূপে এই গ্রাম-যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিতেন। কিন্তু ফিল্ড-মার্শালদের ফিল্ডে দেখা গেল না। তাহারা সদর-অন্দরে অবস্থান করিয়া কচি মুর্গীর কলিজার আস্বাদ লইতেছিলেন, সঙ্গে পোলাও-পরোটা বাদ পড়ে নাই।

এক সপ্তাহ গ্রামে এই অবস্থা। আরো কতদিন কাটিত, কে জানে। সাকের এই সময় সকলের একটী উপকার করিল। প্রথম দিন সে-ও হুজুগে মাতিয়াছিল। পরে মৌলানাদের কীর্ত্তি সে বুঝিতে পারে। ইহারাই এত গোলমালের খুঁটি। ভয়ানক চটিয়া গেল সে।

লাঠি হাতে সে প্রথমে হানাফি পাড়ায় উপস্থিত হইল। সে পাড়ায় প্রবেশের আগেই চীৎকার করিতে লাগিল: আমি মারামারি করতে আসিনি, যদিও আমার হাতে লাঠি আছে।

অন্যান্য প্রতিবেশী মজা দেখিতে দাঁড়াইল। এই চোয়াড় লোকের সঙ্গে লাঠিবাজি করিতে কেহ সক্ষম হইবে না।

দহলিজ হইতে সে এক মৌলানা-কে কান ধরিয়া টানিয়া আনিল। তারপর দুই চড় ও এক লাঠির ঘা দিয়া বলিল: নিকালো হিঁয়াসে। কাইজ্যা বাধাতে এসেছো; শালারা। চশম-খোর শালারা নিজের রাগ সাম্‌লাতে পারে না, কুকুর—কুকুর—.

—আবার মুরীদ করতে এসেছে।

মৌলানার মুরীদানগণ স্তব্ধ। হুজুরের দুর্দ্দশার মুখে কেহ ছুটিয়া আসিল না।

সাকের নিজে ওহাবী। নিজের পাড়ার এক মৌলানা-কে ভয়ানক চাবুক-বাজির পর হাঁকাইয়া দিল।

গ্রাম হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। প্রথমে কয়েকজন সাকেরের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, পরে দুই হাত তুলিয়া শোকর, মেয়ে-মহলের অনেকে সাকেরের জন্য আল্লার দরগায় দোয়া প্রার্থনা করিল। ছেলেপুলে লইয়া এতদিন শান্তি ছিল না। কখন কে জখম হয়। অনেক মেয়ের বুকের ধুক্‌ধুকানি ভাব এত দিনে গেল।

গ্রাম দুই দিনে স্বাভাবিক।

আজহার প্রকৃতস্থ হইয়াছে পুনরায়। এই কয়দিন দরিয়া-বিবি পর্যন্ত তার চেহ্‌রা দেখিয়া মনে মনে ভয় পাইত। ধর্ম্মের নামে সে যেন জানোয়ার বনিয়া যায় অথচ আর কখন-ও তার এই তেজ চোখে পড়ে না।

সুযোগ বুঝিয়া দরিয়া-বিবি একদিন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "যখন কেউ বিনা দোষে তোমার জুলুম করে, তখন এ-তেজ থাকে কোথায়?"

—কোন্ তেজ?

—তা আর মনে থাক্‌বে কেন? সেবার তোমার জমিদার বিনি-দোষে ক্ষেতের ধান কেটে নিয়ে গেল, তখন ত ভিজে বিড়াল সেজে বসে রইলে।

—হুঁ।

দরিয়া-বিবি ব্যঙ্গ-শব্দ করিল, হুঁ।

তারপর সে সাকেরের পৌরুষের প্রশংসা-আরম্ভ-মাত্র আজহার নিঃশব্দে মাঠের দিকে চলিয়া গেল।

আমজাদ বহু পূর্ব্বে মাঠে গিয়াছে। স্কুলের ছুটী। তার লজ্জা লাগে মাঠের কাজে। কিন্তু বাড়ীর দুর্দ্দশা দেখিয়া পিতা-কে সাহায্য করিতে বেশ আনন্দ পায়। যদি-ও পিতার উপর তার শ্রদ্ধা দিন-দিন কমিয়া যাইতেছে। তার আব্বা যেন কি রকম!

জমির এক কোণে লঙ্কা-চারা রোপনের জন্য মাটী তৈয়ারী হইতেছিল। লাঙল হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু পরিপাটী বাকী।

বেড়া দিতে হইবে মজবুত করিয়া। গরু-ছাগলের উৎপাত লঙ্কা গাছের উপর বেশী! সারি-বন্দী চারা পুতিবার জন্য আইল সোজা করিতে হইবে।

আমজাদ এই-সব কাজ খুব ভালবাসে। ছোট কোদাল লইয়া সে সোজা রেখাকারে মাটী সাজাইতেছিল। এই সময় এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গেলে, পানী-বওয়ার মেহনত দরকার হইল না।

হঠাৎ আজহার-কে দেখিয়া সে উৎফুল্ল হয় না। এমন-ই বলে, আব্বা।

আব্বা, তুমি অনেক কাজ এগিয়ে রেখেছো, দেখ্‌ছি।

—হ্যাঁ, আব্বা।

—বেশ।

—এবার লঙ্কা হোলে হাটে নিয়ে যাব না। আমাদের সারা বছর কিন্‌তে হয়।

—কিন্তু তখন হাত-টানা থাক্‌লে তুমি কি তা মনে রাখ্‌বে। লজ্জিত হয় আজহার মন্তব্যে। সত্যি তার খেয়াল থাকে না তখন। অথচ ক্ষেতের ফসল বেচিয়া দিয়া, সারা বছর মুদীর দোকানের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়।

—না, এবার আর বেচ্‌ব না। আল্লা চাহে ত—

থামিয়া গেল আজহার। হাতে টাকা আছে, তবু খট্‌কা তার মনে। আল্লার করুণা মুছিয়া যাইতে কতক্ষণ।

দিনের আলো নিভিয়া আসিতেছে। মাঠের রূপ বদ্‌লাইয়া যায়। পিতা-পুত্রে রবি-ফসলের টুকিটাকি কাজ করে।

হঠাৎ গানের আওয়াজ শোনা গেল। পিতা-পুত্র উৎকর্ণ।

কণ্ঠস্বর পরিচিত।

আজহার আবার নিজ-মনে কাজ করিতে লাগিল।

—চন্দ্র-কাকা, না আব্বা ?

আজহার কোন জবাব দিল না। আমজাদ মাঠের দিকে চাহিয়াছিল। গায়কের অবয়ব তখন-ও দৃষ্টির বাহিরে।

আন্‌মনা আমজাদ। আজহার লক্ষ্য করে। কাজের গাফিলতি সে পছন্দ করে না।

—কাজ কর, আমু।

—চন্দ্র-কাকা, না ?

—হুঁ, তা কি করতে চাও ?

পিতার কণ্ঠস্বর উষ্ণ। আমজাদ মাথা হেঁট করিয়া ক্ষেতে লঙ্কাচারা বসায়। আড়চোখে মাঠের দিকে চাহিয়া থাকে।

গান পুনরায় শুরু হইয়াছে।

আমজাদ হাসিয়া বলে : আব্বা, চন্দ্র-কাকা পাগল।

—কাজ কর।

ধমক দিয়া উঠিল আজহার।

কলা-বনের আড়াল হইতে মেঠো-পথে চন্দ্র বাহির হইল। কণ্ঠস্বর নিকটবর্তী হইতেছে। আমজাদ মনে মনে খুশী হয়। কিন্তু আনন্দ আর বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। চন্দ্র-কাকা আর এদিকে আসিবে না। হিন্দু-মুসলমানে ঝগ্‌ড়া। নিকুচি করি ঝগ্‌ড়ার, কি-সব বাজে কথা। আমজাদ ভিতরে-ভিতরে তাতিয়া উঠে।

আজহার আবার আন্‌মনা আমজাদ-কে কাজে মনোযোগ দিতে বলিল।

গায়ক এইদিকে আসিতেছে। আড়চোখে আমজাদ দেখিল, আজ চন্দ্র-কোটাল জমির বেড়ার ওপারে থমকিয়া দাঁড়ায় নাই। সে তাহাদের

দিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। আরো নিকটে, ঠিক তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল চন্দ্র কোটাল।

আজহার চুপ্‌চাপ কাজ করিয়া যাইতেছে। কোটালের উপস্থিতি যেন সে অবহেলা করিতে চায়। পিতার ভয়ে আমজাদ তাহার দিকে তাকায় না।

তিনজনে নিঃস্তব্ধ। এমন অস্বোয়াস্তিকর মুহূর্ত কারো জীবনে যেন আসে নাই। কোটাল হঠাৎ বোকার মত হাসিয়া উঠিল। আমজাদ তার দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিল। হাসি পায় তার। শুধু পিতার ভয়ে চুপ করিয়া আছে।

—আজহার-ভাই, ও খাঁ-সাহেব, বলিয়া চন্দ্র থামিয়া গেল। অপর-পক্ষ তখন-ও নীরব।

—এই চাচা, তোমার বাবা এবার বোবা হোয়ে গেছে নাকি?

—বোবা বাবা। ও-কার আর আ-কার।

চন্দ্র আমজাদ-কে লক্ষ্য করিয়া বলিল।

আজহার বিন্দু-মাত্র নড়িল না। তার হাতের কাজ অবশ্য স্তব্ধ। তারপর খিলখিল হাসিয়া চন্দ্র হঠাৎ দণ্ডায়মান আজহারের ঠিক পায়ের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া তার চোখের দিকে তাকাইল। চোখে চোখ পড়ে। কোটালের হাসি সংক্রামক। আজহার না হাসিয়া পারে না।

চন্দ্র তখন তুড়ি দিয়া এক লাফে উঠিয়া আমজাদ-কে কাঁধে তুলিয়া লইল। আমজাদ আজকাল বড় হইয়াছে। কাঁধে উঠিতে তার লজ্জা লাগে। কিন্তু বারণের অবসর কোথায়। এতক্ষণে সে শূন্যে।

চন্দ্র নাচিতে নাচিতে বলে, ধর্ম্ম টর্ম্ম আমি মানিনে। যত সব বেজন্মাদের কীর্তি। গান ধরিল সে।

তারপরই সে বলে, আজহার-ভাই আমি ভাব্‌তাম আমাদের সাত রকম জাত আছে। তোমাদের-ও তা-ই। ঠিক করেছে সাকের। আমাদের পুরুত ঠাউর (ঠাকুর) আর তোমাদের ওই—

কথা শেষ করিতে পারে না সে। খিল্‌খিল্ হাসির শব্দে বেলাশেষের মাঠ ভরিয়া ওঠে।

'সুইৎ' শব্দে আমজাদ-কে কাঁধ হইতে নামাইয়া সে বলিল, তামাক দাও

অন্য কারো কথা বলার অবসর নাই।

চন্দ্র আবার কহিল: আমাদের পুরুত এলে আমি-ও দাড়ী ছিঁড়ে লেঙ্গা। ধর্মের নিকুচি। যত-সব চালবাজি ঝগ্‌ড়া-লাগানোর।

আজহার এতক্ষণে মুখ খুলিল: এই পাগল চন্‌দর।

ঝাঁকড়া-চুল মাথা নাড়িয়া চন্দ্র পদবী গ্রহণ করিল। তারপর আমজাদের দিকে চাহিয়া সে বলিল, চাচা, তোমার বাবার দাড়ী ছিঁড়ে লেঙ্গা।

তিনজনে দম ভরিয়া হাসিতে থাকে এইবার।

আজহার জিজ্ঞাসা করিল, চন্দ্র তোমার হোয়েছিল কি এতদিন?

—ভূত ধরেছিল!

—একদম মাম্‌দো ভূত।

—হ্যাঁ, খাঁ ভাই। আমার চোখ খুলে গেছে কাল।

—কাল!

—হ্যাঁ।

হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া যায় চন্দ্র। তার মুখাবয়বে থরথর কম্পন দেখা যায়। অশ্রু-সজল চোখ।

আজহার ভাবে, কি হইল চন্দরের। এ আবার কোন্‌ রকম পাগ্‌লামি! এতক্ষণ ত সে হাসিতেছিল।

চন্দ্র পাথর। তার চোখ দিয়া অশ্রুর ফোঁটা ঝরিতেছে।

—কি হোল, চন্‌দর?

আজহার নিকটে আসিয়া সমব্যথা-মাখা দুই-হাত বাড়াইল।

—কি হোয়েছে?

শাল-তরু যেন শিলীভূত।

—কি হোয়েছে?

—শিবু, ইস্‌মাইল সদরের হাঁসপাতালে মারা গেছে।

—মারা গেছে!

আজহারের মুখে আর কোন কথা নাই। সে-ও বজ্রাহত, স্তব্ধ হইয়া গেল।

জলকর লইয়া দাঙ্গার সময় শিবু ও ইস্‌মাইল বেশ জখম হইয়াছিল। সদর হাঁসপাতালে ছিল তারা এতদিন। দুইজনে খুব পরিচিত বন্ধু।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকে তিনজন। সন্ধ্যার কালিমা-লেপন শুরু হইয়াছে দিকে-দিগন্তরে।

ফুঁপাইয়া উঠিল চন্দ্র ঃ ওদের বাড়ীতে কি কান্না। শিবুর বৌ ছেলেপুলে নিয়ে হয়ত না খেয়ে মরবে। রোহিনী আর হাতেম শালার কি আসে যায়। আমার চোখ খুলে গেছে কাল সদরের হাঁসপাতালে। আমার চোখ—

ফুঁপাইতে থাকে চন্দ্র, কথা শেষ হয় না।

আজহার নির্ব্বাক। চন্দ্র আর কোন কথা বলিল না, নির্জীবের মত বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আর কাহার-ও মুখ দেখা যায় না। নিস্তব্ধতা প্রথম ভাঙিয়া আজহার বলিল, চলো চন্দর বাড়ী চলো।

চন্দ্র কোন জবাব না দিয়া উঠিয়া পড়িল। আর কোন বাক্যালাপ করিল না মাত্র। সে মাঠের পথ ধরিয়াছে।

পিতা-পুত্র হতবাক। তাহারা গ্রামের পথে অগ্রসর হইল। আমজাদের অস্বোয়াস্তি ঃ বহুদিন পরে চন্দ্র-কাকার সঙ্গে দেখা। কিন্তু সন্ধ্যাটা আজ মাঠেই মারা গেল।

কাঠা দশেক জমি পার হইয়া আমজাদ শুনিতে পায় চন্দ্র কোটাল যেন গান ধরিয়াছে।

আজহার বলে, সত্যি পাগল চন্‌দর। তাড়ি গিলেছে বোধ হয়।

—না, আব্বা। মুখে গন্ধ নেই একদম।

সায়ং-আচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তরে মেঠো সুর বাতাসের আলিঙ্গনে ভাসিয়া যায়। আমজাদের শ্রুতি-ভ্রম মাত্র।

২৬

হাসু-বৌ আজকাল প্রায় দরিয়া-বিবির খোঁজ লইতে আসে। শাশুড়ীর কড়া তাগিদের তাড়া না আসিলে এই বাড়ী হইতে যাওয়ার নাম করে না সে।

আমজাদ মোনাদিরের খবর লইয়াছিল। সে তার আগে-কার বাড়ীতে যায় নাই। দরিয়া-বিবি এ-খবর জানে না। হাসু-বৌ আমজাদকে তাহা বলিতে বারণ করিয়াছিল। পাছে তার মা আরো ব্যাকুল হইয়া পড়ে। আমজাদ তাই মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সে ওই গাঁয়ে আছে, মা।

হাসু-বৌ গোপনে আমজাদের উপর ভার দিয়াছে, মুনির খবর আনা চাই-ই কিন্তু। 'হাসু-চাচি, আমি আরো কয়েকজন-কে তাগাদা দিয়েছি'। এই ষড়যন্ত্রের কোন খোঁজ দরিয়া-বিবি রাখে না। সে চলিয়া গিয়াছে, তা যাক। বোন উপায় ত আর নাই। তবু আত্মীয়দের সঙ্গে আছে, দরিয়া-বিবির বুকে যেন বাঁধা থাকে সে।

হাসু-বৌ জিজ্ঞাসা করিল, আমুর-মা বুবু, তোমার নূতন মেয়েটী কিন্তু বেশ। আমাকে দিয়ে দাও, আমার ত ছেলে-মেয়ে নেই।

—তা কি দেওয়া যায়, পাগ্‌লী।

—আমার কত সাধ একটা ছেলে—কানা খোঁড়া-ও যদি একটা ছেলে কি মেয়ে পেতাম।

দরিয়া-বিবি এই বন্ধ্যা-নারীর ব্যথা অনুভব করে।

—আল্লা দিলে হবে। তোর বয়স ত চলে যায়নি।

দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল হাসু-বৌ নীরবে।

এমন সময় আসিল আমিরণ-চাচি। সঙ্গে আম্বিয়া।

দরিয়া-বিবি খুব খুশী হয়, এসো বুবু।

কৈফিয়ৎ দিতে থাকে আমিরণ-চাচি: এতদিন পরে আজ একটু ফরসুৎ পেয়েছি। 'জান্‌'-ঝালাপালা কাজে কাজে।

—আসলে আমাদের মনে নেই।

দরিয়া-বিবি কৃত্রিম ও কুটীল হাসির ছায়ায় চাহিয়া থাকে।

—তুমি ত বলবে-ই দরিয়া-বুবু! সত্যি নানা ঝঞ্ঝাট্। পেটে আর ভাত সেঁধোয় না।

—কেন?

তারপর আমিরণ-চাচি তার দেবরের কাহিনী বলে। জমি-গুলি হস্তগত করিতে সে উঠিয়া পড়িয়া-লাগিয়াছে। তিন চার বছর পরে আম্বিয়া-কে বিদায় করিতে এই জমিগুলি কাজে লাগিত। হয়ত জমি দেখাইয়া কোন ঘর-জামাই পাওয়া যাইত। ওই-ত এক-রত্তি মেয়ে। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া ভিটায় বাস অসম্ভব।

দরিয়া-বিবির সহানুভূতি আজ-ও হ্রাস হয় না।

—আম্বিয়ার জন্য অত মাথা ঘামিয়ো না। আল্লার মাল আল্লার হাতে সঁপে দেবে। কিন্তু তোমার দেবরটা এত ছোট-লোক।

—আর ঘরে-বসে খাবে কি? পরের দিকে চেয়ে আছে শকুনের মত।

আম্বিয়া মার পাশে ছিল না। আমজাদের সহিত সে দাওয়ার বাহিরে কাঁঠল-তলায় নানা-কথায় ব্যস্ত।

—মুনি আর এলো না?

আমজাদ বিমর্ষ-কণ্ঠে জবাব দিল, সে চলে গেছে কি না। মা এখন-ও তার জন্য কত কাঁদে।

—কবে যে আবার আস্‌বে। তোর মুনি-ভাই কিন্তু বেশ। বেশ, না?

—হ্যাঁ।

—মুনি-ভাই, আমার সঙ্গে ঝগড়া করে না।

—খোঁজ করে নিয়ে আয়-না তা-কে।

—খোঁজ নিয়েছি।

আসল-কথা প্রায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। হাসু-বৌর উপদেশ স্মরণ হয় অকস্মাৎ।

কথা ঘুরাইয়া আমজাদ বলে, খোঁজ নিয়েছি। আসবে ইচ্ছা-মত।

আম্বিয়া জবাবে সন্তুষ্ট হয় না।

—তুমি বড় মিছে কথা বলো। খোঁজ নিলে আর আসে না।

—সে আসতে চায় না।

—তার মুখে পড়া বেশ মানায়।

মোনাদির সকল প্রশ্ন ও জবাবের কেন্দ্র। আর যেন কোন কথা নাই পৃথিবীতে।

আমিরণ-চাচি, হাসু-বৌ, দরিয়া-বিবি গৃহস্থালির নানা গল্প করে। দুঃখ-লাঘবিনী শক্তি আছে কথার। একের বেদনা-কাহিনী অপরের দুঃখাগ্নির মুখে ছাই চাপা দিতে পারে। সহানুভূতির হেতু আরো অটুট হয় তার জোরে।

হাসু-বৌ-কে আমিরণ-চাচি বলে, "হতভাগি, ছেলে-মেয়ে চাস্, এই ভ্যাখ্, আমরা পুড়ে মরছি।"

—এমন পুড়ে মরতে-ই বা জায়গা পাই কোথায় ?

দরিয়া-বিবির মন কয়েকদিন ভাল ছিল। নিত্য-নূতন অভাব-বিজড়িত সংসারে যেন সামান্য স্বচ্ছলতার হাওয়া ঢুকিয়াছে। গল্পে গল্পে সময় কাটিয়া যায়। আম্বিয়া এই বাড়ী আসিলে আর যাইতে চায় না।

প্রায়-সন্ধ্যা। এবার বাড়ী ফিরিতে হয়। মার ডাক আম্বিয়ার কানে যায় না।

—তুমি যাওনা, মা।

—তুই এই বাড়ীতে থাক্ তবে, বুবুর বৌ হোয়ে।

দরিয়া-বিবি কিছুক্ষণ আগে তার গোপন-মনে এমনই কল্পনার দুর্গ রচনা করিয়াছিল। মোনাদির আর চার বছরে ষোল'য় পড়িবে। তখন—

আমিরণ-চাচির কথা শুনিয়া দরিয়া-বিবি হাসিয়া উঠিল।

—বেশ, রেখে যাও।

—আমার গায়ে হাওয়া লাগে। খাইয়ে-পরিয়ে এখন মানুষ ত করো।

হাসু-বৌ কথা গায়ে মাখিয়া লইল।

—আমাকে দাও, আমি খাওয়াব-পরাব।

—বেশ নিয়ে যা'।

—আয়, আম্বিয়া আয় না, মা।

সাকেরের মার চড়া আওয়াজ দূর হইতে শোনা যায়। হাসু-বৌ চলিয়া গেল।

আমজাদ চাচিদের আগাইয়া দিতে আসিল। মার বারণ সে শোনে না। তার আর ভূতের ভয় করে না। চন্দ্র-কাকার গানের ঢেউয়ে সব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। হোক না সন্ধ্যা।

অস্পষ্ট বনের সড়কে মা-মেয়ে সন্তর্পনে অগ্রসর হয়। আমজাদ কিছুদূর গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

সন্ধ্যার আঁধার-বন্দী বাতাস বেতগাছে শিরশির বহিয়া যায়। সেদিন-ও সন্ধ্যা ছিল। সেদিন মুনি-ভাই সঙ্গে ছিল। হঠাৎ তার দুই চোখ ছাপাইয়া পানী আসে। মুনি-ভাই-কে সে সত্যি ভালবাসিয়াছিল।

২৭

চন্দ্র কোটালের অবসর নাই।

এই বছর ভাল ফসল হইয়াছিল। গ্রামে গ্রামে ভাঁড়-নাচের আসর বসে। অনেক বায়না কোটালের। রাজেন্দ্র সাজ-পোষাক আনিয়াছিল। বেশ জাঁক-জমকের সঙ্গে তার দল জমিয়া উঠিয়াছে। এই জন্য বিভিন্ন গ্রাম হইতে ডাক আসে।

আজহার নূতন ব্যবসা-পত্তনের সঙ্গী পায় না। কোটাল-ও তা-কে কিছুদিন সবুর করিতে বলিল। মনোক্ষুন্ন হয় আজহার। হয়ত পরে তার হাতে টাকা থাকিবেনা। সে নিজেই কোন সুরাহা করিবে।

গঞ্জের দিনে ইয়াকুব আসিয়াছিল। সে-ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। আজহার তার কথায় সায় দেয় না। ইয়াকুব একা আসে না ত। সঙ্গে হাট-বাজার। মুর্গী, ঘী—এমন কি সরু চাল পর্যন্ত সে লইয়া আসে। আজহার এ-সব পছন্দ করে না। তার আত্ম-সম্মানে ঘা লাগে। এই জন্য ইয়াকুবের সঙ্গে কোন অংশীদারী কাজ তার ভাল লাগে না।

দরিয়া-বিবি আজকাল ইয়াকুবের চাল-চলন সহজে গ্রহণ করে। তার আত্ম-সম্মান সহজে তীক্ষ্ম হইয়া ওঠে না। আপন-জন আত্মীয় সে কিছু সঙ্গে আনিলে, অত সংবেদন-শীল হইলে চলিবে কেন ?

আজহার চুপ্‌চাপ থাকে। মেহ্‌মানদারীর কাজে দরিয়া-বিবির বেশ উৎসাহ দেখা যায়। বহুদিন পরে এই বাড়ীতে পলান্নের সৌরভ পাওয়া গেল। আরো দু-তিন রকমের তরকারী হইল। ইয়াকুব লুচি তৈয়ারী করিতে বলিয়াছিল। দরিয়া-বিবির সম্মতি ছিল না। কাল সকালে নাস্তার সময় তখন তৈয়ারী হইবে। বাড়ীর ছেলেরা ইয়াকুবের নামে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে। ইয়াকুব-চাচা নামে মধু ঝরে না শুধু, নঈমার জিহ্বায় রীতি-মত 'লালা' সরে।

আমজাদের স্কুলের বেতন সে নিয়মিত দিয়া আসিতেছে।

কয়েক বছর পূর্ব্বে দরিয়া-বিবি সামান্য দান-গ্রহণে আসেকজানের সহিত বিবাদ করিত। সেই তেজ অন্তহিত হইয়াছে। স্বামীর মানসিকতা সে চেনে। আজহারের উপর তাহার ক্ষোভ হ্রাস পায় না। আত্মীয়-স্বজনের সহিত অত বাঁধাবাঁধি নিয়ম চলে না।

রাত্রে আহারের সময় আজহার ডাল ও দৈনন্দিন বরাদ্দ একটী আলুর তরকারী দিয়া ভোজ সমাধা করিল। মাগুর মাছ আনিয়াছিল ইয়াকুব। সে তা স্পর্শ করিল না।

দরিয়া-বিবি শুধায়, গোশ্‌ত খাবে না?

—না, আমার পেটের গোলমাল আছে।

আসলে আজহার মনের কথা চাপিয়া গেল। ইয়াকুবের কয়েকটী টাকা সে লইয়াছে তাহা যেন তার গায়ে হুল ফুটাইতেছে। টাকা ফেরৎ-দেওয়ার উপায় নাই। তার স্বপ্ন-রাজ্য যে ধূলিস্মাৎ হইয়া যায় টাকা-গুলির অভাবে। এই বাধ্য-বাধকতার ছায়ায় আজহার নিরূপায়। নচেৎ সে ইয়াকুবের মুখোমুখি এই দাতব্য-গিরি বন্ধ করিবার হুকুম দিত।

দরিয়া-বিবি কোথায় ঘা দিতে হয়, ভাল-রূপেই জানে।

রাত্রে স্বামীকে বলিল, আমুর ইস্কুলের মাইনে মাসে মাসে দিতে হয়রান। সাম্‌নে বছর ফসল যদি না হয়, কি ভাবে যে দিন কাট্‌বে।

আজহার কিছুক্ষণ নিরুত্তর রহিল।

—জবাব দাও, এ-সব কথা মনে আছে। খালি ব্যবসা-ব্যবসা। কতবার-ই ত কত টাকা উড়িয়ে দিলে।

—আল্লার মরজী হোলে কতক্ষণ।

বিরক্ত হয় দরিয়া-বিবি: আল্লার মরজী, মরজী করে ত দশ বছর কেটে গেল। এখন তোমার মরজী হোলে বাঁচা যায়।

আজহার জবাব দিতে গিয়া থামিয়া গেল।

—ইয়াকুব-ভায়ের সঙ্গে ব্যবসা করো না। দেখো না, আল্লার মরজী কোন্ দিকে যায়।

—ওর সঙ্গে ব্যবসা পোষাবে না।

—তা পোষাবে কেন ?

দরিয়া-বিবি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আজহারের নির্ব্বুদ্ধিতার শত-রকম ব্যাখ্যা করিল।

কিন্তু অপর-পক্ষ নীরব। আনমনা কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে জানে না।

পরদিন সকালে আবার নাস্তার বহর। ইয়াকুব দরিয়া-বিবি-কে তার বাৎসরিক মুনাফার বয়ান দিল। তিন হাজার টাকা পাইয়াছে পাটে, গোলদারীর দোকানে দু-হাজার ইত্যাদি ইত্যাদি।

নাস্তা খাওয়ার সময় আজহার-কে পাওয়া গেল না। সে মাঠে চলিয়া গিয়াছে। গোয়াল-ঘরে গরু-ছাগল কিছু নাই। দরিয়া-বিবির অনুমান মিথ্যা নয়।

ইয়াকুব বলিল, ভাবী সাহেব, কেমন যেন আমাদের ভাই-সাহেব! আমার সঙ্গে কাজ-কর্ম্ম করত, আল্লা মুখ তুলে চাইতেন।

—মাথায় ছিট্ আছে। কে পারবে বলো ওর সঙ্গে।

—আপনার মত আক্কেল থাক্‌লে আমি এতদিন লাখ-পতি হোয়ে যেতাম।

প্রশংসায় সন্তুষ্ট হয় দরিয়া-বিবি। দেবর-কে সে পান সাজিয়া দিতেছিল। বাটায় সুপারি নাই। একবার উঠিল দরিয়া-বিবি, সিকায় সুপারি আছে। ঘরে প্রবেশের সময় সে একবার পিছন ফেরে। ইয়াকুব তার গমন-পথ অথবা নিতম্বের দিকে চাহিয়া আছে, বোঝা যায় না। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি খুব শোভন মনে হয় না।

পানের বাটার নিকট ফিরিয়া আসিল দরিয়া-বিবি, বেশ সংকুচিত।

চোখাচোখি ইয়াকুবের দিকে সে তাকায়। না, তার দৃষ্টি-ভ্রম। আসলে ইয়াকুবের দৃষ্টি যেন এইরূপ।

অবসর সময়ে তার মনে আন্দোলন জাগে। আসলে লোকটা খারাপ নয়। তবে অমার্জিত রুচি। এই জাতীয় দ্বন্দ্বের ভেতর দরিয়া-বিবি সমস্যার সমাধান খোঁজে। ব্যবসাদার লম্পট সম্বন্ধে দরিয়া-বিবির কোন জ্ঞান ছিল না। আজহার তার গুণ-গ্রামের হদিস

জানিত বলিয়া দূরে দূরে থাকিত।

সেদিন সকালেই ইয়াকুব চলিয়া গেল। দুপুর-বেলা বিছানা পরিষ্কার করিতে গিয়া বালিশের নীচে একটী দশ টাকার নোট পাইল। দাঁড়াইয়া রহিল দরিয়া-বিবি কিছুক্ষণ স্তব্ধ। মুঠির মধ্যে নোট অজানিতে-ই সে দুমড়াইতে থাকে। সচেতন হইলে সে সংকুচিত নোটটী আঁচলে বাঁধিয়া রাখিল।

মাঠের সামান্য কাজ করিয়া আজহার চন্দ্র কোটালের বাড়ী গিয়াছিল। সে বিকালে গানের বায়নায় যাইবে। সাজ-গোজ হইতেছে সকালে।

চন্দ্র আজহার-কে বসিতে দিয়া তামাক সাজিতে লাগিল। শিবুর বৌ আগে আসিয়াছিল। একটী বছর চার বয়সের ছেলে মার অঙ্গ-সংলগ্ন হইয়া আঙুল চুষিতেছে। কাঁখে আর একটী মেয়ে।

আজহারের চোখ পড়িতে শিবুর বৌ ঘোমটা বাড়াইয়া দিল।

—কেমন আছো, বৌ।

বৌ অশ্রু-সজল কণ্ঠেই জবাব দিল, ভগবান মেরেছেন। আমাদের আর থাকাথাকি, চাচা।

শিবু আজহার-কে চাচা বলিয়া ডাকিত। সেই সূত্রে এই আত্মীয়তা।

আজহার সমবেদনার কোন কথা যেন খুঁজিয়া পায় না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। শিবুর বৌর কানে তা পৌঁছায়।

চন্দ্র এমন সময় কলিকা হাতে আজহারের পাশে আসিয়া বসিল।

—দেখেছ ত খাঁ-সাহেব। এই তোমার-আমার ধর্ম্ম।

—তা দেখ্ছি।

—দেখ্ছ। ঘোড়ার ডিম দেখ্ছ। ধর্ম্ম না কচু। হাতেম বখ্শ যদি মুসলমান হয় কি রোহিনী হিন্দু হয়, তবে চণ্ডাল কে?

—দেখ্ছি সব।

—তুমি কিছু দেখ্তে পাও না, খাঁ। টাকার নামে শালারা ধাম্মিক। খামাখা দু-টো গরীবের প্রাণ গেল।

শিবুর বৌ-কে সম্বোধন করিয়া বলিল, তুমি গিয়েছিলে মা, রোহিনী চৌধুরীর কাছে?

—গিয়েছিলাম, পাঁচটা টাকা দিয়েছিল।

বড় ম্রিয়মান কণ্ঠ শিবুর বৌর।

—শোনো, খাঁ। পাঁচ টাকা। অমন টাকায় মুতে দাও। একটা লোকের দাম পাঁচ টাকা। আজহার ভাই, গরীবে গরীবে যদ্দিন বেঁচে আছি, আর ধর্ম্মের কথা কানে আন্‌ছি না। আমিও রোহিনীর ফাঁদে পড়েছিলাম। শালা রোহিনী।

—গালাগাল দিয়ো না খামাখা।

—গালাগাল দোব না। তুমি শিবুর বৌ-কে খাওয়াতে পারবে? ধরো যদি খাওয়াতে পারতে, এর স্বামী-কে জ্যান্ত করে দিতে পারবে? গালাগাল দোব না—

রক্তচক্ষু কোটাল হুকা টানিতে লাগিল।

শিবুর ছেলেটা দুই জনের দিকে অবোধ-নয়নে চাহিয়া থাকে।

— গালাগাল দোব না। ইসমাইলের বৌ ছেলপুলে নিয়ে বাবার বাড়ী চলে গেল। তারা-ও গরীব। তুমি ত চেন দশহাটার মল্লিকদের।

—হুঁ। চিনি।

—শিবুর বৌর কেউ নেই। তার চালে খড় নেই দু-আঁটি। বল্‌ছি, বৌ এখানে এসে থাক্‌। আমি আর একটা কুঁড়ে তুলব। গাঁয়ের বাসেদ, পাঁড়ু, গণেশ সবাই গায়ে-গতরে খেটে দেবে বলেছে।

আজহার বলিল, যখন যা-দরকার আমাকে ডেকো।

—তা আলবৎ ডাক্‌ব। হাতেম বখ্‌শোর গুষ্টিশুদ্ধ শহরে মদ টানে, সে মুসুলমান, তুমি-ও তার কথায় উঠো-বসো, না?

—তুমি-ও ত রোহিনীর কথায় নেচেছিলে?

লজ্জিত কোটাল জবাব দিল, তা ঠিক। কিন্তু আর নয়। শালাদের ধর্ম্মের নিকুচি। আর আজহার-ভাই, তোমার মিন্‌মিনে স্বভাব আমার ভাল লাগে না। জোর গলায় বুক ঠুকে ওদের কাছে কথা বল্‌তে হবে।

—ওরা বড়লোক। পুলিশ—দারোগা—

কথা তার মুখ হইতে চন্দ্র যেন লুফিয়া লইল, আইন নেই? আমরা ত দু-চার জন নই। গাঁয়ের হাজার হাজার গরীব। পুলিশ যদি আইন মত না চলে, ওদের কথায় ওঠে-বসে আমাদের লাঠি নেই, বল নেই—

ভাঁটার মত দুই চক্ষু ঘোরে কোটালের।

হঠাৎ থামিয়া সে বলে, কথায় কথায় দেরী হোয়ে গেল, অনেক গোছ্‌গাছ বাকী। পরে এসো, তুমি। শিবু বৌ-মা, এখানে খেয়ে সন্ধ্যায় বাড়ী যেয়ো—

দুইজনে আসর ভাঙিয়া দিল।

আজহার গ্রামের পথে শিবুর বৌর কথা ভাবে। ভবিষ্যতের সংস্থান তার-ও নাই। একমাত্র আশ্রয় পথ। না, সে আবার ভাগ্য-অন্বেষণে বাহির হইবে। টাকার জন্য এত হীনতা যখন স্বীকার করিয়াছে, ঘরে পড়িয়া থাকা ভাল নয়। কপাল ফিরিবে না তার?

খোদার মরজী হইলে কতক্ষণ!

২৮

সকাল-সকাল দরিয়া-বিবি গৃহস্থালির কাজ সারিয়া বসিয়াছিল। কোলে ছোট খুকী শরী।

ঈষৎ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। হাই উঠিতেছিল দরিয়া-বিবির। আমজাদ নিজের ঘরে জোরে জোরে পাঠাভ্যাস করিতেছে। আজহার দাওয়ায় বসিয়া হুঁকা লইয়া মশ্‌গুল। গুড়গুড় শব্দ উঠিতেছে।

মুনির মা!

আজহার ডাক দিল। মোনাদির আসিবার পর দরিয়া-বিবির নাম বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছিল সে। কালে-ভদ্রে আমুর মা বলিয়া ডাক দিত।

—কেন?

—আজ ওদিকের গাঁয়ে গিয়েছিলাম।

—কেন?

—বীজ ধান কেনা দরকার।

উত্তপ্ত কণ্ঠ দরিয়া-বিবির: তা আমাকে শোনানোর কোন দরকার আছে?

—না। এম্‌নি—

আজহার চুপ করিয়া গেল। কিন্তু তার কথার খেই শেষ হয় নাই, কণ্ঠে তার পরিচয়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ সে বলে, ও-গাঁয়ে গিয়েছিলাম, শুন্‌লাম মুনি নাকি—

দরিয়া-বিবি উৎকর্ণ হয় এইবার।

আজহার বলিতে থাকে: মুনি, ও-গাঁয়ে নেই।

—নেই!

দরিয়া-বিবি দাওয়ার কিনারায় বসিয়াছিল। স্বামীর নিকটে আগাইয়া আসিল।

—কে নেই ?

শ্রুতি-ভ্রমের উপর এখন-ও বিশ্বাস আছে দরিয়া-বিবির।

পুনরুক্তি করিল, কে নেই ?

—মুনি।

—মুনি ও গাঁয়ে নেই ?

—না।

—কতদিন নেই ?

—এখান থেকে যাওয়ার পর আর নাকি ওখানে যায়নি।

আমজাদের ডাক পড়িল। সে পড়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল।

দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসা করে ঃ আমু. তোর মুনি-ভাই তবে যে তার চাচার বাড়ীতে আছে, আগে বলেছিলি।

—আমি ত তাদের বাড়ী যাইনি। শুনে এসেছিলাম।

দরিয়া-বিবি ক্ষোভে আগুন হইয়া উঠে ঃ শুনে এসেছিলি—

তারপর পুত্রের দিকে কট্‌মট চোখে তাকায়।

আমজাদ প্রায় কাঁদিয়া-ফেলার উপক্রম। নিজের সাফাই সে দক্ষ আসামীর মত গাহিয়া গেল। আজহারের আফশোষ বড় কম নয়, সে নিজের উপর বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল।

—আমার চণ্ডাল মেজাজে সেদিন আগুন ধরেছিল। এই হাতে 'আজার' হোক।

দরিয়া-বিবি আর কোন কথা বলিল না। কারো বাক্যালাপ তার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছিল কিনা, সন্দেহের ব্যাপার।

সমগ্র দাওয়া স্তব্ধ এক নিমেষে।

আমজাদ পা টিপিয়া-টিপিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তার পাঠাভ্যাস নিভিয়া গিয়াছে। কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। আজহার হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। দরিয়া-বিবি কখন শরী-কে লইয়া উঠিয়া গিয়াছে, তার খোঁজ-ও সে রাখিল না। সেই অবস্থায় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম-ভাঙার পর তার অচেনা ঠেকে সব জায়গা। দাওয়ায় পিদিম নাই। উঠানে অন্ধকার আর অন্ধকার। এক-রাশ ঝিঁ ঝিঁ উর্দ্ধশ্বাসে ডাকিতেছে।

আজহারের মস্তিষ্কে তার অনুকরণ চলে। সন্তর্পণে সে ঘরের দুয়ারে করাঘাত করিল। না, সব বন্ধ। আমজাদের ঘর-ও খোলা নাই। অভুক্ত সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে-ও ঘুমাইয়া পড়িল দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া।

পরদিন খুব ভোরে আজহার মাঠে চলিয়া গেল।

দরিয়া-বিবির ডাকে আমিরণ-চাচি হাজির হইল পরদিন। মুনির খোঁজ-গ্রহণের সে প্রতিশ্রুতি দিল।

বিকালে আমিরণ-চাচি হতাশ-সংবাদ দিয়া গেল। মুনি চাচার বাড়ী যায় নাই। ভয়ানক কান্না জুড়িল দরিয়া-বিবি। কারো স্তোক-বাক্যে তা থামে না। হাসু-বৌ আসিয়াছিল। তার-ও চোখের পানী অঝোর।

—ও যদি একদম আর এ-বাড়ী না আস্‌ত আমার দুঃখ ছিল না। কিন্তু এলো, আমি তাড়িয়ে দিলাম—

দরিয়া-বিবি ফুঁপাইতে থাকে।

—বেটা ছেলে, কোথাও গেছে। আমি আরো খোঁজ নিচ্ছি। আশ্বাস দিল আমিরণ-চাচি।

—আর সে ফিরে আস্‌বে। কোথা গেল, অতটুকু কচি ছেলে।

—আমি গণৎকারের কাছে 'গুনিয়ে' আস্‌ব। কোন্ দিকে গেছে, কবে ফিরে আস্‌বে ঠিক বলে দেবে, সেবার আমার বোনের দেবর এম্নি—

আমিরণ-বিবি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বলিল।

দরিয়া-বিবি আশ্বস্ত হয় না, তবু অনুরোধ করিল "আমি পাঁচ পয়সা দেব, বোন।"

—পাঁচ পয়সা আর একটা সুপারি লাগে

আমিরণ-চাচি জবাব দিল।

—তুমি এখন-ই নিয়ে যাও।

আম্বিয়া বাড়ীতে আছে, আমিরণ-চাচি আর দেরী করিতে পারে না। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। বেশ অন্ধকার চারিদিক। বন-বাদাড় ভাঙিয়া যাইতে হইবে।

—পয়সা সুপারি আমি দেব। মুনি আমার ছেলে নয় নাকি?

চাচির সহানুভূতি অকৃত্রিম।

হাসু-বৌ ও আমিরণ-চাচি বিদায় লইল।

আজহার মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমজাদ শুধু সে-সংবাদ জানে। থম্‌থমে আবহাওয়ার জন্য পিতাকে একবার দেখিয়া সে নিজের ঘরে ডিপার আলোয় চুপিচুপি পড়িতেছিল। কিন্তু পড়ায় তার কোন মন ছিল না।

দরিয়া-বিবি সকলে চলিয়া গেলে আমজাদের ঘরে আসিল।

—আমু।

—মা।

—কাল ও-গাঁয়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আস্‌বি। আর একবার গঞ্জের দিকে যাস্‌।

—আচ্ছা, মা। মুনি-ভাইয়ের জন্য আমারও মন কেমন করে। সত্যি সজল হইয়া ওঠে আমজাদের চক্ষু।

– তোর আব্বা মাঠ থেকে আসে নি ?

—এসেছিল ত। খানিক আগে দেখেছি।

ডিপা-হাতে দরিয়া-বিবি ঘরে প্রবেশ করিল। বাঁশের আল্‌নায় আজহারের লুঙ্গী-পিরহান কিছু নাই। কাটা দেওয়ালের গায়ে একটী কুলুঙ্গী ছিল। আজহারের সুতা কন্নিক পাটা উষো ও যাবতীয় রাজ-মিস্ত্রীর সরঞ্জাম থাকিত। সব শূন্য।

দরিয়া-বিবি চারিদিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাকাইল এবং সব-কিছু নিমেষে উপলব্ধি করিল।

২৯

"তোমার বাবা আবার রুই-পোনা ধরতে গেছে। চুনো-চানা খেয়ে কি খাঁ-সাহেবের দিন কাটে? জানো, চাচা?

চন্দ্র ও আমজাদের মধ্যে বাক্যালাপ হইতেছিল। হাসিয়া-হাসিয়া কোটাল কথাগুলি উচ্চারণ করিল। দরিয়া-বিবি দহলিজের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে, চন্দ্রের তা খেয়াল ছিল না। তার মুখের হাসি তখন-ই নিভিয়া গেল।

দরিয়া-বিবি চন্দ্র-কে ডাকাইয়া আনিয়াছিল। আমজাদ জানে, বিপদে-আঁপদে মা প্রথমে চন্দ্র-কাকার কথাই মনে করে। পুত্রের মারফৎ এতক্ষণ অনেক কথাই দরিয়া-বিবি তাহাকে শোনাইয়াছে।

তাই ত!

হাসি চাপা দিতে চন্দ্র কোটাল আবার উচ্চারণ করিল, "তাই ত, ভাবী-সাহেব। এমন মানুষ আমি আর একটা দেখিনি। মাঝে মাঝে কি যে ঝোঁক চাপে! দু-হপ্তা গেল। মানুষ একটা খবর ত দেয়। তা-ও না।"

দরিয়া-বিবির দীর্ঘশ্বাস কোটালের কানে যায়। চন্দ্র সহসা কোন জবাব দিতে পারে না। আবহাওয়া হাল্কা করিতে সে ওস্তাদ। কিন্তু সে-ও কেমন যেন ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

আমজাদ বলিল, "জানো কাকা, আব্বা আমাদের দেখ্‌তে পারে না। তাই বাড়ী ছেড়ে পালায়।"

চন্দ্র প্রতিবাদ জানাইল, "তা না চাচা। খেয়ালী মানুষ। সংসার নিয়ে কষ্ট পায়। তাই মাঝে মাঝে ঐ-সব করে। ভাবে, দুঃখ যাবে। কিন্তু দুঃখ কি সহজে যায়? বৃটিশ রাজত্ব। আগে বৃটিশ যাক্, রোহিনী-হাতেম বখ্‌শ—এই শালারা যাক্, তবে না দুঃখ যাবে।"

আমজাদ এত কথা বোঝে না। সে সায় দিতে রাজী নয়। পিতার প্রতি তার আক্রোশ আছে।

"কিন্তু ব্যাপার কী জানো, তোমার বাবা—", চন্দ্র কোটালের বাক্য আড়াল হইতে পূর্ণ করিল দরিয়া-বিবি, "চুপ শয়তান।"

চন্দ্র এবার হাসিল। সে যেন আত্মস্থ হইয়াছে। "ঠিক বলেছেন ভাবী। আমার মনে যা' হয়, মুখে তা বলে ফেলি। কিন্তু খাঁ-ভাই ? উঃ, জান্ গেলে-ও বেশী কথা বলে না। যদি কারও হাজার টাকায় চুপ-শয়তান দরকার হোত, আমি তোমার বাবা-কে বেচে দিতাম, চাচা।" চন্দ্র হা হা শব্দে হাসিতে লাগিল। আমজাদ সঙ্গে যোগ দিল।

এমন সময় ভিতর হইতে ধমকের সুরে দরিয়া-বিবি ডাকিল "আমু, তোর কাকা-কে জমির কথা জিজ্ঞেস কর।"

দুই জনের হাসি হঠাৎ বন্ধ হইল। আমজাদ নয়, জবাব দিল কোটাল।

'ভাবী-সাহেব, তার জন্য আপনি ঘাব্ড়াবেন না। ধান আমি নিজে কেটে দেব। এবার খড়ের দাম খুব বেশী। মানুষ ঘর-দোর ছাওয়াচ্ছে। পনর-ষোল টাকা কাহণ। আমি ভাবচি, খড় কিছু রেখে বাকী বেচে দেব।"

"কাহণ খানেক রেখে দেবেন।" মৃদু কণ্ঠে দরিয়া-বিবি জবাব দিল।

চন্দ্র আবার বলিল, "শুধু ধান-কাটা নয়, তরমুজ আর কুম্ড়া বিঘে খানেক জমিতে দেব ভাবছি। কিন্তু আমার আসর গানের বায়না আছে! আমজাদ-চাচা আছে, দেখি কি বন্দোবস্ত করা যায়।"

দরিয়া-বিবি এবার আমজাদ-কে ডাকিয়া বলে, "আমু, তোর চাচা-কে পান-তামাক এনে দে," ঘোর আপত্তি জানাইল চন্দ্র। "না, এখন কিছু দরকার নেই। আমি আজ উঠি, ভাবী-সাহেব। আমার ক্ষেতে অনেক কাজ পড়ে আছে।"

সত্যই চন্দ্র কোটাল উঠিয়া পড়িল। আমজাদ তার অনুসরণে গেল। মহেশ-ডাঙার জলা-জঙ্গল ভরা পথে-পথে চন্দ্র-কাকার সহিত বেড়াইতে পাইলে সে আর কিছু চায় না। কত হাসির গান, মশ্করা আর প্রাণ-ঢালা আদর না পাওয়া যায় চন্দ্র-কাকার কাছ হইতে।

"ভাবী-সাহেব ঘাবড়াবেন না," চন্দ্রের স্তোক-বাক্যে দরিয়া-বিবি জোর পায়, কিন্তু অস্বোয়াস্তি যায় না।

গত বিশ বছর এমন কত-বার ঘটিয়াছে। বার-ফাট্টা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যদি আর না আসে। দৈহিক শক্তি এতদিন দরিয়া-বিবির সহায় ছিল। আজ-ও স্বাস্থ্য তার অটুট। কিন্তু মন বড় নিস্তেজ ও নিঃসঙ্গ।

আত্ম-চিন্তায় মশ্‌গুল দরিয়া-বিবি। উঠানে একটী ছাগল-কে কাঁঠাল-পাতা খাওয়াইতেছিল। শরী দাওয়ায় চুপ্‌চাপ একা ঘুমাইয়া। সে বড় লক্ষ্মী মেয়ে। কেবল ক্ষুধার সময় কাঁদে। পেট-ভরা থাকিলে শুধু ঘুমায়। দরিয়া-বিবি তাই বড় নিশ্চিন্ত, নির্বিঘ্নে সাংসারিক কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। ছাগলগুলি দরিয়া-বিবির বড় প্রিয়। প্রতি বছর-বছর বাচ্চা হয়। ঈদ ইত্যাদি পর্ব্ব-উপলক্ষ্যে লোকে ছাগল কেনে। তখন ছাগল-বেচায় একটা আনন্দ আছে। দাম বেশী পাওয়া যায়। তা-ছাড়া টানাটানির দিন একটু সহজ হয়।

এই প্রাণীদের লইয়া দরিয়া-বিবি ব্যস্ত। আমিরণ-চাচি কখন ধীরে ধীরে উঠানে ঢুকিয়াছে তা সে লক্ষ্য করে নাই। পাতা-খাওয়ানো ত একটা দৈনন্দিন কাজ। দরিয়া-বিবি ছাগলগুলির দিকে ভালরূপে তাকায় নাই। কাঁঠালের ডাল-পালা শুধু আগাইয়া দিতেছিল। মনে নানা হিসাব-নিকাশের ঝড়।

আমিরণ-চাচি দরিয়া-বিবির থম্‌থমে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে হঠাৎ মৃদুকণ্ঠে ডাক দিল, বুবু।

দরিয়া-বিবির ঠোঁটে অভ্যর্থনা-মুখর মৃদু হাসি।

“কখন এলে ?”

“তার-ও খোঁজ নেই ? কর্তা বিরাগী, গিন্নীর মন এমন উদাস না-হোলে চলে।” বলিয়া আমিরণ-চাচি হাসিয়া উঠিলেন। দরিয়া-বিবির মুখ আবার থম্‌থমে। আমিরণ-চাচি অপ্রস্তুত হইয়া যায়। দরিয়া-বিবির সেদিকে চোখ-পড়া মাত্র সে ছাগলগুলিকে হাঁকাইয়া দিয়া চাচির কোমর জড়াইয়া বলিল, “ঘরের ভেতর চলো বুবু। কি আমার কর্তারে— তার জন্য আবার চিন্তা !”

আমিরণ-চাচি সহানুভূতির সুরে জবাব দিল, “এমন লোক—।” কিন্তু যেন ঝাপ্টা দিয়া দরিয়া-বিবি তার মুখের কথা নিভাইয়া দিল।

"চলো, পান খাই, দু-টো কথা বলি।

নদীর ধারে বাস
দুক্ষু বারো মাস।
রাখো বাজে কথা।"

আমিরণ-চাচি দরিয়া-বিবির সুরের কৃত্রিমতা কিছু-ই ধরিতে পারে না।

দুইজনে সত্যই কিছুক্ষণ আজেবাজে আলাপ করিল। গ্রামের কথা, পাড়া-পড়শীদের কথা। সাকের কোথায় দাঙ্গা করিতে গিয়াছে, হাসু বৌ শাশুড়ীর গঞ্জনা আজকাল অনেক বেশী শোনে ইত্যাদি।

আমিরণ-চাচি কাজের লোক। গরু-বাছুর হাঁস-মুরগী লইয়া সে এক রাজ্যের অধিশ্বরী। বেশীক্ষণ কথা-ফোড়নের সময় কোথায়? একটী খবর দিতে আসিয়া সে এতক্ষণ সুযোগ খুঁজিতেছিল। হঠাৎ চাচি বলিয়া ফেলিল, দরিয়া-বুবু একটা খবর আছে।

কত সংবাদের জন্যেই দরিয়া-বিবি হা-প্রত্যাশায় নিমজ্জিত, তখন-ই উৎকর্ণ-উন্মুখ ব্যগ্রতায় চাচির দিকে তাকাইল।

"আমাদের মুনি-চাচার খবর পেয়েছি।" দরিয়া-বিবি অন্য কোন সংবাদ পাইলে যেন সন্তুষ্ট হইত। বেশী উৎসাহ না দেখাইয়া সহজ গলায় বলিল, "কি খবর?"

"মুনি-চাচা, ও বাড়ী থেকে চলে গেছে। আরো পাঁচ-ক্রোশ দূরে কি স্কুল আছে, সেখানেই পড়ে। চাচাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আর নেই।" আমিরণ-চাচি খুব তরল গলায় পরিবেশন করিল।

"যেখানেই থাক্, ভাল থাক্। আমার ছেলে ত নয়, আমার কি জোর আছে।" ভয়ানক নির্লিপ্ত শোনায় দরিয়া-বিবির কণ্ঠ।

প্রতিবাদ জানাইল আমিরণ-চাচি, "তোমার ছেলে নয় কে বল্‌লে? দেখো রক্তের টান, চাচা আবার তোমার কোলেই ফিরে আস্‌বে।"

"আসুক বা না আসুক, যেখানে থাক্ বেঁচে থাক্। তুমি কোথা থেকে খবর পেলে?"

"আমি খবর পেয়েছি। আমার এক মামাতো ভাই আছে মুনিদের গাঁয়ের পাশে। তাকে খোঁজ নিতে বলেছিলাম।"

"তোমার মেহেরবাণী, বুবু।"

তারপর আমিরণ-চাচি কর্ত্তব্যের ডাকেই উঠিয়া পড়িল। আম্বিয়া একা বাড়ীতে আছে। দেবর বিধবার সম্পত্তি-হরণের নানা পাঁয়তারা কষিতেছে। আর বেশীক্ষণ এখানে কাটানো চলে না। আমিরণ-চাচি কিন্তু অবাক হয়। আজ তার বুবু পুত্র-প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিল না। অথচ অন্য সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই এক কথা-ই বড় হইয়া দেখা দেয়।

দরিয়া-বিবি আমিরণ-চাচিকে দহলিজ পর্যন্ত আগাইয়া দিল ও আবার আসার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু উঠানের দিকে অগ্রসর হইতে তার পা যেন আর চলে না। ধীরে ধীরে ছোট্ট শরীর বিছানার পাশে আসিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল ও তার ঘুমন্ত মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তখন দরিয়া-বিবি কি ভাবিতেছিল, শুধু সে-ই তার খবর রাখে।

৩০

গঞ্জের পথে ইয়াকুব আসিয়াছিল খোঁজ-খবর লইতে ; সে খালি হাতে আসে না। ছেলেদের জন্য মিষ্টি ; তা-ছাড়া এত জিনিস-পত্র আনে, যার প্রাচুর্য যে-কোন সংসারের পক্ষে তিন-চার দিনের জন্য লোভনীয়। দরিয়া-বিবি প্রথম-প্রথম মৃদু আপত্তি জানাইত। এখন নিজেই ইয়াকুব-আনীত মায়া-পেটিকা নিজের হাতে খোলে। অবশ্য উৎসাহ দেখায় না বিশেষ।

এবার ইয়াকুব বড় বড় কই ও বড় বড় চিংড়ি মাছ পর্যন্ত আনিয়াছিল। আজহার ঘরে থাকিলে মাঝে মাঝে খালে মাছ ধরিতে যায়। তখন এমন মাছ এই বাড়ীর হাঁড়িতে ওঠে। নচেৎ এত দামে এমন আমিষ আহারের সামর্থ্য কোথায় ?

ইয়াকুব ফোড়ন দিয়া বলিল, "ভাবী এবার মটর-শুটি পাওয়া গেল না। বড় চিংড়ি আর মটর-শুটি আমার খুব পছন্দ।"

"তোমার ক্ষেতে হয় না ?" দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসা করিল।

"না—অসময়ে সব-সময় কি আর এই ফসল তোলা যায়।"

ছেলেরা ইয়াকুব চাচা-কে ঘিরিয়া থাকে। নঈমা কাছ ছাড়া হয় না, বরং অন্য সময় মাকে জিজ্ঞাসা করে, "চাচা কবে আস্‌বে মা ?" কারণ চাচা একা আসে না। আমজাদ কাছ ঘেঁষিয়া বসে। সে লাজুক তাই সে কম কথা বলে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইয়াকুবের সঙ্গ ত্যাগ করে না।

লৌকিকতার রেশ আর নাই। মেহমান হইলে-ও ইয়াকুব আহারের ফিরিস্তি নিজেই দিয়া থাকে। কারণ যোগাড় সে বহন করিয়া আনে।

দরিয়া-বিবি বিকালে লুচি ভাজিতেছিল। পাশে কোন্ ছেলে-পুলে নাই। নঈমা একবার আসিয়াছিল শিশু-সুলভ প্রত্যাশায়। কিন্তু মা বসিতে দেয় নাই, ধমক দিয়া তাহাদের ভাগাইয়াছে। আরো বকুনি খাইয়াছে আমজাদ। "এত বড় ছেলে স্কুলে পড়িস। এমন হা-খেয়ে কেন ? কোনদিন লুচি দেখিস্‌নি চোখে ?" ইহার চোটে দুরন্ত পেটুক-ও ছুটিয়া পলাইত।

আজহারের কথা এই বাড়ীতে ছেলেরা কেহ মুখে আনে না। ইয়াকুব তার কথা জিজ্ঞাসা করে নাই সারাদিন। কুশল-জিজ্ঞাসার রীতিটুকু পর্যন্ত সে পালন করে নাই। অথচ আত্মীয়।

কড়ায় গরম তেঁলে-ফেলা লুচির ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হইতেছিল। দরিয়া-বিবি আনমনা কাজ করিয়া যায়। সে নিজের চিন্তায় বুঁদ, তা মুখা-বয়বে প্রমাণ। দরিয়া-বিবির সুডোল গৌর মুখ চুলার আঁচে ঘামিতেছিল।

"ভাবী, ভাবী—আপনার রান্না কত দূর।" ডাক দিতে-দিতে ইয়াকুব চুলা-শালে প্রবেশ করিল। "বেগুন ভাজা হোয়ে গেছে, এখন লুচি ভাজ্‌ছি।" ইয়াকুবের দিকে না তাকাইয়া চুলার ভিতর এক খণ্ড লাকড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে দরিয়া-বিবি জবাব দিল।

"এখানেই দিন্, গরম-গরম লুচি খাওয়া যাক।"

"বেশ। কিন্তু বসার জায়গা কোথায়?"

"বসার জায়গা কি হবে? এই আমি বসে দেখিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া, ইয়াকুব উবু বসিয়া পড়িল।

"তোমার কাপড়-চোপড় ময়লা হবে।" ইয়াকুবের পরণে সিল্কের লুঙ্গী, গায়ে সাদা শার্ট। দরিয়া-বিবি মিথ্যা বলে নাই।

"না, আমি ত আর ছেলে-মানুষ নই।" যেন কত রসিকতা করা হইল। ইয়াকুব বেদম হাসিয়া উঠিল।

"বেশ বসো। আমি থালা-বাটী নামিয়ে আনি।"

দরিয়া-বিবি মাচাং হইতে লোয়াজিমা কয়েকটী নামাইয়া আনিল এবং বেগুন-ভাজা ও লুচি পরিবেশন করিতে লাগিল।

থালায় হাত নামাইয়া ইয়াকুব বলিল, "ভাবী, ছেলেদের ডাকেন।"

"ওরা খেয়েছে।" সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত জবাব। ইয়াকুব চাহিয়া দেখিল দরিয়া-বিবি তখন লুচি-বেলায় মগ্ন। উত্তপ্ত কড়ার দিকে তার আড়-চোখের দৃষ্টি। সেখানে টগ্‌বগ্ শব্দে তেল ফুটিতেছে।

"সত্যি ওরা খেয়েছে?

"হুঁ"। দরিয়া-বিবির কণ্ঠ ঈষৎ তীক্ষ্ণ শোনায়।

দরিয়া-বিবি গরম লুচি ছাঁকিয়া পাতে দিতে লাগিল। ইয়াকুব ধীরে ধীরে খাওয়া শুরু করে।

"ভাবী, একটু পানী।"

দরিয়া-বিবি ঝট্‌পট হুকুম তামিল করিল। আর কোন ব্যক্যালাপ যেন এগোয় না। ইয়াকুব দরিয়া-বিবিকে রীতিমত ভয় করে। তার চোখের দিকে সহজে তাকাইতে পারে না। থম্‌থমে মুখ যেন শাসন-ভঙ্গীর আদল। ইয়াকুব অস্বোয়াস্তি বোধ করে। তবে সে দুই স্ত্রীর পতী-দেব। মনের গোপনে একটা আত্মবিশ্বাস আছে তার। কিন্তু এখানে যেন সব ঠাণ্ডা হইয়া যায়। দরিয়া-বিবি কত শান্ত। অথচ ইয়াকুব অসোয়াস্তি অনুভব করে।

নিজের মনেই সে বলিয়া যায়, "আপনার বড়ৌ এলে যা শান্তি পাওয়া যায়, আর কোথাও তা মেলে না।"

আবার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, "কেন ?"

"কেন ? যত্ন-আত্যি কে করে ?"

"যত্ন-আত্যি", দরিয়া-বিবি হাসিয়া উঠিল। ইয়াকুব কান খাড়া করিল। কথাটা বিদ্রূপের মত শোনাইতেছে না ত ? কিন্তু সে কিছু উপলব্ধি করিতে পারিল না। দরিয়া-বিবি কোন সুযোগ না দিয়া বলিল, "তুমি যত্ন-আত্যি কোথায় দেখ্‌লে ? তোমার জিনিষ তুমি সঙ্গে আনো। ময়রাণীর মত তৈরী করে দিই। এ-তে যত্ন-আত্যি কোথায় দেখ্‌লে ?"

কণ্ঠ-স্বরের মধ্যে একটা দোকান-দারী ভাব।

ইয়াকুব মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়। তবু আবহাওয়া আরো সন্নিকট করিতে বলিল, "না, ভাবী এ-সব কপালের কথা। এমন শান্তি আমি ঘরেও পাই না।"

"তোমার ত খোদার মরজী দু-বিবি আছে ?"

"বিবি !" ইয়াকুব হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। মচমচে লুচির গুঁড়া হাসির চোটে এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িল। হাসি আর থামে না।

"বিবি ! বিবি কোথায় দেখ্‌লেন, ভাবী ?"

"ঘরের সে-দুটো তবে কি ?"

"গোশ্‌তের ঢিবি।"

দরিয়া-বিবি এবার হাসিয়া ইয়াকুবের দিকে তাকাইল। তখনই চোখ

নামাইয়া বলিল,-"আমি বিবি-সাবদের দেখিনি। মোটা হলে যদি গোশ্‌তের ঢিবি হয়, আমি-ত গোশ্‌তের পাহাড়।"

"না ভাবী। আপনি সংসারের লক্ষ্মী।"

দরিয়া-বিবি এই প্রশংসায় সন্তুষ্ট হয়। সেও হাসিতে থাকে এবং বলে, "নূতন কথা শোনালে, ভাই।"

ইয়াকুব এই নৈকট্যের প্রসাদ-ই ত চায়। সে খুশী হইয়া বলিল, "বাচ্চাদের ডাকেন, আমাকে আর দুটো লুচি দিন।"

সহজ গলায় দরিয়া-বিবি জবাব দিল, "বাচ্চারা পরে খাবে। তুমি এখন খাও।"

ইয়াকুব খাওয়া শেষ করিয়া বলিল, "ভাবী, একটু বেড়িয়ে আসি। আপনাদের গাঁ-খানা বড় জংলাটে। টাকা পকেটে করে ঘোরা যায় না। আমার ব্যাগ্‌টা রাখেন।"

"আমার কাছে কেন?"

ইয়াকুব টাকার ব্যাগ হাতে বলিল, "চুরি হওয়ার ভয় আছে।"

"কত টাকা আছে?"

"পাঁচ শ'।"

"না, ভাই। এত টাকা। হঠাৎ রাত্রে চোর এসে নিয়ে গেলে—।"

"আপনার কাছে চোর টাকা চুরি করতে আস্‌বে না।" ইয়াকুব মৃদু হাসি ছিটাইয়া বলিল।

"তবে কেন আসবে?"

কথা ঘুরাইয়া ইয়াকুব জবাব দিল, "চোরের ভয় নেই। আপনার যা' সাহস। আমার গোশ্‌তের ঢিবিরা এমন জংলা জায়গায় থাক্‌লে দশটা দরওয়ান রাখতে হোত।"

দরিয়া-বিবি হাত পাতিয়া দিল। ইয়াকুব মনিব্যাগ দিতে বিলম্ব করিল না। বাহিরে তখন গোধূলি। ইয়াকুব বাহির হইয়া আসিল। দরিয়া-বিবি আঁচলে ব্যাগ বাঁধিয়া আবার কাজে মনোযোগ দিল।

পরদিন দুপুরে ইয়াকুব গঞ্জের নৌকা ধরিবে। যাইবার সময় সে বলিল, "ভাবী, আমার ব্যাগটা দিন।"

দরিয়া-বিবি আমানত ফিরাইয়া দেওয়ার সময় বলিল, "ভাই, তোমার কাছে একটা আরজ আছে।"

ভয়ানক অধীরতা প্রকাশ করিল ইয়াকুব। সে ভাবিয়াছিল, ব্যাগে আরো টাকা আছে, হয়ত দরিয়া-বিবি ঋণের আবেদন জানাইবে।

"আপনার আরজ কি? হুকুম বলুন। তাড়াতাড়ি বলেন।"

"একটা খোঁজ-খবর নিও।"

"তা আর নেব না। আমি মনে করেন আপনাদের পর ভাবি?" ইয়াকুব দরিয়া-বিবির মুখের দিকে তাকায়। সে কিন্তু নত-মুখী। দৃষ্টি মাটীর উপর কি যেন খুঁজিতেছে।

খুব মৃদু কণ্ঠেই দরিয়া-বিবি জবাব দিল, "আমাদের খোঁজ নয়।"

ইয়াকুব হতাশ। আবার প্রশ্ন করিল, "তবে কার?"

"তোমার ভায়ের খবরটা।"।

"ওহ্, আজহার ভা'য়ের! তিনি ত খেয়ালী লোক, আস্‌বেন একদিন। ইয়াকুব জবাব দিল অত্যন্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে।

"তার জন্য আপনি এত উতোলা কেন?" বিস্ময় প্রকাশ করিল ইয়াকুব।

"স্বামীর জন্য এত মাথা-ব্যাথা কেন, তুমি তা-ই জিজ্ঞেস করছ?" দরিয়া-বিবি সোজাসুজি ইয়াকুবের দিকে তাকাইল।

"না—না তা নয়। আমি ভাবছি, একটু বিরাগী ধরনের মানুষ তার জন্যে ভেবে লাভ কী।" ইয়াকুব তখনই দৃষ্টি নামাইয়া অপরাধী-সুলভ কণ্ঠে জানাইল।

"তবু ভাব্‌তে হয়। শহরে মাল-পত্র কিন্‌তে তোমার লোক যায়, তাই খবর নিতে বল্‌ছি।"

"নিশ্চয় খবর নেব বৈকি। আমি তার কোন ত্রুটী রাখব না।"

"নিও ভাই। আল্লা তোমার ভাল করবে।" দরিয়া-বিবির কণ্ঠস্বরে কোন খাদ ছিল না।

"গঞ্জের বেলা হোয়ে গেল। আপনাকে খবর দেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন।"

ইয়াকুব আর দেরী করিল না। দরিয়া-বিবি ঘরে ফিরিয়া আসিল।

৩১

দরিয়া-বিবি আগে আশ-পাশের দু-একটী ভিটা ছাড়া আর কারো বাড়ী যাইতনা। তার নিজের-ও লজ্জা করিত। তা-ছাড়া ছিল আজহারের ভয়। এমন-ই শান্ত মানুষ, কিন্তু বে-শরিয়তী দেখিলে আর রক্ষা ছিল না। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সাংসারিক প্রয়োজনে দরিয়া-বিবিকে অন্য পাড়ায় যাইতে হয়।

আমিরণ-চাচির বাড়ী পাড়ার এক-টেরে। পথে এত ঝোপ-জঙ্গল। আর এই সড়ক প্রায় নির্জ্জন থাকে। কারণ লোক-চলাচল কম। দরিয়া-বিবির পর্য্যন্ত ভয় হয়। তাই সঙ্গে আমজাদ-কে লইত। নঈমা মা ছাড়া ঘরে থাকে না। সে-ও প্রায়ই সঙ্গে যায়। আমজাদের এই পথে হাঁটিতে খুব আরাম লাগে। সে এই জন্য মাঝে মাঝে "আমিরণ-চাচির বাড়ী চলো" বলিয়া দরিয়া-বিবির কাছে বায়না ধরে।

চাচির বাড়ীর আরো আকর্ষণ ছিল। আমিরণ-চাচি ঘরে ছেলেদের জন্য মোয়া, নাড়ু—কিছু-না-কিছু সব-সময় মজুদ রাখেন। আর আম্বিয়া মেয়েটী বড় প্রাণবন্ত। সেখানে গেলে মেয়েদের গল্পের অবসরে বেশ কিছুক্ষণ খেলা করা যায়।

আমজাদ সেদিন জিদ ধরিয়া দরিয়া-বিবিকে চাচির বাড়ী লইয়া গেল। হাতে বিশেষ কাজ নাই। দুপুরেই দু-বেলার রান্না সারা আছে। শুধু তরকারী রাত্রে গরম করিয়া লইতে হইবে। দরিয়া-বিবির কোন আপত্তি ছিল না। সেখানে গেলে মন কিছু হাল্কা হয়।

আমিরণ-চাচি গরু-কে এই মাত্র জাব দিয়া হাত ধুইতেছিল। হঠাৎ দরিয়া-বিবি ও ছেলেদের দেখিয়া স্মিতহাস্যে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল: এসো, বুবু এসো। আ রে আজ আমজাদ চাচা, নঈমা-খালা শুদ্ধ এসেছ। ও আম্বিয়া বেরিয়ে আয়।

ডাক দেওয়ার আগেই মেয়ে হাজির।

আন্বিয়া আর একটু ডাগর হইয়াছে। চাঞ্চল্য আদৌ কমে নাই। সে আমজাদের দুই হাত ধরিয়া বলিল, 'আমু ভাই, চলো ঘুঘুর বাসা দেখে আসি। তালগাছের পাশে একটা করঞ্জা-গাছের কোটরে বাসা বানিয়েছে।"

"চল্"।

আর কার তোয়াক্কা। আন্বিয়ার পিছু-পিছু আমজাদ-ও দৌড়াইতে লাগিল। পেছন হইতে আমিরন-চাচি চীৎকার দিয়া ডাকিলেন, "তোরা বেশী ঝোপের ভেতর যাস্‌নি, বড় সাপের জুলুম বেড়েছে।" কিন্তু তার কথা কে শোনে ?

আমিরন-চাচি পান সাজিয়া দিলেন। দরিয়া-বিবির সাধারণতঃ পান-খাওয়ার অভ্যাস নাই। তবে চাচির দান প্রত্যাখ্যান করে না।

আমিরন-চাচি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি রান্না হোলো ?"

"রান্না সেরে এসেছি।"

আমিরণ-চাচি যেন প্রশ্নের জবাব পাইয়াছেন। তাই অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

"আমার দেওরটা আসলে লোক খারাপ ছিল না।" আমিরণ-চাচির কথার মধ্যেই দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার জুলুম ধরেছে নাকি ?"

"অভ্যেস আর সহজে যায়। সেদিন খামাখা আমার ঝাড়ের দু-খানা বাঁশ কেটে নিল। নিক, ওর ছেলের কবরে লাগ্‌বে।" আমিরণ-চাচির গলা হইতে যেন এক ঝলক আগুন বাহির হইল।

দরিয়া-বিবিও ঘৃণা প্রকাশ করিল, "বেওয়া মানুষ, তো-কে দু-গাছি এনে দেওয়া দূরে থাক, তারই চুরি, এসব সইবে না"।

"ওদের সয়। পরের মেয়ে-মেয়ে বড় হচ্ছে। এদিকে লেফাফা ঠিক আছে। আজকাল আবার মস্‌জিদের মুয়াজ্জিনগিরি করে।"

নঈমার চোখ দিয়া পানী পড়ে। সে দৌড়াদৌড়ি আর ভালবাসে না। চাচি দু-টী মোয়া দিয়াছিল, সে তা চিবাইতে ব্যস্ত। বোধ হয় গলায় বাধিয়াছিল, তাই চাচির নিকট পানী চাহিল।

কথায় ছেদ পড়িল। দরিয়া-বিবি তখন চাচির উঠানের চারিদিকে চাহিয়া থাকে। এখানে আসিলে সত্যি, বুকে জোর পাওয়া যায়। বিধবা মানুষ। অথচ সংসার বেশ চালাইয়া যাইতেছে। উঠানটী নিখুঁত পরিষ্কার থাকে। আশেপাশে সব্জী-আনাজের গাছ। গত বছর চাচি একটী লেবু গাছ লাগাইয়াছিল। তা-ও পত্র-সম্ভারে বাড়িয়া উঠিয়াছে। সংসার বড় নয়, এই জন্যই আমিরণ সামাল দিতে পারে। দরিয়া-বিবি ভাবিতে লাগিল।

আমিরণ-চাচি পানীর গ্লাস নঈমার হাতে দিল।

"ওর জন্য আবার গ্লাস দিয়েছ, এখন-ই ভাঙবে।" দরিয়া-বিবি হুঁশিয়ারি ছাড়ে।

আমিরণ-চাচি আপত্তি জানাইল, "আমি ধরে আছি। ঘরে কি-বা আছে, বুবু। এই গ্লাসটা তোমার ভাই তখন বেঁচে—হরিশপুরের মেলা থেকে এনেছিল।"

"আমার ঘরে-ও সব ভেঙেছে। পুরাতন কাঁচের দু-চারটে জিনিষ আছে, তুলে রেখেছি। কেউ মানুষ-জন এলে বের করতে হয়।" দরিয়া-বিবি সায় দিল।

আমিরণ-চাচির সময় কম। বিকালে গরু-বাছুরের খবরদারীতে বহু সময় যায়। শাক-সব্জীর গাছ আছে আশে-পাশে; পানী না দিলে চলে না। চাচি তাই দ্রুত কথা বলিতেছিল। আজ মোনাদির কি আজহারের প্রসঙ্গ আমিরণ-চাচি মুখ দিয়া বাহির করিল না, পাছে দরিয়া-বিবি কষ্ট পান। বা হঠাৎ কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়।

কিন্তু কথা-প্রসঙ্গে এই সাপ-ই ছোবল তুলিল।

আমিরণ-চাচি বলিতেছিল, "বুবু, একা মানুষ হোলে আমি কি ভয় পেতাম। তেমন ডরানে-ওয়ালী মায়ে পয়দা করেনি। কিন্তু ঐ যে—এক গলার কাঁটা রয়েছে।"

দরিয়া-বিবি কথাটা ঠাহর করিতে পারিল না সহজে। "গলার কাঁটা"! বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সে চাচির মুখের দিকে তাকাইল।

আমিরণ-চাচি হাসিয়া উঠিল। "তুমি আমার গলার কাঁটা

দেখোনি?" বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল। দরিয়া-বিবি খামাখা হাসে, আর সত্যই চাচির কণ্ঠনালীর দিকে তাকায়।

আমিরণ-চাচি হাসে আর বলে, "তুমি ডাক্তার হেকিম হোলে আমার কাঁটা দেখতে পেতে।"

"আমাকে আগে বলোনি, বুবু।" দরিয়া-বিবির বিস্ময়ের অবধি নাই। আমিরন-চাচি আরো হাসিতে থাকে। আর বিশেষ বেলা নাই। তাই বলিল, "দাঁড়াও বুবু, গলার কাঁটা দেখাচ্ছি। ও আম্বিয়া, অ আম্বিয়া।" শেষের দিকে চাচি চীৎকার জুড়িল।

নিকটেই ছিল, আমজাদ ও আম্বিয়া আসিয়া উপস্থিত। "ঐ আমার গলার কাঁটা", চাচি আম্বিয়ার দিকে আঙুল বাড়াইল।

—কি মা?

আম্বিয়া খেলা ছাড়িয়া আসিয়াছে। এখানে দাঁড়াইতে রাজী নয়।

—যা খেল্ গে।

ছেলে-মেয়ে দু'টী আবার দৌড়াইয়া পালাইল। তখন দরিয়া-বিবি হাসিতে-হাসিতে বলে, "তুমি লোক-কে এমন বোকা বানাতে পারো।"

"গলার কাঁটা নয়? একা হোলে ঝাড়া হাত-পা যা-খুশী করতাম। যেমন ইচ্ছে থাক্‌তাম। বুবু, এখন কত কথা ভাব্‌তে হয়। মাঝে মাঝে রাত্রে শুয়ে-শুয়ে ভাব্‌নায় নিঁদ ধরে না।

চাচির মুখের উপর দিয়া ছায়া খেলিয়া গেল।

তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দরিয়া-বিবি বলে, "বুবু, আমার কতগুলো দ্যাখো। সব ত বেঁচে নেই। এই গুলোয় ত আমার পায়ের বেড়ি। ক'বছরে কি যেন হোয়ে গেলাম।"

"তবু ওদের ছাড়া ঘর মানায় না। হাসু-বৌটার দশা দ্যাখো। সোয়ামীর চোখের বালি, শাউড়ীর কাঁটা! একট ছেলে-পুলে নেই।"

"ও বেশ আছে। যার নেই, তার এক ধান্দা। যার আছে তার শতেক ধান্দা।"

"হক্ কথা, বুবু।"

"আমার মুনিটা এখানে থাক্‌লে, আমি কোন কিছুতেই ভয় পেতাম না।"

আমিরন-চাচি এই প্রসঙ্গ এড়াইতে চায়। কিন্তু দরিয়া-বিবি রেহাই দিল না।

"মুনি থাক্‌লে, আমি আম্বিয়া-কে ঘরে নিয়ে যেতাম। কি তোমার কাছেই থাক্‌ত—তোমার আর কেউ নেই—একটা ছেলে সংসারে বাড়ত।"

আমিরন চাচি যেন চাঁদের স্বপ্নের বিভোর, বলিল, "বুবু, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। আহ্‌, আমার কি সে কপাল হবে। তুমি রাজী হোলে-ও, খাঁ-ভাই? তোমরা উঁচু খাঁ-বংশ—।"

"তাল-পুকুর ঘটী ডোবে না।" বেশ ব্যঙ্গসুরে দরিয়া-বিবি বলিল, "আমার ছেলের বিয়ে দিলে কে কী বল্‌বে? সে ত আর মোনাদিরের বাপ্ নয়।"

আমিরন চাচি বড় খুশী হয়। কিন্তু মিথ্যা কল্পনা, তা উপলব্ধি সত্বেও। "কিন্তু ছেলেটা চলে গেল—।"

দরিয়া-বিবি বড় বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। আমিরন-চাচি তাড়াতাড়ি ছেলেদের ডাকিয়া নাড়ু খাওয়াইল। সেই হট্টগোলে সহজ আবহাওয়া ফিরিয়া আসে। সন্ধ্যা হইতে আর দেরী নাই। দরিয়া-বিবি কাজের মর্যাদা জানে। চাচি-কে সে ছুটী দিল।

পৃথিবী কত বড়। পাল্কী-জানালার ফাঁক দিয়া কতটুকু আর দেখা যায়। ঝোপে-ঝোপে এই সড়ক পথে হাঁটিবার সময় আমজাদের মত দরিয়া-বিবিও অদ্ভুত আস্বাদ পায়।

গা-ঢাকা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। জঙ্গলে জঙ্গলে তখন জোনাকিরা প্রদীপ কড়াকাড়ি শুরু করিয়াছিল।

৩২

চন্দ্র একরাশ তাড়ি গিলিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। ভিটার কাছাকাছি আসিতে দেখা গেল, তার ঘাড়ে একটী আধ-পোড়া চেলা কাঠ। শ্মশান হইতে চন্দ্র তুলিয়া লইয়াছিল, তা আর বুঝিতে দেরী হয় না।

দুপুর বেলা মাঠে কেউ থাকে না। এতক্ষণ আপন-মনে চন্দ্র গান করিতেছিল। কিন্তু বাড়ীর কাছে হঠাৎ গান বন্ধ হইয়া গেল। গায়ক পর-মুহূর্ত্তে যোদ্ধা সাজিয়াছে। কোটাল পোড়া চেলা কাঠখানি বাঁই-বাঁই শব্দে ঘোরাইতেছে আর মুখে 'হট্-যাও, হট্-যাও' রব।

চন্দ্রমুখী, তার ছেলেরা আর কোটালের স্ত্রী হঠাৎ হিন্দী চীৎকার শুনিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। প্রথমে বিস্ময়, তারপর সকলে তামাসা দেখিতে লাগিল। চন্দ্রমুখীর দুই ছেলে মামার কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া খুন। কোটালের স্ত্রী কিন্তু খুব চটিয়াছিল। তাড়ি ত চন্দ্র কোটালের কাছে জল। আপত্তি সেখানে নয়। এই অবেলায় মড়া-কাঠ কাঁধের উপর! এমন অলক্ষুণে কাণ্ড কোটাল-স্ত্রীর সহ্যের বাহিরে।

সে-ও চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি এসো ঘরে, তোমার 'হট-যাও' আমি বের করব।"

চন্দ্রমুখীর চোখ ভ্রাতৃজায়ার দিকে। "ছি ছি, দাদার যত বয়স বাড়ছে, তত ঢিটেমি বাড়ছে।"

"তুমি ঐ কাঠ নিয়ে ভিটের উপর একবার ওঠো দেখি, "কোটাল-গিন্নী শাসাইতে লাগিল।

চন্দ্র হঠাৎ চেলা-কাঠ ঘোরানো থামাইল, তারপর চীৎকার করিয়া শুধাইল, "কিয়া হুয়া।"

"কিয়া হুয়া? তোমার হুক্কাহুয়া বের করব, একবার ওঠো দেখি।"

কোটাল আবার যোদ্ধার হুঙ্কারে চেলা-কাঠ ঘোরাইতে লাগিল।

কিন্তু ভিটার নিকটে কয়েকটা চারা করঞ্জা গাছের কাছে আসিয়া থামিল। যোগীন তখন মামার উদ্দেশ্যে ডাক দিল, "মামা, উপুরে এসো না, মামী মারবে।"

"চুপ বেটা। আমি জমিদার হ্যায়, হাম্‌কো কোন রোকেগা।" কাঁধে গদা লইয়া ভীমের মত চন্দ্র সটান খাড়া হইল। বাব্‌রী চুল বাতাসে এলোমেলো। চক্ষু দুটা নেশার ছলকে গোল ভাঁটার মত। যোগীনের ছোট ভাই ত রীতিমত ভয় পাইয়া মার আঁচলে আশ্রয় লইল। ভিটার উপরে কোটাল-পত্নী কোমরে কাপড় জড়াইয়া হুঙ্কার ছাড়িল, "মড়া-কাঠ ফেলে ভাল-মানুষের মত আবার নদীতে স্নান করে এসো—না-হোলে—।" স্ত্রীর বদ্ধ মুষ্টি, চন্দ্র ভাল-রূপে ঠাহর করিল।

"হট্‌ যাও, হাম জমিদার হ্যায়," তারপর কোটাল সমস্ত মাঠের দিকে আঙুল অর্ধ বৃত্তাকারে বাড়াইয়া বলিল, "হাট যাও, সমস্ত জমি আমার হ্যায়। ইয়াকি পায়া হ্যায়—রোক্ দেগা।"

"একবার ভিটের উপর উঠে দ্যাখো।" কোটাল পত্নী-ভ্যাংচাইয়া বলিল।

কোটাল জবাব না দিয়া চেলা-কাঠখানির সাহায্যে ধাঁই-ধাঁই চারা গাছগুলি পিটাইতে লাগিল আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার: "এই সব আমার প্রজা আছে—বাত নেই শোন্‌তা?" কিছুক্ষণ এই তরু-প্রজা ঠ্যাঙানো চলিল। ভিটার উপরে সকলে তখন বেদম হাসিতে শুরু করিয়াছে। কোটালের বীরোচিত শৌর্যের উৎসাহ আরো বাড়িয়া যায়।

গিন্নী চীৎকার দিল: এই পাগল—পাগল।

"পাগল?" যোদ্ধা মুগুর উঁচাইয়া থামিল,। প্রথমে ব্যঙ্গর হাসি, পরে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে হুঙ্কার ছাড়িল, "পাগল! জমিদার শালা পাগল?"

"পাগল, পাগল।"

ছেলেরা চীৎকার দিয়া হাসিল, "পাগল, পাগল!"

"সব মার ডালেগা" বলিয়া মুগুর-বিশারদ আবার কল্পিত প্রজাদের শায়েস্তা করিতে লাগিল। নেশা বেজায় চড়িয়া ছিল।

প্রতিপক্ষ তখন হাসিয়া লুটাইবার উপক্রম। সুযোগ বুঝিয়া চন্দ্র ভিটার দিকে এক পা অগ্রসর হইল। তখন গিন্নী একটা চেলা-কাঠ লইয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্র চীৎকার দিয়া বলিল, "পাগল, পাগল না-হোলে মানুষ ঠ্যাঙায়। সব মার ডালো।"

আবার মুগুর-বাজি চলিল।

খিলখিল নারী-হাস্যে তখন অবেলার রং আরো ঘন হয়।

কতক্ষণ এমন চলিত কে জানে? এই সময় আমজাদ ভিটার পথে উপস্থিত হইল। দরিয়া-বিবির জরুরী আদেশেই সে এই দিকে আসিয়াছিল। সে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। কাকার নূতন কীর্তি। কিন্তু সে রণং-দেহি মূর্তি দেখিয়া বেশ ভয় পাইয়াছিল। মার আদেশ হাতে করিয়া-ই ফিরিয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছিল। হঠাৎ যোদ্ধার নজর সেদিকে গেল। প্রজারা নিস্তার পাইল। মুগুর উঁচাইয়া মহা-বীর আমজাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমজাদের ভয়ে মুখ শুকাইয়া যায়। সে সাহসের উপর ভর দিয়া বলিয়া ফেলিল, "কাকা, আপনাকে মা ডাক্‌ছে। খুব দরকার।" যোদ্ধার কানে যেন কথাটা গেল না। গজেন্দ্র-গমন ও স্কন্দ-শোভিত গদা অবিচল থাকে।

কিন্তু চন্দ্র ভয়ের ফরসুৎ দিল না। হঠাৎ গদা ফেলিয়া সে আমজাদ-কে কাঁধে তুলিয়া লইল। ছেলে-বেলা বেশ মজা লাগিত। এখন আমজাদ কিশোর, তার বড় লজ্জা করে। "কাকা, আমাকে নামিয়ে দাও।" সে মিনতি জানাইল। কিন্তু নেশা-খোর নিজের খেয়ালে বিভোর। কবি গানের সর্দ্দার তখন গান ও নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে।

চাচা এলো অবেলায়
এখন কোথায় কি পাই?
খেতে দেওয়া দায়।
হাঁস রয়েছে পুকুর পাড়ে
মুর্গী আর ডিম না পাড়ে
ঝোপে-ঝাড়ে বন-বাদাড়ে
শেয়াল ছানা-ও নাই॥

চন্দ্র হঠাৎ মাথা ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিল, "তওবা, মুস্‌লমানের ছেলে।" তারপর ওয়াক-শব্দে থুথু ফেলিল। গানের নূতন কলি শুরু হয়।

ভাইপো তুমি কর না ভাবনা
আমি ও-সব কিছু-ই খাব না
ঘরের আছে মুট্‌কী চাচি
তারে কর না জবাই ॥
আহা চাচা, আক্কেল বটে
বল্লিহারি, বলিহারি যাই ॥

চন্দ্র খাঁ-পাড়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভিটার উপর হাসির মওজ ছুটিল। পড়ন্ত বেলা। দিকে দিকে রং লাগিয়াছে। ঝাঁকুনি খাওয়া গান মাঠে মাঠে রেশ রাখিয়া যায়।

ঘরে আছে মুট্‌কী চাচি
তারে কর না জবাই ॥

সলজ্জ, তবু আমজাদ কাঁধের উপর হাসিতে লাগিল।

৩৩

বছর ঘুরিয়া গেল।

সূর্য-প্রদক্ষিণ শুধু স্থাবর-জঙ্গমের সহগামী নয়। সংসারের বিচিত্র প্রক্ষেপ-ও সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়। স্বচ্ছলতা-অনটন, হাসি-কান্না বিচিত্র ছন্দে তার দাগ রাখিয়া যায়।

এই আবর্ত্ত দরিয়া-বিবি-কে টানিয়া লইয়া গেল। ক্রমশঃ দিশাহারা পথে। এক ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। স্বামী আর নিরুদ্দিষ্ট প্রবাসী নয়। আজহার ফিরিয়া আসিয়াছিল মাত্র তিন সপ্তাহের মেয়াদ লইয়া। এক বছরে সে কত কি না করিয়াছে। রাজমিস্ত্রী-তার আদিম পেশা, ইটের পাঁজার সর্দ্দারী, মসজিদের ইমামের সহকারী আর মনোহারীর দোকান—তার আর এক মরীচিকা-মাখা সখ। নূতন মোড় ফেরার স্বপ্নে সে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বাড়ী ফেরার আগে সে একটী দোকান পাতিয়াছিল। তার নিরীহ শান্ত মনে-ও তখন অস্থিরতার ছোঁয়াচ। নিজের দিকে সে নিজে চাহিতে শিখিয়াছিল। নামাজে মন থাকে না। জায়নামাজের পাটীর উপর কখনও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে সেজ্দা দিতে গিয়া। কেন এমন হয়? কোটাল চন্দ্র ত বিধর্ম্মী। তার চেয়ে-ও দুঃখী। কিন্তু সে আনন্দের অধিকারী। জীবনের ঝাপ্টা তার পাখ্না-কে পঙ্গু করিতে পারে নাই। অথচ—সে! বুকের ভিতর বাঁচা ও সংসার-গোছানোর হাজার তৃষ্ণা লইয়া কলে-পড়া মূষিকের মত পরিত্রানের আশায় দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করিতেছে। সকলের রুজি-দেনে-ওয়ালা আল্লার উপর তার বিশ্বাস কতটুকু? আজহার ক্লান্ত অবসর-সময়ে নিজের কাছে এই সব প্রশ্নের জবাব খুঁজিত। শেষ দিনে হঠাৎ দাম লইয়া এক খরিদ্দারের সঙ্গে ঝগড়াই করিয়া বসিল। পরদিন দোকান-বিক্রয় হইয়া গেল। আবার গ্রামেই সে ফিরিয়া যাইবে। চন্দ্রের কাছে জিজ্ঞাসা করিবে, বাঁচার আনন্দ সে কোথা

হইতে পায়? রহিম-বখ্‌শ, হাতেম খাঁ-দের চন্দ্র ঘৃণা করে। এই ঘৃণার মধ্যেই কি আনন্দ আছে? ঘৃণা ত হিংসা। এমন পাঁকের মধ্যে পদ্মফুল ফোটে? আর যা-ই করি, চন্দ্রের সঙ্গে তার জীবনের প্রতিটী ক্ষণ সে মিলাইয়া দিবে। সে তাড়ি খাক্, নাচুক বা গান করুক, তা দেখার আবশ্যক নাই আজহারের। আজহার বুকে নূতন জোর পাইয়াছিল। মাঠের মাটীর সঙ্গে সে কোন প্রবঞ্চনা করিবে না আর! জীবনের বোঝা-পড়া হোক আবার। চন্দ্রের সঙ্গ আজহার-কে উতোল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু গ্রামে সে ত একা আসিল না। জেলা-জেলান্তর ঘোরার ফলে বাঁকুড়ার দুরন্ত ম্যালেরিয়া আগেই দেহে বাসা বাঁধিয়াছিল। মাঝে মাঝে ভুগিতে হইত। পথেই নূতন প্রতিক্রিয়া শুরু। শেষ অঙ্ক মহেশ-ডাঙায় অভিনীত হইল মাত্র।

নিরীহ ঈমানদার মানুষ—এই জন্য সমশ্রেণীর বন্ধুদের নিকট হইতে এই কয়েকদিন আজহার সহানুভূতি কম পায় নাই। চন্দ্র কোটাল প্রায় আসিয়া বসিয়া থাকিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বাক্যালাপ হইত নাম মাত্র। তবু তার উপস্থিতির কামাই ছিল না। রোগ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলে এক মন্দিরের ঠাকুরের কাছ হইতে চন্দ্র গাছের শিকড় আনিয়া আজহারের হাতে বাঁধিয়া দিল। অন্য সময় হইলে খাঁ-সাহেব কত আপত্তি করিত, হয়ত দুইজনের মধ্যে চটাচটি হইয়া যাইত। কিন্তু মৃত্যু-পথযাত্রী আজহার আর এক মানুষ। চন্দ্রের নিকট নিজেকে সঁপিয়া দিতেই ত সে গ্রামে আসিয়াছিল। এই বাড়ীতে আসিলে চন্দ্রের ছোঁয়াচে হাসি কা'কে না স্পর্শ করিত। কিন্তু চন্দ্র-ও আজকাল ভয়ানক গম্ভীর। একদিন দম-ভর তাড়ি খাইয়া আসিয়া-ও সে চুপ্‌চাপ বসিয়াছিল। কারো প্রশ্নের কোন জবাব দেয় নাই। তারপর আপন-মনেই বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিল। এই সংসারের ভবিষ্যৎ যেন এখন-ই তার সম্মুখে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত খাড়া। সহানুভূতি, এমন-কি ইয়াকুবের কাছে-ও, সীমাতীত-ভাবে পাওয়া গেল। সে পাঁচ মাইল দূর হইতে পাল্কী করিয়া পাশ-করা ডাক্তার আনিল। তখন শেষ অবস্থা। ডাক্তার কোন আশা দিতে পারিল না।

দরিয়া-বিবির একদা-তেজ যেন উবিয়া গিয়াছিল। অবশ্য গৃহস্থালির

কাজ ও সেবার কোন ত্রুটী ছিল না। সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে রোগীর বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু আজহার নির্ব্বিকার। নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তার কোন সচেতনতা ছিল না। দরিয়া-বিবির দিকে একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া-ও দেখিত না সে। পাষানের মত নিঃসাড় খোলা দুই চোখ আর দেখার কাজে লাগে না যেন—এখন তা চিন্তনের হাতিয়ার। দরিয়া-বিবি কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হাঁ-না-রবে তার ভার পরিসমাপ্তি হইত মাত্র। এই নীরবতা দরিয়া-বিবি-কে ভয়ানক চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামীর কাছে নঈমা বা আমজাদ-কে ঘন ঘন পাঠাইত। কথা হইত শুধু নঈমার সঙ্গে। সে-ই যেন শুধু তার সব কথা বুঝিতে পারে। দরিয়া-বিবি পিতা ও কন্যার কথোপকথন-কালে উপস্থিত হইত। আজহার তখন নীরব। দরিয়া-বিবি পাশে বসিয়া-বসিয়া উঠিয়া আসিত ও অলক্ষ্যে চোখের পানী খুছিত। কত দায়িত্ব পেছনে পড়িয়া থাকিল, এই চিন্তা কি একবার-ও তোমার মনে জাগে না? দরিয়া-বিবি ভাবিত, সে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু-ই বলিত না।

আজহারের গলায় কেমন ঘড়ঘড় শব্দ হইতেছিল। আজকাল সারারাত্রি পিদিম জ্বলে। দরিয়া-বিবি উঠিয়া তখন জিজ্ঞাসা করিল, "কষ্ট হচ্ছে?"

"না।" তারপর আজহার দরিয়া-বিবির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমুর মা—আমি—।" কথা থামিয়া গেল। দরিয়া-বিবি তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি আমাকে কিছু বলবে?" মাথা নাড়িয়া আজহার সম্মতি জানাইল ও পলক-হীন চোখে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হইল। অধীর দরিয়া-বিবি সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শুধাইল, "কিছু বলবে?"

আজহার কোন কথা বলিল না। শীর্ণ হাতখানি দরিয়া-বিবির হাতের দিকে বাড়ানোর পথে আবার মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া লইল। চোখ তেমন-ই পলক-হীন। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোন প্রতি-

দ্বন্দ্বী ছিল না এই নীরবতার মুখোমুখি। এখন-ই ঐ শীর্ণ ঠোঁট হইতে কথা- ঝরিবে। দরিয়া-বিবি আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। কিন্তু আর কোন কথা বলা হইল না। জীবন-যোদ্ধা পৃথিবীর কাছ হইতে ইত্যবসরে ছাড়পত্র পাইয়াছিল। শুধু চোখ দুটী তখন-ও সজীব। দরিয়া-বিবি তাহা বুঝিতে পারে নাই। মৃত স্বামীর চোখের দিকে দৃষ্টি পাতিয়া সে চাহিয়া রহিল, চাহিয়া রহিল।

৩৪

আমিরণ-চাচি যুক্তি দিয়াছিল, "আরো হাঁস-মুর্গী বক্‌রী-খাসী পোষো, বুবু। কোন রকমে দিন চল্‌বেই। তোমার ভাই মারা যেতে আমি-ও চোখে আন্ধার দেখেছিলাম। এখন বুক বাঁধতে হবে, ভাব্‌না করলে ত দিন যাবে না।"

দরিয়া-বিবি কথায় সায় দিয়াছিল। কিন্তু তার পক্ষে বাধা অনেক। সে পর্দানশীনা। কাছে মাঠ নাই। আমজাদ লেখা-পড়া আগেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। গরু-বাছুর মাঠে লইয়া যাইতে নিম-রাজী। ইলেমের এমন-ই প্রভাব। আজহার-কে সে খুব ভয় করিত, তাই মুখের উপর-কোন জবাব দেওয়ার সাহস পাইত না। এখন সে বে-পরোয়া। চাষাবাদ আর ভাল লাগে না। চন্দ্র-কাকার সঙ্গে প্রথম বছর চাষাবাদে গায়ে-গতরে খাটিয়াছিল। কিন্তু ধান বেশী হইল না। মাটীর জন্য দরদ ছিল না। নিড়েন ঠিক-মত দেওয়া হয় নাই। পর বৎসর চন্দ্র কোটাল তাই তিন বিঘা জমি বিক্রয় করিয়া দিতে বলিল। গৃহীতা ইয়াকুব। দেড় বিঘা জমি ছিল, আমজাদের জন্য তাহা-ও বিক্রয় হইয়া গেল। চন্দ্র-কাকার সংস্পর্শ তার ভাল লাগে না। এত মেহনত আমজাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দরিয়া-বিবি রাগ করিলে-ও পুত্রের উপর ক্ষোভ ছিল না। তের বছর বয়সের ছেলের পক্ষে চাষাবাদ যেন ঠাট্টার ব্যাপার।

আমিরণ-চাচির সংসার ছোট। কিন্তু দরিয়া-বিবির সংসারে এতগুলি পেট চালানো সহজ নয়। প্রথম দিকে সহানুভূতি কারো কম ছিল না। কিন্তু তারও সীমানা আছে। বেচারা চন্দ্র নিজেই অস্থির। সে চাষ করে, মাছ ধরে, গান করে। কিন্তু সব-সময় রোজগার হয় না। তবু তার আন্তরিকতা অকৃত্রিম। নিজে না আসিলেও বোন-কে পাঠাইয়া খোঁজ-খবর লয়। এলোকেশী খালি-হাতে আসে না। কোন দিন

মাছ, মাঠের ফসল, অন্ততঃ এক-ফালি কুম্‌ড়া হাতে সে লৌকিকতা রক্ষা করে।

চারিদিকে ভাঙন। নঈমার চোখে আজকাল খুব পিঁচুটি জমে। চোখে ভাল দেখে না—হয়ত অন্ধ হইয়া যাইবে।

ইয়াকুব মাঝে মাঝে চিরাচরিত আড়ম্বরে আসে। মাঝে মাঝে টাকা-ও সাহায্য করে। দরিয়া বিবি কর্জ্জ চাহিতে লজ্জা পায় না। কিন্তু এইভাবে দিন কত দূর গড়াইতে পারে। আগে ঘরে দুধ ছিল। এখন গাইটা অল্প দুধ দেয়, তা-ও বিক্রয় করিতে হয়। শরী-র মুখে দুধ ওঠে না। তিন বছরের মেয়ে ভাত ধরিয়াছে বড়দের মত। তার মাঝে মাঝে পেটের অসুখ করে, সহজে সারে না। শুধু শরীরের কাঠামোর জোরে টিকিয়া আছে।

দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ করিবার জন্য এমনি-ই দুর্দিনে মোনাদিরের পত্র আসিল।

সে লিখিয়াছে :

মা, আমার সালাম জানিবেন। বহু দিন বহু জায়গায় ঘুরিয়া আমি এখন এক স্কুলে পড়িতেছি। পাঁচটা টাকা যদি মাস-মাস আমার জন্য পাঠান, কোন রকমে আমার দিন চলিতে পারে। আপনাদের অসুবিধা হইলে পাঠাইবেন না। আমার দিন এক রকমে চলিয়া যাইবে। আমু নঈমাদের জন্য আমার স্নেহ।

আপনার স্নেহের
মুনি।

একটী ইন্‌ভেলাপে পত্র আসিয়াছিল। আমজাদ পড়িয়া শোনাইল। দরিয়া-বিবি যুগপৎ আনন্দ ও নিরাশায় খামখনি হাতের মুঠোয় ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। তিন-চার বৎসর অতিবাহিত। কত বড় হইয়াছে মুনি! একটি দীর্ঘশ্বাসে দরিয়া-বিবি এই চিন্তা সমাহিত করিল। পাঁচটি টাকা সাত রাজার ধন নয়। তবু সে-কথাই আগে ভাবিতে হয়।

আমজাদ পাশে বসিয়া ছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "মা, মুনি-ভাই-কে টাকা পাঠাবে না?"

"পাঠাব। পাঠাতে পারবি?"

"তা আর পারব না। তুমি টাকা দিও, আমি মনি-অর্ডার করে আসব। পোষ্টাপিস আছে পাশের গাঁয়ে।"

দরিয়া-বিবির ঠোঁটে কৃত্রিম হাসি দেখা দিল। আমজাদ এখন-ও কত অবোধ।

কিছুক্ষণ আগে আমজাদ সংবাদ আনিয়াছিল, এবার জমির ধান ইয়াকুব নৌকায় বোঝাই দিয়া লইয়া গিয়াছে। এত দিন জমি বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু ধান বর্গা পরিশোধের পর অর্ধেক পাওয়া যাইত। ইয়াকুবের করুণা! এবার তা-ও বন্ধ। জমি কিনিয়াছে, ফসল লইয়া যাইবে—বৈচিত্র কিছু নাই। তবু দরিয়া-বিবি ক্ষোভে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুত্রের কাছে সংবাদ পাইয়া আর কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন সে মনে করে নাই! মুনির পত্র-হাতে ইয়াকুবের কথাই প্রথমে স্মরণ হইল ও হঠাৎ অস্পৃষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "পাঁচটা টাকা", আমজাদ তাহা শুনিতে পাইল না।

দু-দিন পর ইয়াকুব এখানে পৌঁছিলে, দরিয়া-বিবি তার শরণাপন্ন হইল।

"ভাই, আমার একটা আরজ আজ তোমাকে রাখ্‌তে হবে।"

"আপনার আরজ। বলুন - বলুন।" ইয়াকুব ভয়ানক আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, "আপনি এত চুপচাপ থাকেন কেন?"

"ভাই, চুপচাপ কি সাধে থাকি। দেখ্‌ছ না কত সুখে আছি।"

"আপনার দুঃখ কি? আপনার মুখের হাসির দাম লাখ টাকা!"

অন্য সময় এমন গায়ে-পড়া প্রশংসা দরিয়া-বিবি বেয়াদবীর সামিল মনে করিত। আজ তা গায়ে মাখিয়া লইল। ইয়াকুব কিন্তু কথাটা বলিয়া-ই দরিয়া-বিবির দিকে আড়-চোখে তাকাইল।

"লাখ টাকা নয় পাঁচ টাকার আরজ।"

"মোটে।" ইয়াকুব ঠোঁট কুঁচকাইল।

"হ্যাঁ।"

"মোটে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু মাস-মাস দিতে হবে।"

"কাউ-কে দেবেন ?"

"হ্যাঁ।"

কা-কে ?

"তা কোনদিন জান্‌তে চেয়ো না।"

"আপনার যা' হুকুম।" ইয়াকুব হাসিয়া ঘাড় নোয়াইল ও কহিল, "আপনি বলেন আর কি দরকার। আপনি একদম পাথরের মত কিনা—মুখে কিছু বলেন না। আজ ধান নিয়ে গেলাম। কই কিছু ত বললেন না ?"

"তোমার জমির ধান তুমি নিয়ে গেছ। কি আবার বলতে হবে ? দরিয়া-বিবির কণ্ঠে মোলায়েম ব্যঙ্গের সুর।

"কেন বলবেন না। আপনারা আমার আপন জন। জমি কিনেছি বলে ধান-ও নিয়ে যাব ?"

"নিশ্চয় নিয়ে যাবে ?"

"আপন-জনেরা এমন নিষ্ঠুর হয় না।"

"নিষ্ঠুর আবার কি ?"

"নিশ্চয়। জিজ্ঞেস করতে ত পারতেন, কেন ধান নিয়ে গেলাম। থাক সে-কথা। এখন আমাকেই বলতে হয়। ঘরে আমার দু-টী গোস্তের ঢিবি আছে -।" ইয়াকুব একগাল হাসি মুখ হইতে খালাস করিয়া বলিল, 'তাদের চোখ টাটায়। জমি কিনেছি অথচ ঘরে ধান যায় না। এবার তাই নিয়ে গেলাম। এই নিন ধানের টাকা।"

ইয়াকুব পকেট হইতে পঁচিশ টাকা বাহির করিল।

"এখন বাজার-দর আড়াই টাকা। দশ মন ধান হয়েছিল।"

দরিয়া-বিবি ইয়াকুবের দিকে তাকাইল। কৃতজ্ঞতার এমন দৃষ্টি কেহ কোনদিন দরিয়া-বিবির চোখে দেখে নাই।

ইয়াকুব মানিব্যাগ হইতে আবার পাঁচ টাকার একটী নোট বাহির করিল।

"এই নিন। আমি মাসে মাসে এই টাকাটা-ও দেব।"

দরিয়া-বিবি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

"ভাবী, আমাকে আপন-জন মনে করবেন।"

দরিয়া-বিবি তার কোন জবাব দিল না। ইয়াকুবের দিকে সোজা-সুজি তাকাইল মাত্র। সে ভয়ে চোখ নামাইয়া লইল।

ইয়াকুবের হাল-চাল রাত্রে শুইয়া-শুইয়া দরিয়া-বিবি তোলপাড় করিতে লাগিল। বালিশের নীচে নোটখানি এখনও চাপা। অন্ধকারে হাতড়াইয়া দরিয়া-বিবি নোটখানি নিজের চোখের উপর চাপিয়া ধরিল। ভয়ানক কান্না পাইয়াছিল তার।

চোখের পানী শুষিয়া লইতে এমন কাগজের-ই যেন দরিয়া-বিবির প্রয়োজন বেশী।

৩৫

পোষ্টাপিস হইতে আমজাদ একটী খাম কিনিয়া আনিয়াছিল।

দরিয়া-বিবি বলিল, "একটা চিঠি লিখে দে, আমু। তোর মুনি-ভাই যেন তাড়াতাড়ি আসে।" আমজাদ পত্র লিখিতে বসিল। এম সময় হাস্নু-বৌ হাজির হইল।

দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসা করে, "হাস্নু-বৌ, আর যে এদিকে এলে না? দশ বারো দিন হোলো।"

সন্তর্পিত হাস্নু-বৌ চারিদিকে চাহিয়া লইল যেন তার আওয়াজ বেশী দূর না পৌঁছায়; অথবা কেউ আছে কি না। পরে ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে বলিল, "শাউড়ীর মেজাজ জানো না, বুবু? এদিকে এলেই চটে। আর ছেলে হয়নি। তার খোঁটা ধরে শুরু করবে হাজার কালাম। কখন আসি, বুবু।"

"সাকের-ভাই কোথায়?"

"তার ভাবনাতে-ও অস্থির ছিলাম। আবার কোন জমিদারের জমি-দখলে গিয়েছিল!"

"মানা করতে পারো না?"

"মানা শোনে কৈ। এবার পায়ে চোট লেগেছে। চুন-হলুদ করে দিলাম কাল। আজ ভাল আছে। সাত আট দিন গিয়েছিল। এই জন্যে-ও ভেবে-ভেবে অস্থির। ছাই, মন ভাল না থাক্‌লে কি কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করে?" হাস্নু-বৌ দরিয়া-বিবির দিকে জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাকাইল।

সহানুভূতি জানাইল দরিয়া-বিবি, "তা ঠিক। মন ভাল না থাকলে খাট-পালঙে শুয়ে-ও সুখ নেই।" অতঃপর আমজাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমু, আর অন্য কোন কথা লিখিস্‌নে। শুধু আমার কথা লেখ্‌। আর আমরা ভাল আছি।"

আমজাদ পেন্সিল চালাইতে চালাইতে জবাব দিল, "আচ্ছা মা।"

হাসু-বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "কা-কে চিঠি দিচ্ছ, বুবু?"

"আমার মুনি-কে।"

"মুনির খবর পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ।

"সোবহান আল্লা। আমু-চাচা, আমার দোয়া লিখে দিও।" হাসু-বৌ বড় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পরে বলিল, "কি সুন্দর ছেলে। অমন-না হোলে মায়ের কোল জুড়ায়।"

"আমার বুক ত জ্বলতেই রইল, হাসু-বৌ।" দরিয়া-বিবি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল।

"বুবু, তোমার ধন তোমার বুকেই ফিরে আসবে। দেখো—আমার কথা নিশ্চয় সত্যি হবে। আমার মন বলছে।"

"সোনা-কপালী তোমার মুখে কাটা যাই, তা যদি হয়, আমি এই অকূলে-ও কূল পাই।"

"ঠিক তোমার হক্কের ধন ফিরে আসবে।"

"পনর বছর বয়স। এখন কত বড় হয়েছে। আজ ক'বছর চোখের দেখা দেখতে পাইনি;"

দরিয়া-বিবির কাতর দৃষ্টি হাসু বৌকে স্পর্শ করিল। দুই জনে একে অপরের দিকে তাকায়।

আমজাদের লেখা শেষ। সে চাচির খেদোক্তি শুনিতেছিল। সকল-কে চুপচাপ দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আর একটা কথা লিখব?"

"সব লেখা হোয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"তবে আবার কি লিখব?"

"লিখে দেব—আব্বা ইন্তেকাল করেছে।"

ধমক দিয়া উঠিল দরিয়া-বিবি, "না ও-সব লিখতে হবে না।"

"আচ্ছা," শান্ত আমজাদ যেন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, এমন উচ্চারণের ভঙ্গী।

হাসু-বৌ উঠিয়া বলিল, "এখন যাই বুবু। আমু-চাচা, আমাকে একটু এগিয়ে দাও।"

আমজাদ খুব রাজী। সে হাসু-বৌর অনুসরণ করিল।

ভিটার নিচে সড়কের উপর দুই জনে দাঁড়াইল। গোধূলির ছায়ায় চারিদিক বিষণ্ণ। হাসু-বৌর গা এমন ঝোপে-ঝাড়ে সত্যি ছমছম করে। মহেশ-ডাঙা জঙ্গল বলিলেই চলে। নীচে পথের সাদা-সাদা রেখা আবছা। দু-পাশে ঝিঁঝিঁ-ডাকা অনেকক্ষণ শুরু হইয়াছে। আমজাদের পিছনে হাসু-বৌ।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বৌ আমজাদের হাত ধরিয়া বলিল, "চাচা, আমার দোয়া লিখে দিয়েছো ?"

"দিয়েছি, হাসু-চাচি।"

"সত্য ? কিরা দিচ্ছি—আমার গা-ছুঁয়ে বল।"

আমজাদ হাসু-বৌর কাঁধ ছুঁইয়া বলিল, "দিয়েছি, দিয়েছি, দিয়েছি—তিন সত্যি।"

হাসু-বৌ খুব খুশী হইয়া বলিল, "কাল এসো চাচা, তোমার জন্য ক্ষীর বানিয়ে রাখব।"

"আচ্ছা আসব।"

"আর মুনির চিঠি এলে খবর দিও, দেরী করো না, চাচা।" হাসু-বৌর অনুরোধ-ভঙ্গী বড় অদ্ভুত দেখায়।

"এবার তুমি যাও। এখন আমি বাড়ী যেতে পারব। পথে সাপ-টাপ দেখে যাস্, বাপ।"

আমজাদের নিজের-ই ভয় লাগিতেছে এবার। জবাব দেওয়ার জন্য সে আর বিলম্ব করিল না। তার সব-চেয়ে বেশী ভয় সাপের।

৩৬

তিন চার মাস পরে মোনাদিরের আর একটী পত্র আসিল। সে ঠিকানা বদল করিয়াছে। এক বাড়ীতে জায়গীর ছিল। কোন কারণে তাহারা আর ছাত্র রাখিতে পারে না। তাই অন্যত্র গিয়াছে মোনাদির। সেখানে মাসিক পনর টাকার কম খরচ পড়ে না। এখন সে কি করিবে, তাহাই ভাব্‌নার ব্যাপার।

দরিয়া-বিবি মনে আন্দোলন করিতে লাগিল। পনর টাকায় তাহাদের সমস্ত মাস নির্বিঘ্নে চলিতে পারে। ধান যে-কয় মণ পাওয়া যায়, তা' দিয়া চার মাসের মাত্র খোরাক হয়। বাকী দিন আল্লাই চালান। কখন আমজাদ চন্দ্রের সঙ্গে মুনিশ খাটিতে যায়। এত ছোট ছেলে লোক লইতে চায় না। শুধু চন্দ্রের খাতিরে তিন-আনা-চার-আনা দেয় মাত্র। গরু-বাছুর, মুর্গী-হাঁস ও ডিম-বিক্রী ইত্যাদির উপর দিয়া কোন রকমে দিন-গুজরান। ইহার উপর মুনির এই অনুরোধ। দরিয়া-বিবি ভাবিতে লাগিল। উপায় একটা স্থির করিতে হইবে। আবার ইয়াকুবের ধর্ণা! না, তা সম্ভব নয়। তবু এক-ই কেন্দ্রে সমস্ত চিন্তা স্রোতায়িত হইতে লাগিল। শেষে দরিয়া-বিবি স্থির করিল, ইয়াকুব-কেই বলিয়া দেখিতে হইবে।

ইয়াকুব প্রস্তাব শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "ভাবী, আপনার যা দরকার, আমাকে বলেন না কেন ?"

"ভাই, তুমি আমাদের জন্য অনেক করেছ। আমার বলতে-ও লজ্জা লাগে।"

"কোন লজ্জা করবেন না। আপানার মুখে হাসি আমি দেখ্‌তে চাই।"

"হাসি কি সহজে আসে ?"

"মন নরম থাকলে আসে বৈকি।" ইয়াকুব দরিয়া-বিবির দিকে

চাহিয়া আবার মৃদু হাসিল। বৈধব্যের পর দরিয়া-বিবির শরীরের তেমন পরিবর্তন ঘটে নাই। চেহ্‌রায় আর একটু রুক্ষতার ছাপ লাগিয়াছে মাত্র। তার ফলে আরো আপ্ত-রমণীর মত দেখায় দরিয়া-বিবি-কে। হঠাৎ কারো চোখে পড়িলে মনে হইবে, যেন কত দেমাকী। কিন্তু দরিয়া বিবি নিজের দিকে চাহিয়া আর কিছু দিশা করিতে পারে না। সে যেন আশেক্‌জানের মত হইয়া যাইতেছে। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যায় তখন দরিয়া-বিবি।

"না-ভাই। বাইরে থেকে আমি দেখতে অমন।" খুব মোলায়েম সুরে দরিয়া-বিবি জবাব দিল।

"আপনি কষ্ট পান খামাখা। আমাকে বললেই হয়। পনর টাকা আমি মাস-মাস দেব। আমি যাওয়ার সময় তিনি মাসের আগাম চেয়ে নেবেন।"

"আল্লা তোমার ভাল করুন, ভাই। ধনে দৌলতে তিনি তোমাকে আরো বাড়ান।"

প্রায় গদ্‌গদ্ ভাবে দরিয়া-বিবি উচ্চারণ করিল।

"আপনার দোয়া।" তারপর ইয়াকুব আবার নির্লজ্জের মত তাকাইয় বলিল, "আপনার হাসির দাম লাখ টাকা।"

"খামাখা লজ্জা দাও ভাই। আমরা গরীব-দুঃখী। আমাদের আবার হাসি—তার আবার দাম?" ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া দরিয়া-বিবি বাক্য সমাপ্ত করিল।

ইয়াকুব হাসি ছাড়িয়া বোধ হয় আর কিছু-র মূল্য-যাচায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। দরিয়া-বিবি তার সুযোগ দিল না। "ওদিকে হাঁড়ি চড়িয়ে এসেছি, এঁচে গেল। গন্ধ উঠেছে", বলিয়া দরিয়া বিবি রান্নাঘরের দিকে ছুটিল।

ইয়াকুব দরিয়া-বিবির ছন্দ-ময় দেহাবয়বের দিকে পশ্চাৎ হইতে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল ও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

উপবাস এই সংসারে দরিয়া-বিবির জন্য অচেনা কিছু নয়। মাঝে মাঝে কোনদিন ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়েরা হাঁড়িতে ভাত থাকা পর্যন্ত

আর ক্ষ্যান্ত হয় না। দরিয়া-বিবি তখন পরিবেশন করিয়া-ই খুশী। এই চালাকি মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। তখন আমজাদ লজ্জিত হয়। নঈমা শরীফা কি বা বোঝে। আমিরণ-চাচির কাছে ধরা পড়িলে দরিয়া-বিবি খুব বকুনি খায়। একদিন ত চাচি অভিমান করিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, "আমরা ত আত্মীয়-স্বজন নই, আমাদের কাছে কেন কিছু বলবেন, বুবু। দু-মুঠো চাল কি তরকারী আমজাদ-কে দিয়ে আনালে কি আমি অসুবিধায় পড়তাম।" কিন্তু দরিয়া-বিবি আরো অভিমানী। কোন কিছু যাজ্ঞার বেলা সে যেন মর্মে মর্মে মরিয়া থাকে। নিজের অতীতের দিক চাহিয়া সে নিজেকেই আর বিশ্বাস করে না। আত্ম-বিশ্বাস ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্বে অন্ন-হীন দিন বিষণ্ণ বোঝা মনে হইত না।

সেদিন রাত্রে আমজাদ ও নঈমার জন্য দরিয়া-বিবির ঠোঁটে আর ভাত ওঠে নাই। সকালে শরীর বড় ঝিমঝিম করিতেছিল। ইয়াকুব আসিল সেই সময়। রাজগীর কম্‌তি নাই তার। ভাল চাল, মাছ শাক-শব্জী ঘী—কিছু বাদ পড়ে নাই তার আড়ম্বর-লীলায়।

দরিয়া-বিবি অগত্যা রান্নায় বসিল। তারপর সকলের শেষ খাওয়া। দরিয়া-বিবি অভুক্ত শরীরে সেদিন আহার করিল। রীতিমত আহার। পূর্বে অপরের দেওয়া অন্ন সম্মুখে, সে আসেক্‌জানের চাল্লিশার খাওয়ার কথা স্মরণ করিত। আজ অতৃপ্তির কোন বালাই ছিল না। ক্ষুধার্ত জঠর বাকীটুকু পরিবেশন করিল।

দুপুরের পর আমজাদ চন্দ্রকাকার কাছে কাজের তল্লাসে গেল। নঈমা শরী-কে কোলে করিয়া হাসুবৌর বাড়ী পৌঁছিল। আগের দিন বৌ তাহাদের দাওয়াৎ করিয়া গিয়াছিল। নূতন ছাঁচি-লাউ কাটা হইয়াছে, ক্ষীর রান্না হইবে আজ।

হাতে বহু কাজ। হাঁড়ি পাতিল মাজা হয় নাই, গৃহপালিত আগল-পাগলদের খবরদারী বাকী আছে। তবু ভরা খাটে খোয়ারী ধরিয়াছিল। একটু গড়াইয়া উঠিয়া পড়িবে, এই আশায় শোয়া-মাত্র কিন্তু দরিয়া-বিবি বেশ ঘুম পাইল। অভুক্ত শরীর মাঝে মাঝে যদি ছুটি চায়, তা বিচিত্র কিছু নয়।

বাইরে বৈশাখের উত্তপ্ত দিন। এখানে ঝোপ-জঙ্গল ভেদ করিয়া গরম ঝামাল আসে না। তাই ঘরের ভেতর ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনে হয়। আজ জানালার পাশে কাঁঠাল গাছে ঘুঘু ডাকিতেছিল একটানা স্বরে। বেশ কোন উদ্বেগ দরিয়া-বিবির ক্লান্ত-ভার শরীরে হানা দিতে পারে না। বেশ ঘুম ধরিয়া গেল।

কিন্তু ঘুম তাহার আবার আচমকা-ই ভাঙিল। দরিয়া-বিবি হঠাৎ অনুভব করে, কার যেন গভীর আলিঙ্গনে সে একদম নিষ্পিষ্ট।

··দরিয়া-বিবির মনে হয় হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে তার সমস্ত শরীর।··

সমস্ত পৃথিবী তার নিকট নিরবছিন্ন অন্ধকারে আবৃত।

বাহিরে পুত্রহারা ঘুঘু-জননী একমনে শুধু ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইতে হইতে লাগিল।

৩৭

সন্ধ্যায় আহারের সময় আমজাদ বলিল, ‘মা, ইয়াকুব-চাচা হঠাৎ চলে গেল। কাল ত যাবার কথা।”

দরিয়া-বিবি প্রথমে জবাব দিল না। পরে হঠাৎ আগুন হইয়া বলিল, “খাচ্ছিস খা”। তোর আবার এত কথা কেন?” আমজাদ মার দিকে একবার চাহিয়া আবার আহারে মনোনিবেশ করিল।

সকালে সে আবার বকুনি খাইল। বাড়ীর পাঁদাড়ে সকালে উঠিয়া আমজাদ দেখে, রান্না তরকারী নয় শুধু—কাঁচা শাক-শব্জী পর্যন্ত পড়িয়া রহিয়াছে। কাল ইয়াকুব চাচা এই সব আনিয়াছিল সে জানে। তাই তাড়াতাড়ি মার কাছে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল।

“মা, আস্তাকুড়ে কত তরকারী কে ফেলে দিয়েছে। তুমি দেখ্‌বে এসো।”

দরিয়া-বিবি হাঁস-মুর্গীদের এক-মনে খুদ-কুড়া খাওয়াইতেছিল, সে যেন পুত্রের কথা শুনিয়া-ও শুনিল না।

পুত্র আবার এত্তেলা দিল।

দরিয়া-বিবি তখন ধমক দিয়া বলিল, “হাতে কাজ আছে দেখ্‌ছিস্ নে। চোখ কি ফুটো হোয়ে গেছে তোর?”

আমজাদ মার থম্‌থমে চেহ্‌রার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিল: এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা সমীচীন নয়।

তিন চার দিন আমজাদ অত্যন্ত নিরীহ ছেলের মত ঘরে রহিল। মার এমন মূর্তি সে আর পূর্বে দেখে নাই। এমন-ভাবে কত দিন কাটিতে কে জানে, আবার ইয়াকুব চাচার আগমনে সব শান্ত হইল। এবার সে একা আসে নাই। সঙ্গে পুত্র ও রসদ-সম্ভার আনিয়াছিল। তার ছেলের বয়স নয় কি দশ। আমজাদের প্রায় সম-বয়সী। হঠাৎ পুত্র সঙ্গে কেন? দরিয়া-বিবি অচেনা ছেলের সম্মুখে স্বাভাবিক-ভাবে অগ্রসর হইল,

ইয়াকুব-কে জিজ্ঞাসাবাদ করিল। দেবরের চাল বোঝার সাধ্যি দরিয়া-বিবির নাই।

মোনাদির আবার পত্র লিখিয়াছিল। তাই পুত্র-সহ বাড়ী-ফেরার আগে দরিয়া-বিবি ইয়াকুবের নিকট হইতে পনরটী টাকা চাহিয়া লইল।

আমজাদ বুঝিতে পারে, মার মেজাজ ঠিক হয় নাই। আজকাল সে বকুনি খায়, নঈমা —এমন-কী শরী পর্যন্ত কান্নাকাটি করিলে প্রহার ভোগ করে। মা এমন ছিলেন না। একদিন সে আমিরণ চাচির কাছে বেড়াইতে গিয়া অভিযোগ করিয়া আসিল।

কাজের চাপে ক'দিন আমিরণ-চাচি এই বাড়ী আসিতে পারে নাই।

একদিন আসিয়া জেরা শুরু করিল, "বুবু, তুমি নাকি ছেলেদের বড় মারধোর কর।"

"জ্বলা-'জানে' যদি মার-ধোর করি, কী অন্যায়টা করি? এ-গুলো মরলে আমার হাড় জুড়োয়।"

আমিরণ-চাচি বাধা দিল, "ছি ছি বুবু, এমন অপয়া কথা মুখে আনে। আমার একটা। সে-ও কম জ্বালায় না।"

"একটা আর দু-টো। এরা জ্বালাতেই আসে। একজন ত মুখই আর দেখায় না। তার জন্য জ্বলছি। আর সঙ্গে যে-কটা আছে, তারা-ও কম জ্বালাচ্ছে না। আল্লা এগুলো তুলে নিতে পারে না?"

দরিয়া-বিবি খুব অপ্রকৃতিস্থ। আমিরণ-চাচি কাজের বাহানায় সেদিন আর বেশীক্ষণ বাক্যালাপ করিল না। চলিয়া গেল।

দুপুরে কুঁড়া পায় নাই, উঠানে তাই কত-গুলি মুর্গী কট্‌কট শব্দে কান ঝালাপালা করিতেছিল। দরিয়া-বিবি ক্রোধে হাতের নাগালে-পাওয়া একটী মুর্গী ধরিয়া এক আছাড় দিল। আহত প্রাণী ঝট্‌পট করিতে লাগিল।

নঈমা চোখে ভাল দেখে না, দাওয়ায় বসিয়াছিল। সে সেখান হইতে বলিল, "মা, মুর্গী জবাই করছ।" দরিয়া-বিবি চীৎকার করিয়া উঠিল "দাঁড়া হারামজাদী, তো-কে জবাই করব।"

আমজাদ এই সময় খেলা সারিয়া ঘরে ফিরিতেছিল। সে মার হুঙ্কার শুনিয়া ধীরে ধীরে দহলিজের দিকে চলিয়া গেল। হাওয়া ফিরিলে, সে-ও ফিরিয়া আসিবে।

৩৮

শ্বাপদেরা ওৎ-পাতায় সুদক্ষ। ইয়াকুবের কৌশলের অন্ত ছিল না। রক্তের আস্বাদ-পাওয়া শিকারী প্রাণীর মত সে এই বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিল। অসতর্ক ও অসহায় মুহূর্তের সুযোগের সে কোন অসদ্ব্যবহার করিতে না। সংগতির ভেলা ভাসাইয়া কিরূপে নদী পারাপার করিতে হয়, তা-ও সে জানিত বৈকি।

* * *

বাড়ীর আবহাওয়া আমজাদের কাছে অসহ্য লাগে। মা সব-সময় কি যেন চিন্তার বুঁদ। পান হইতে চূণ খসিলে শাসানি-বকুনি। আর কোন দিন সে এমন অস্বোয়াস্তির সম্মুখীন হয় নাই।

আমজাদ-ই একদিন আসিয়া খবর দিল, "মা, মুনি-ভাই পত্র দিয়েছে। লিখেছে কাল আস্‌বে।"

"কাল ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ।" আমজাদ মার মুখের দিকে চাহিল। কোন ফুল্লতার আভাস নাই। যেন দৈনন্দিন ঘটনার মত কোন সংবাদ আনিয়াছে সে।

"মা!" আমজাদ ডাক দিল।

"কি ?"

"আমি লিখেছিলাম, আব্বা মারা গেছেন। সংসারে বড় টানাটানি। তুমি একবার এসো, মুনি-ভাই।"

"তো-কে এ-সব কে লিখ্‌তে বলেছিল ?" দরিয়া-বিবি পুত্রের দিকে রুক্ষ চোখে তাকাইল। আমজাদ সোজাসুজি তাকাইতে পারে না, কিন্তু নরম গলায় জবাব দিল, "মা, আব্বা মেরেছিল, তাই ত মুনি-ভাই আস্‌তে চায় না। আমি তোমাকে না জানিয়ে এই জন্য খবর দিয়েছিলাম।"

“বেশ।” তারপর দরিয়া-বিবি অন্য কাজে চলিয়া গেল।

পরদিন আমজাদ নিজেই গ্রামের মেঠো পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। রেল ষ্টেশন অনেক দূরে। মুনি-ভাই ক্লান্ত হাঁটিয়া আসিবে, এতটুকু অভ্যর্থনা না করিলে সে স্বোয়াস্তি পাইবে না।

সত্যই মোনাদির আসিয়াছিল। দুই ভা'য়ে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিলে নঈমা চীৎকার শুরু করিল, “দাদা এসেছে মা, দাদা এসেছে।”

দরিয়া-বিবি তখন রান্না-শালায়। পাঁচ মিনিট তার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মোনাদির অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

“মা কোথায়, নমু?” নঈমা-কে আদর করিতে করিতে মোনাদির জিজ্ঞাসা করিল্।

“রান্না ঘরে।”

“আমু, চল্ আমি যাচ্ছি।” সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। চুলা জ্বলিতেছে। অগ্নিশিখার হিসহিস শব্দ হইতেছে মাত্র। দরিয়া-বিবি চুলায় জ্বাল দিতে-দিতে একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে ঠেস্ রাখিয়া ঘুমাইতেছে।

বিস্মিত দুই ভ্রাতা। আমজাদ ডাকিল, “মা, মা, দ্যাখো কে আসছে।”

দরিয়া-বিবি হঠাৎ চোখ খুলিয়া বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিল। কোন আকুল ব্যগ্রতায় উঠিয়া হস্ত প্রসারিত করিল না।

মোনাদিরের শরীরের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! পনর বছর বয়স! বেশ লম্বা চওড়া। গোঁপের রেখায় তার গৌরবর্ণ ওষ্ঠের শোভা ঢাকা পড়িয়াছে। দরিয়া-বিবি যেন তা-ই দেখিতেছিল।

আমজাদ বলিল, “চিন্‌তে পারছ না মা, মুনি-ভাই। দ্যাখো কত বড় হোয়েছে।

দরিয়া-বিবির চোখের পাতা বন্ধ হয় না। পক্ষঘাত-গ্রস্থ রোগী বসিয়া আছে।

মোনাদির ডাকিল, মা।

অপর-পক্ষ কোন সাড়া দিল না। শুধু চোখের পলক ফেলিয়া দরিয়া-বিবি আবার তাকাইয়া রহিল।

বিস্মিত আমজাদ। নঈমা পেছন-পেছন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এতক্ষন মনে ছিল না। মোনাদির কদম-বুসি করিতে বসিয়া পড়িয়া মার পার দিকে হাত বাড়াইল। তখনই দরিয়া-বিবি হাউম্মাউ শব্দে পুত্র-কে জড়াইয়া ধরিয়া ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মোনাদির মার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ও উদ্বেলিত বক্ষের স্পন্দন সারা শরীরে অনুভব করে। সে-ও নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

৩৯

"বুবু, ছ্যাখো ছ্যাখো, মুনি-চাচা বড় হোয়ে কেমন দেখাচ্ছে।" আমিরণ-চাচি দরিয়া-বিবি-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল।

"তিন চার বছর—কিছুটা বেড়েছে।"

"কিছু-টা নয়। মুখ-খানা ছ্যাখো। বড় হোলে তুমি দেখো, বুবু, আট-পিঠ তোমার মত হবে।"

"তোমার পায়ের নখের যুগ্যি হোয়ে বেঁচে থাক্।"

"আমার যত চুল, চাচার তত বছর পরমায় (পরমায়ু) হোক—আমি দোয়া করছি।"

আমিরণ-চাচির দাওয়ায় রীতি-মত ভিড়। দুপুরের পরেই দরিয়া-বিবি ছেলেদের লইয়া আসিয়াছে। হাসু-বৌ পর্যন্ত এখানে আসার জিদ ধরিয়াছিল। ভিটার গণ্ডীর মধ্যে বছরের পর বছর আর কাঁহাতক ভাল লাগে। সে-ও আজ শ্বাশুড়ীর তোয়াক্কা না করিয়া আসিয়াছে।

মোনাদির রীতি-মত ঘামিতে থাকে। সে বেশ চট্‌পটে ছেলে। কিন্তু এমন আগন্তুক পরিবেশে সে বড় ম্লান হইয়া যায়। আম্বিয়া হাঁ-করিয়া মোনাদিরের দিকে তাকায়। পাঁচ বছর আগে সে গোধূলি-লাগা সড়কে মোনাদির-কে কেমন বোকা বানাইয়াছিল, আজ মনে পড়িয়া যায়। আম্বিয়ার সারা শরীর লজ্জায় ছাওয়া।

আমিরণ-চাচি মেয়েকে ধমক দিয়া বলিল, "দেখ্‌ছিস কি হতভাগী, তোর মুনি-ভাই। যা' তোরা সব খেলা কর গে।"

কিন্তু আম্বিয়া আশ্রয়ার্থী, সে ধীরে ধীরে দরিয়া-বিবির পাশে আসিয়া বসিল আর নড়িতে চাহিল না। হাসু-বৌর কাছে ত মোনাদির আর মুখ খুলিতে পারে না। হাঁ-না-দিয়া জবাব দায়-সারা করে।

হাসু-বৌ মোনাদিরের উদ্ধারে আসিল, "চাচা, কথা বলো, তুমি কেমন হোয়ে গেছ।"

মোনাদির মাথা হেঁট করিল। মার আদেশে সে আসিয়া চাচি-কে সালাম করিয়াছিল। আর মুখ খুলিতে পারে নাই।

"এমন লাজুক কেন, চাচা?" আমিরণ-চাচি মোনাদিরের দিকে চাহিল।

পুত্রের বদলে জবাব দিল মা, "বড় হোয়েছে—এখন সব বুঝে ত। মুরুব্বীদের সাম্‌নে কি বেশী কথা বলে। বেয়াদবী হয় যে।"

"তোমরা খেলা কর গে। যা, যা আম্বিয়া যা।" আমিরণ-চাচি মেয়েকে এক ঠেলা দিল।

আমজাদ মুনি-ভা'য়ের সঙ্গ পাইলে আর কিছু চায় না। সে বলিল, "চলেন দাদা।"

এতক্ষনে মন-মত প্রস্তাব আসিয়াছে। মোনাদির সাড়া দিতে বিলম্ব করিল না। আম্বিয়া তখন সলজ্জ ধীরপদ অগ্রসর হইতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে এক দৌড়ে আমজাদ ও মোনাদিরের পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। হাসু-বৌ কহিল, "চাচির মেয়ে একখানা। বড় তাজা। দেখ্‌লে কি ভাবে দৌড় মারল।"

"যাক্ যাক্। ও একটা জ্বালানী," মেয়ের প্রশংসা মা সহ্য করিতে পারিল না।

"বুবু, ছেলে এবার তোমার হোল না? আমি ত বলেছি, না এসে পারে?"

"আমার কোন ভরসা নেই।"

"এমন অলক্‌খুনে কথা মুখে এনো না।"

দরিয়া-বিবি কোন জবাব দিল না, শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। চাচি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ক'দিন থাক্‌বে?"

"স্কুলের ছুটী আছে চার দিন। পরশু আবার চলে যাবে।"

"ও" বলিয়া আমিরণ-চাচি একটু চিন্তান্বিত হইল।

"তোমরা খুব বুঝিয়ে বলো, বোন। আবার যদি চলে যায়, আমি আর বাঁচব না।"

হাসু-বৌ ও আমিরণ-চাচি এক-জোটে সায় দিল, "নিশ্চয় বলব।"

আম্বিয়া হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিল। তার দিকে সকলের লক্ষ্য।

"এই পোড়ামুখী হাস্‌ছিস কেন?"

আম্বিয়া মার মধুর সম্বোধনে হাসি ক্ষ্যান্ত দিল। পরে বলিল, "মুনি-ভাই গাছে চড়ে গান ধরেছিল। হঠাৎ একটা বাঁদর দেখে নাম্‌তে নাম্‌তে কাঠ-পিঁপড়ে কামড়েছে।"

"তাই হাসি। আবার কোথা থেকে মড়ার বাঁদর এসেছে। গাছ-পালা রাখা দায়। সেদিন আমার শিম গাছ খেয়ে গেছে।" আমিরণ-চাচি উঠানে গাছ-পালার দিকে তাকাইল।

কথায় কথায় বেলা শেষ। মোনাদির ফিরিয়া আসিলে, আজ চাচি নানা উপদেশ দিলেন। আম্বিয়ার জড়তা কাটিয়াছে। সে সকলের সঙ্গে খুথ চাকুম্‌চাকুম্‌ শব্দে মুড়ি ও নাড়ু খাইল।

দরিয়া-বিবি বলিল, "অবেলাটা বড় সুখে কাটল, আমিরণ-বোন।"

"আবার এসো মুনি-চাচা। তুমি পরশু দিন সকালে যাবে, তখন আমি থাকব এই হতভাগী-কে সঙ্গে নিয়ে।" চাচি সহাস্য মেয়ের দিকে আঙুল বাড়াইল।

হাসু-বৌ শুধু বড় ম্রিয়মান। তার আবার শাশুড়ীর ভয় জাগিয়াছে।

আজ আমিরণ-চাচি সকলের সঙ্গে সড়কের অনেকদুর পর্যন্ত আগাইয়া আসিল কথা বলিতে-বলিতে। কথা আর ফুরায় না।

৪০

চন্দ্র কোটালের প্রস্তাব মোনাদিরের খুব ভাল লাগিয়াছে। "মুনি-চাচা লেখা-পড়া জানে, আমাদের গানের দলের অধিকারী হবে, আর সমস্ত গান লিখে রাখবে। আজকাল গেঁয়ো, সোজা গান বাবুরা পছন্দ করে না। চাচা ভাষা ঠিক করে দেবে?"

কিন্তু যথা-সময়ে মোনাদির চলিয়া গেল। এই বাড়ীতে কেন যেন মন টেকে না। মাঝে মঝে মায়ের হৃদয়ের উত্তাপ-হীনতা সে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছিল। এই তিন দিনেই সে বুঝিয়াছিল, মা আগের মত তার জন্য আকুলি-বিকুলি করে না! দরিয়া-বিবি আকস্মিক ব্যবহারে আমজাদ দুঃখ পাইত, মোনাদির বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু কিশোরের মনে তার কোন বিশেষ দাগ পড়িল না। যাওয়ার দিন দরিয়া-বিবি বার-বার অনুরোধ করিল সে যেন ছুটী পাইলেই চলিয়া আসে।

হাসু-বৌ ইদানীং এই বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত করে। কাছে সহানুভূতি-শীল আর কোন প্রতিবেশী নাই। বন্ধ্যা জীবনে জুলুম সহ্য করিতে হয়। এইখানে তবু মনের ভার হাল্কা করা যায়। দরিয়া-বিবি এই নিরীহ-সরল বধূটীর প্রতি বড় স্নেহশীল। সাকেরের মা তাই লইয়া মনে মনে গজ্ গজ্ করিত, অবশ্য মুখে কিছু বলিত না। কারণ সাকের দরিয়া-বিবির কথা সহজে অবহেলা করে না। দরিয়া-বিবির খাতিরে সে তার মার সঙ্গে বিবাদ জুড়িতেও প্রস্তুত।

মোনাদির চলিয়া যাওয়ার দিন খুব সকাল-সকাল হাসু-বৌ এখানে আসিয়াছিল। অনেক বেলা হইয়া গেল, তবু বাড়ী-যাওয়ার নাম নাই। দরিয়া-বিবির সহিত একথা-সেকথা ও গৃহস্থালীর ছোট-খাট কাজ করিয়া দিল।

"বুবু, মন খারাপ করো না, এমন সোনার চাঁদ ছেলে। ও তোমার ছাড়া

কার?" এমন বহু সান্ত্বনা-বাক্য হাসু-বৌর মুখে আজ যেন লাগিয়াই ছিল।

দরিয়া-বিবি বড় বিষণ্ন। কাজ-কর্ম্ম করিতেছিল, কিন্তু সহজ কথোপকথনে তার মন ছিল না।

বাঁশের একটী চুপ্‌ড়ি ভাঙিয়া গিয়াছিল। হাসু-বৌর সহযোগিতায় দরিয়া-বিবি তা মেরামত করিতে বসিল।

"বুবু, আল্লার মরজী তোমার শরীর বেশ আছে। তুমি বেশ মোটা হচ্ছ।" দরিয়া-বিবি কোথায় কাপড় অসম্বৃত এই আশঙ্কায় নিজের দিকে চাহিয়া লইয়া জবাব দিল, "লোকে বলে আছে ভালো, কিন্তু ওদিকে শালুক খেয়ে যে দাঁত কালো, তার খবর কেউ রাখে না।"

হাসু-বৌ চুপ করিয়া গেল। দরিয়া-বিবির কণ্ঠে সৌহার্দ্দের লেশ ছিল না। যেন ঝগড়ার মুখে আর এক জনের সঙ্গে সে কথা কাটাকাটি করিতেছে।

শাশুড়ীর চীৎকার শোনা গেল। হাসু-বৌ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দরিয়া-বিবি যেন তার উপর কত খাপ্পা। হাসু-বৌ তাই ভয় পাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এখন যাই বুবু।"

দরিয়া-বিবি নিজের মনে একটী কঞ্চি ফাড়িতে লাগিল, কোন জবাব দিল না—হয়ত শুনিতে পায় নাই। সে নিজের কাজে মগ্ন। হাসু-বৌ অপরাধীর মত বিদায় লইল।

সেদিন বিকালে ইয়াকুব আসিল। সঙ্গে পুত্র। তাহাকে দরিয়া-বিবির কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল। আবার দু'দিন পরে আসিবে সে।

সমগ্র পরিবারের রসদ দিয়া গিয়াছে, দরিয়া-বিবির কোন অসুবিধা ছিল না। নিজের ছেলে আজ-ই প্রবাসী আবার পরের সন্তান ঘাড়ে। কিন্তু দরিয়া-বিবি কোন অবহেলা দেখাইল না। ছেলেটীর নাম ওয়ায়েস। বেশ ফুট্‌ফুটে কথা বলে। আর বড় সুন্দর জবাব দিতে পারে। দরিয়া-বিবি মানসিক ভার কাটাইবার উদ্দেশ্যে ছেলেটী-কে ইয়াকুবের অন্দর মহলের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল।

"তোমার দুই মা, না?"

"হ্যাঁ চাচি। ছোট-মা আর বড়-মা। আমি বড় মায়ের ছেলে।

আমার দু-ভাই।"

"তোমার ছোট-মা কেমন ?"

"খুব ঝগড়া করে মায়ের সঙ্গে বাপের সঙ্গে।"

"তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে ?"

"হাঁ। আজ ঝগড়া হোয়েছে। তাই আমাকে বাপ নিয়ে এলো।"

"ঝগ্ড়া হোলো ?"

"রোজ ঝগড়া হয়। আজকাল তাই বাপ ঘরে থাকে না।"

"কোথায় থাকে ?"

"দহলিজে ঘুমায়। আর বাপের অসুখ আছে। শরীর খারাপ।"

দরিয়া-বিবি চুপ করিয়া যায়। ছেলেটীকে নিজের পাশে শোয়াইয়া আরো তথ্য সংগ্রহ করিল। ইয়াকুবের অন্দর মহল একটী দোজখ। মোটামুটি গ্রাম্য জীবনের স্বচ্ছলতা আছে, তাই বাড়ীর মেয়েরা রান্না-খাওয়া ছাড়া বেকার। টাকার গরম, শাড়ীর গরম দেখাইতে পরস্পরে হিংসা, ঝগড়া। এইটুকু ছেলেও তেমন কূটচক্রের ইতিহাস জানে।

দু-দিন পর ইয়াকুব ছেলেটী-কে লইয়া যাইবার সময় বলিল, "দরিয়া-ভাবী (আর ভাবী সাহেব বলে না) ছেলেটা-কে এনে রেখে দেব। ওখানে থাক্‌লে আর মানুষ হবে না।"

কথার জবাব দিতে হয়, আমজাদ সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। দরিয়া-বিবি বলিল, "তোমার পাকা বাড়ী, এখানে বাঁশের ঘরে কেন ?"

"সেখানে ছেলে-গুলো মার জন্য খারাপ হবে। খালি কিচাকিচি ঝগড়া-ঝাঁটি।"

দরিয়া-বিবি আর কোন জবাব দিল না।

ইয়াকুব পুত্র-কে লইয়া পথাভিমুখী হইল। আমজাদের সঙ্গে ওয়ায়েসের খুব খাতির জমিয়াছে। সে-ও পেছন-পেছন গেল।

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মা, তোমাকে পনর টাকা দিয়েছে। ভুলে গিয়েছিল। ওয়ায়েসের বাপ বল্‌লে।"

মুনি মাত্র দু-টাকা সঙ্গে নিয়ে গেছে। কাল-ই টাকা পাঠিয়ে দিতে হয়। মনে মনে দরিয়া-বিবি সাত-পাঁচ করিতে লাগিল।

৪১

অচল দিন-কে প্রাণপনে ঠেলিতে হয়। সমস্ত উদগ্র শিরা-উপশিরা বিদ্রোহী! তবু বিশ্রাম কি শৈথিল্য দেওয়া চলে না। উৎরাইয়ের বাঁকে বোঝা-ও অনড় হইয়া সংগ্রাম-শীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে ব্যঙ্গ করে। উপত্যকায় তখন আবার ঝড় দেখা দিলে, অসহায়তা-নৈরাশ্য মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গেই বিকট প্রতিধ্বনির ধাক্কার বেগে ছুটিয়া আসে।

দরিয়া-বিবি উৎরায়ের মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। চারিদিকে শ্বাপদ-সংকুল খাদ-ভরা অরণ্যানী ; পানী আর তৃষ্ণা মেটায় না, বাতাস আর শ্রান্তি হরণ করে না।

"মা" ।

দরিয়া-বিবি চাউলের কাঁকর বাছিতেছিল। উঠানের দিকে পিঠ। সুতরাং আগন্তুকের সংবাদ সে জানিতে পারে নাই। চকিতে চোখ ফিরাইয়া দরিয়া-বিবি অবাক হইয়া গেল। মোনাদির আসিয়াছে। পিঠের উপর একটী বোঝা—সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। পথ-চলার ক্লান্তি পথিকের নিঃশ্বাসের দ্রুততায় ধরা পড়ে।

"হঠাৎ এলি নাকি, বাবা।"

"গরমের ছুটী হোতে এখন-ও তিন মাস বাকী। স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছে এক হপ্তা ছুটি। তাই চলে এলাম।

"বেশ করেছো।"

দরিয়া-বিবি তাড়াতাড়ি নিজের হাতে মোনাদিরের জামা খুলিয়া ঘাম মুছিয়া দিল। হাঁক-ডাকে আমজাদ আসিয়া হাজির। সে একটা মোড়া আগাইয়া দিল।

দরিয়া-বিবি বড় খুশী। তাড়াতাড়ি ভাত চাপাইয়া দিল। দুপুরের হাঁড়ি শূন্য। কিছুক্ষণ আগে তাহারা আহার সমাধা করিয়াছে। আমজাদ মাঝে মাঝে হাত-খরচের লোভে মুর্গী-হাঁসের ডিম লুকাইয়া

রাখে। সে একটী ডিম আনিয়া দিল।

দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসা করিল, "আণ্ডা কোথা পেলি?"

"আমাদের লাল মুর্গীটা যেখানে-সেখানে ডিম পাড়ে। কাল গোয়াল-ঘরের মাচাঙে ছিল। তোমাকে বল্‌তে ভুলে গেছি।"

পুত্রের আবিষ্কার-দক্ষতায় দরিয়া-বিবি খুব উৎফুল্ল হয়। সে আলু ভাজা আর ডাল করিতে চাহিয়াছিল। এখন ডিম পাওয়া গেল। আহারের ষোল-কলা পূর্ণ।

মোনাদির পুকুরে গোসল করিয়া আসিল। অজানা পরিতৃপ্তি তার মনে। তাই ভাই বোনদের সঙ্গে নানা গল্প ছাড়িল। ঝোল্লা হইতে কয়েকটী মাটীর পুতুল সে নঈমা ও শরী-কে দিল। তাহাদের খুশীর অন্ত নাই। এক জোড়া ভাল লাটিম বাহির করিল মোনাদির আমজাদের জন্য।

"দুই ভায়ে কাল নদীর ধারে গাছ-তলায় খেলব", এই প্রস্তাবে আমজাদ্‌ লাফাইয়া উঠিল।

দরিয়া-বিবির কাছে সমস্ত বৈকাল যেন সুরের মত বাজিতে থাকে। ছেলেপুলেদের লইয়া সে বহুদিন এমন আনন্দ পায় নাই। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সে রাত্রির রান্নায় বসিল। আমিরণ-চাচির গাছ হইতে একটী লাউ চাহিতে গিয়াছিল আমজাদ। সে লাউয়ের সঙ্গে একটা মুর্গী ছানা দিয়াছে। কদু-গোস্তের তরকারী রাঁধিতে দরিয়া-বিবি সমস্ত নৈপুণ্য ঢালিয়া দিল।

আহার শেষে দাওয়ায় অনেকক্ষণ গল্প-গুজব শুরু হইল। মোনাদিরের কাছে পরিবেশ আর অচেনা নয়। সে বেশ সহজ। দরিয়া-বিবিও প্রাণ খুলিয়া ছেলেদের হল্লায় যোগ দিল। পরদিন্‌ আমজাদ ও মোনাদির টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। চন্দ্র কোটালের ভিটায়, নদীর ধারে মাঠে মাঠে, সড়কের আশপাশে ঝোপে-জঙ্গলে—দুইজনের গতিবিধি। আমজাদ ত এমন স্বাধীনতা-ই প্রতিদিন কামনা করে। একা-একা সে আবার বড় ভীরু ও লাজুক। শুধু মুনি-ভাই সঙ্গে থাকিলে-ই সে সব কাটাইয়া উঠিতে পারে।

মার মেজাজ বড় হাল্কা আজকাল। আমজাদ তাই আরো খুশী।

মোনাদির-ই প্রথম অনুজ-কে জিজ্ঞাসা করিল, "আমু, মা বড় মোটা হয়ে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ। মুনি-ভাই, আমার মনে হয় অসুখ।"

"না। মার শরীর আমার মত কি না।"

"তা ঠিক মুনি-ভাই। বড় হোলে তুমি চন্দ্র-কাকার মত জোওয়ান হবে।"

"তাই ত বেঁচে আছি। স্কুলের বোডিংয়ে যা খাওয়ায়, এত দিন আমার-ও অসুখ করত।"

ভ্রাতৃ-বিক্রমে আমজাদ গৌরবান্বিত। সে প্রস্তাব করিল, "তুমি সাকের-চাচার কাছে লাঠি-খেলা শিখ্‌বে?"

"গ্রামে এসে থাক্‌লে নিশ্চয় শিখব। আমি খুব ভাল লাঠি-খেলা শিখ্‌তে পারব।" মোনাদির হাতের পেশী দেখাইল।

নদীর ধারে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া দুইজনের কথাবার্তা চলিতেছিল। চৈত্র মাস। তাই নদী শুষ্ক। দুই পাশে চরে খাগ্‌ড়া বন। মাছরাঙার বাসা খুঁজিয়া অনেকক্ষণ দুইজনে কাটাইয়াছে। কোন লাভ হয় নাই। একটী বড় চাল্‌দা গাছের গুড়ির উপর দুইজনে ঠেস দিয়া দূরে দূরে চাহিতেছিল। আকাশ একদম মেঘ-হীন। রৌদ্রের তরল ঝর্ণায় সমস্ত মাঠ ঝম্‌ঝম বাজিতেছে। নিঃসঙ্গ তালগাছ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে প্রত্যঙ্গের থরথরানি মিশাইয়া দিয়াছে। গ্রাম্য দুই বালক কথার ফাঁকে ফাঁকে পৃথিবীর বিশালতা অনুভব করে।

শুধু ক্ষুধার তাড়না এই অবসর-উপভোগে ছেদ টানিল। মোনাদির বাড়ী ফিরিয়া দেখিল ইয়াকুব আসিয়াছে। মা বলে নাই, তবে আমজাদ বলিয়াছে, এই লোকটী গত তিন-চার বৎসর তাহাদের বহু উপকার করিয়াছে। মোনাদির অচেনা লোকের সম্মুখে বড় লাজুক। শুধু সে আর নিজে কোন আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারে না।

রাত্রে ছেলেরা আহারে বসিল। দরিয়া-বিবি ম্রিয়মান দাসীর মত কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল। আমজাদ আসর জমাইতে চায়।

কি একটা মুনি-সম্পর্কিত রসিকতা করিতে গিয়া সে ধমক খাইল। তখন আহার-ই একমাত্র তপস্যা হইয়া দাঁড়াইল সকলের পক্ষে।

দু-টি মাত্র কক্ষ। আমজাদ ও ইয়াকুব এক কামরায়, অন্য কামরায় মার কাছে নঈমা ও শরী-র সহিত মোনাদিরের শয়ন-ব্যবস্থা হইল।

আজ মার সঙ্গে বিশেষ কোন কথা হইল না। সারাদিন কত খাটে, এই ভাবিয়া মোনাদির ঘুমাইয়া পড়িল।

দরিয়া-বিবি বিনিদ্র বহুক্ষণ পড়িয়া রহিল। গরমের দিন। তবু একটী কাঁথায় তার হাটু পর্যন্ত চাপা। গরম, তার উপর দৈনন্দিন চিন্তার টানা-পোড়েন। বাহিরে জানালা দিয়া দেখা যায় আকাশ ভরিয়া কত জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

ঘুম আসিতেছিল না। দরিয়া-বিবি সকল-কে ঘুমন্ত দেখিয়া ধীরে ধীরে টাটি খুলিয়া উঠানে দাঁড়াইল। জানালার কাছে কাঁঠাল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোছ্না পড়িয়াছে মাটীর উপর। দরিয়া-বিবি আন্‌মনা গিয়া দাঁড়াইল। আকাশে নিষ্প্রভ কয়েকটী তারা জ্বলিতেছে মাত্র। সমস্ত আকাশ ত গাছের তলা হইতে দেখা যায় না। দরিয়া-বিবি দাঁড়াইয়া রহিল বেশ কিছুক্ষণ। সুপ্ত গ্রামের নীরবতা ক্বচিৎ পাখীর ডাকে, দূরাগত কুকুরের চীৎকারে চিড় খায় মাত্র।

হয়ত অনন্ত কাল এমন-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে দরিয়া-বিবি আনন্দিত হইত, কিন্তু হঠাৎ মানুষের ছায়া পড়িল জোছ্নায়। শিহরিয়া, তাড়াতাড়ি উঠানের দিকে যাইবে, সে দেখিল ইয়াকুব তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সম্মোহিতের মত দরিয়া-বিবি নিজের জায়গায় স্থানু।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে দরিয়া-বিবি ফিস্‌ফিস কণ্ঠে বলিল, "এখানে কেন ?"

"কেন, তুমি জানো না, দরিয়া ?" ইয়াকুব তার হাত ধরিয়াছে ততক্ষণে।

হয়ত হাত টানাটানি শুরু হইত, জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া মোনাদির ডাকিল, "মা এত রাতে তুমি একা বাইরে গেছ, আমাকে

ডাক্‌লে না কেন ?"

"আসছি বাপ। তুমি ঘুমোচ্ছিলে, তাই আর জাগাইনি।"

ইয়াকুব চোরের মত আড়াল-অন্ধকারে লীন হইতে গেল, কিন্তু তার লম্বা ছায়া জোছ্‌নার হাত এড়াইতে পারিল না।

দরিয়া-বিবি কম্পিত বুকে তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা বন্ধ করিল। মোনাদির তখন-ও জানালায় দাঁড়াইয়া। মা-কে বলিল, "মা, চোর-টোর হবে। একটা লোকের ছায়া পড়ল কাঁঠাল গাছের পাশে।"

"না।" অন্ধকারে দরিয়া-বিবি আবার বলিল, "তুমি এসো শুয়ে পড়।"

"যাই। মা, তুমি একলা এমন রাত্রে বেরিয়ো না।"

"কি আছে আমাদের, চোর আস্‌বে ?"

মোনাদির কয়েক মিনিট জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া নিজের বিছানায় ফিরিয়া আসিল।

সারাদিনের ক্লান্তি, উদ্বেগ-জনিত নিদ্রাহীনতা—ভোরের দিকে দরিয়া-বিবির চোখে ভয়ানক ঘুম নামিয়াছিল। কাক-ডাকা সকাল আজ জীবনে প্রথম সে দেখে নাই।

আরো কতক্ষণ ঘুমাইত কে জানে, হঠাৎ আমজাদ আসিয়া ডাক দিল, "মা, মা।"

খোঁয়ারি-চোখে দরিয়া-বিবি ধমক দিল, "কি, এত ডাক্‌ছিস কেন ?"

"মুনি-ভা'য়ের কাপড়-চোপড় কোথা ?"

"বাঁশের আলনায় আছে।"

"কই, নেই ত ?"

দরিয়া-বিবি চোখ খুলিয়া চাহিল।

"তোর ঘরে নেই ?"

"না। ইয়াকুব-চাচা সকালেই চলে গেছে।"

দরিয়া-বিবি কাঁথা জড়াইয়া উঠিয়া পড়িল। বার বার চোখ কচ্‌লাইল। মোনাদিরের ঝোল্লা, কাপড়-চোপড় আলনায় নাই।

বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল দরিয়া-বিবি। তার শরীর থর্‌থর কাঁপিতেছে।

"দিঘীর পাড়ে গিয়ে দেখ্ তুই, সেদিকে গেছে বোধ হয়।"

আমজাদ চলিয়া গেলে দরিয়া-বিবি পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, মোনাদিরের বই-পত্র নাই।

দরিয়া-বিবি হয়ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু মনে মনে বুকে জোর সঞ্চয় করে সে। না, মূর্চ্ছা-যাওয়া তার সাজে না।

তাল সামাল দেওয়ার জন্য ঝিম-ধরা মাথা দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া দাওয়ার উপর দরিয়া-বিবি বসিয়া পড়িল। একটু হাঁফ ফেলা দরকার শুধু।

৪২

চন্দ্রমণি এক রাত্রে রাজেন্দ্রের সঙ্গে গ্রাম-ত্যাগ করিয়াছিল। চন্দ্র কোটাল প্রায় একমাস আর গ্রামের ভিতর আসে নাই। আমজাদ নিজেই যাইত খোঁজ-খবর লইতে। চন্দ্র যেন আর এক রকম হইয়া গিয়াছে। তাড়ি সে খায়। কিন্তু নিঃশব্দে খায়। আর হল্লা করে না, গান করে না। চন্দ্রমণির ছেলে দু-টী মামার কাছেই আছে।

দরিয়া-বিবি এই সংবাদ শুনিয়াছিল হাসু-বৌর মুখে, আমিরণ-চাচির মুখে। কিন্তু কোন মন্তব্য করে নাই। বিপদে-আপদে কোটালের কাছে আমজাদ-কে পাঠানো বৃথা। যে-যার মাথার ঘায়ে-ই পাগল। এই জন্য দরিয়া-বিবি কোটালের জন্য বড় দুঃখিত। আহা, এমন মানুষের কপাল বটে! কিন্তু উপায় কোথায়? দাদার গলগ্রহ-জীবনের চেয়ে চন্দ্রমণি আর কারো আশ্রয়ে গিয়াছে। সংসারের কতটুকু ক্ষতি তা-তে? হয়ত দরিয়া-বিবির মনে এই-সব কথা উঁকি দিয়াছিল।

দরিয়া-বিবির একদিন সন্ধ্যায় চন্দ্র কোটালের বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আমজাদ খুব রাজী। কিন্তু আর যেন সেদিকে পা-বাড়ানোর উৎসাহ নাই। ক্ষ্যাপা কোটালের সংসার দেখার ইচ্ছা কার না হয়? আজহারের মত ধর্ম্মান্ধ-ধর্ম্মভীরু লোকটী চন্দ্র-কে চিনিয়াছিল। কিন্তু সে জীবিত থাকিতে দরিয়া-বিবি এমন প্রস্তাব উত্থাপন করে নাই। আর যাওয়া হোলো না, দরিয়া-বিবি সেদিন মনে মনেই উচ্চারণ করিল। গ্রাম্য-জীবনে এক জনের অপবাদ সমস্ত বাড়ীর উপর ভর করিয়া থাকে।

এক মাস পরে আমজাদ মার কাছে আসিয়া জানাইল, "মা, আজ মুনি-ভায়ের টাকা ফেরৎ এলো। এই নাও টাকা।" আমজাদ পনরটী টাকা গনিয়া দিল।

"টাকা ফেরৎ এলো কেন?"

"পিয়ন বল্‌লে মুনি-ভাই সেখান থেকে চলে গেছে।"

অস্ফুট কণ্ঠে দরিয়া-বিবি একবার উচ্চারণ করিল, "চলে গেছে!" তারপর পুত্রের সহিত আর কোন বাক্যালাপ করিল না। অবিচল মূর্তির মত টাকা কয়টী হাতে দরিয়া-বিবি বসিয়া রহিল। দুশ্চারিণী জননীর দান সৎ সন্তান কেন গ্রহণ করিবে? মুণি…

আমজাদ হাসু বৌ-কে তখনই খবর দিয়া আসিয়াছিল। পিয়ন তাহাদের বাড়ীর পাশেই দাঁড়ায়। হাসু-বৌ আসিল। দরিয়া-বিবির অশ্রু-সজল মুখের দিকে চাহিয়া সে আর কোন কথা বলিল না, নিঃশব্দে পাশে বসিয়া পড়িল।

দরিয়া-বিবির মুখাবয়ব ক্রমশঃ থম্‌থমে, গৌর-সুডোল গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। হাসু-বৌ আমজাদ-কে বলিল, "বাবা, একটু পানী এনে দে।"

আমজাদ বিলম্ব করিল না আদেশ-পালনে।

হাসু-বৌ দরিয়া-বিবির চোখের পানী মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "বুবু, একটু বারফাট্টা ছেলে। আবার আস্‌বে। বেটা ছেলের জন্য এত চিন্তা কেন?"

দরিয়া-বিবি কোন জবাব দিল না। হাসু-বৌ আবহাওয়া সহজ করিতে ছুতানাতা খোঁজে। বলিল, "বুবু, সন্ধ্যা হয়, এখন কত কাজ তোমার উঠে পড়।"

উঠানে এক পাল মুর্গী-হাঁস কোলাহল তুলিয়াছিল। ইহাদের সান্ধ্য-ভোজন বাকী। হাসু-বৌ আরো জিদ ধরিল, "বুবু তুমি না উঠ্‌লে আমি বাড়ী যেতে পারব না। তোমার ছেলে তোমারই আছে।"

দরিয়া-বিবির চোখে আর পানী নাই। কিন্তু বড় চিন্তান্বিত সে। হাঁটুর উপর থুৎনী রাখিয়া অবিচলতার নারী-প্রতীক রূপে বসিয়া রহিল।

"ওঠো বুবু।" হাসু-বৌ হাত ধরিয়া বলিল, "ওঠো। তোমার নিজের শরীরও ভাল নয়। কেমন ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছে। এমন করলে শরীর টেকে?"

"তুমি যাও। আমি উঠ্‌ছি।" দরিয়া-বিবি মৃদু কণ্ঠে বলিল।

"তুমি ওঠো।"

"উঠ্‌ছি। তুমি যাও।"

"বেশ আমি উঠানের পৈঠা পর্যন্ত গিয়ে দেখব, না উঠ্‌লে আবার আস্‌ছি।"

হাসু-বৌর যা-কথা তা-ই কাজ। কিন্তু দরিয়া-বিবি সত্যই তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাঁস-মুর্গীর খবরদারীতে মনোযোগ দিল।

৪৩

সাকের নঈমা-কে সদরের হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছিল। চোখের দৃষ্টি তার ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। এত বেশী পিঁচুটি পড়ে, সকালে সে চোখ-ই খুলিতে পারে না। তাই দরিয়া-বিবি সাকেরের শরণাপন্ন হয়। চন্দ্র-কোটাল বহুদিন এদিক মাড়ায় নাই। হাঁসপাতালের ডাক্তার ঔষধ দিয়াছে। কিন্তু রোগের প্রতিকার অনিশ্চিত। ডাক্তারের অভিমত, দরিয়া-বিবি শুনিয়াছিল। কিন্তু সে ব্যাপারটা আর গুরুতর মনে করে না। অন্ধের কি দিন বন্ধ থাকে ?

গত দুই মাসে দরিয়া-বিবি বড় স্থির ও শান্ত হইয়া আসিল। কাজের গাফলতি হয় না, কিন্তু সব কাজ ধীরে ধীরে। মন যেন আর কোথাও উধাও, তার-ই পটভূমিকায় দৈনন্দিনতার কর্তব্য-সাধন মাত্র। ছেলেদের উপর রাগ-ও নাই। শরী কত বিরক্ত করে, দরিয়া-বিবি মোটেই তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। আমজাদ একদিন মার কোপন-স্বভাবের জন্য যেমন ভীত হইয়াছিল, আজ আবার বর্তমান অবস্থার জন্য তেমন-ই ভয় পাইল। তার ছেঁড়া লুঙ্গী ও শার্ট সেদিন পাওয়া গেল না। নালিশ জানাইলে মা জবাব দিলে, "গেছে যাক"। আর কোন ধমক নয়। দরিয়া-বিবি যেন ধমক দিতে ভুলিয়া গিয়াছে। আমজাদ তাই অস্বাভাবিকতার আবহাওয়া স্বতই টের পায়। আমিরণ-চাচি আসিলে দরিয়া-বিবির চাঞ্চল্য সামান্য বাড়ে। হাসু-বৌ কোন পাত্তা পায় না। তার সহিত দু-একটী কথা হয় মাত্র। চুপচাপ বসিয়া-বসিয়া সে চলিয়া যায়। দরিয়া-বিবি কোনদিন মুখরা ছিল না। কিন্তু এখন তার সমস্ত কথা যেন শেষ হইয়া গিয়াছে।

একদিন সকালেই রাজকীয় উপহারে ইয়াকুব আসিল। ছেলেদের সম্মুখে দরিয়া-বিবি কোন নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘৃণা করে। সহজেই সে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া রাখিল।

ইয়াকুব তাড়াতাড়ি আমজাদের বিছানায় শুইয়া পড়িল। তার চোখ-মুখ কোটরাগত ও শীর্ণ। দরিয়া-বিবি জিজ্ঞাসাবাদ কিছু-ই করে না। "কখন এলে ?" বা এই জাতীয় মামুলী প্রশ্ন মাত্র।

একটু পরে আমজাদের কক্ষে দরিয়া-বিবি প্রবেশ করিল।

"ঘুমোচ্ছো ?" ইয়াকুবের নিকট তার প্রথম প্রশ্ন। ইয়াকুব মুখে চাদর ঢাকা দিয়া শুইয়া ছিল। দিনের আলোয় মুখ দেখাইতে সে যেন ভয় পায়।

ইয়াকুব মুখের আবরণ খুলিয়া অন্য-দিকে-দৃষ্টি দরিয়া-বিবির তরফে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কিছু বল্‌ছ ?"

দরিয়া-বিবি প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। ইয়াকুবের মুখের উপর পনরটী রূপার টাকা ঝনঝন শব্দে রাখিয়া বলিল, "মাস-মাস তোমাকে এই টাকা আর দিতে হবে না।"

"কেন ?" ইয়াকুবের মুখ বিবর্ণ। জ্বরে তার হাড় সিদ্ধ হইতেছিল, এমন-ই দেহে কোন জৌলুশ ছিল না।

দরিয়া-বিবি কক্ষ-ত্যাগের জন্য পা বাড়াইলে প্রায় আসন্ন-মৃত্যু রোগীর চেরা-কণ্ঠে ইয়াকুব ডাকিল, "শোনো।"

দরিয়া-বিবি গমন-পথের দিকে চাহিয়া পেছন ফিরিয়া বলিল, "বলো।"

"আমার বড় জ্বর, আজ এক সপ্তাহ। আমি তোমাদের এখানে একটু শান্তি পেতে এসেছি।"

"আমরা কি তোমার কাপড়ে আগুন লাগাচ্ছি ?" বড় নির্মমের মত দরিয়া-বিবি জবাব দিল।

"তা কেন ? এমন দুঃখের দিনে তোমরা আমাকে জায়গা দিয়েছে, তা কি কম উপকার। আমার ঘরে শান্তি নেই, দেহ ভাল নয়। এই টাকাগুলো নিয়ে গেলে আমার মনে কোন কষ্ট থাক্‌বে না।"

"ও টাকাগুলোর আর দরকার নেই।"

"নেই ?"

"না।" দরিয়া-বিবি তখন-ই আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সাগু খাবে ?

"হঁা।" কাতর কণ্ঠের আর্তনাদের মত শোনায় ইয়াকুবের জবাব।

দরিয়া-বিবি রোগীর অন্য প্রয়োজন জানার অপেক্ষায় রহিল না। দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

আমজাদ আজ মার উৎসাহ দেখিয়া অবাক। মাছ ছিল কয়েক রকমের। ইয়াকুব সের দুই খাসীর গোস্ত্‌ ও অন্যান্য শাক-সব্জী সহ ঘি আনিয়াছিল। দরিয়া-বিবি পরম আগ্রহে রন্ধন-বিদ্যা উজাড়ে মনোযোগ দিল। শত্রু কোথাও যেন ধরাশায়ী। তাই যেন বিজয়ী বীরের উল্লাস। খাওয়ার সময় উৎসাহে আদৌ ভঁাটা পড়িল না। মার এমন আগ্রহান্বিত আহার আমজাদ জীবনে দেখে নাই। রান্না হইয়াছিল চমৎকার।

ভুরি-ভোজনের বিশ্রামের পর সাগু হাতে কক্ষে ঢুকিয়া দরিয়া-বিবি দেখিল, ইয়াকুব ঘুমাইতেছে। ভাঙা তক্তপোষের এক দিকে বাটী বসাইয়া সে চাহিয়া দেখিল। তার মুখের এমন পূর্ণ আদল সে আগে দেখে নাই। মলিন লতার মত সারা চেহ্‌রায় বিশীর্ণতা। কত দুঃখ-ভারাক্রান্ত এই শায়িত ব্যক্তি, তা তার চোখের কালি-মাখা কোণগুলিতে স্পষ্ট।

দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দরিয়া-বিবি ঐ মুখ পুঙ্খানুপুঙ্খ অবলোকন করিল। বেচারা বড় দুঃখী! ঘরে সাতদিন জ্বরে ভুগিয়াছে, আজ-ও জ্বর-দেহে গৃহত্যাগী। খুব জ্বর, হয়ত এই শেষ শয্যা। আজহারের শেষ কয়টী দিন দরিয়া-বিবির চোখে নিমেষে খেলিয়া গেল।

নিঃশব্দে ইয়াকুব ঘুমাইতেছিল অথবা চোখ বুঁজিয়া ছিল কে জানে। দরিয়া-বিবির কেমন মায়া হয়। হঠাৎ তার বুকে করুণা উথলিয়া উঠে। নৌকায় সারা-পথ আসিয়াছে, এক মাইল হঁাটিয়াছে, এখন-ও অভুক্ত। এখন-ও অভুক্ত! দরিয়া-বিবি আর স্থির থাকিতে পারে! তার ইচ্ছা হইল: একবার ঘুম ভাঙাই, সাগুটুকু খেয়ে নিক্‌। কিন্তু ডাকিতে গিয়া, থামিয়া গেল! কে যেন গলা টিপিয়া ধরিল অকস্মাৎ।

দুঃখী মানুষ দুয়ারে আশ্রয় লইয়াছে। সমস্ত ঘৃণা দরিয়া-বিবির মন হইতে মুছিয়া যায়। ইয়াকুবের দিকে সে তাকাইল। গায়ে ঠিক মত চাদর নাই। পঁাজরের প্রান্ত খোলা। পায়ের দিকে হঁাটুর পরে আর চাদর নাই। খোলা গায়ে জ্বর আরো বাড়িতে পারে।

দরিয়া-বিবি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। জ্বরের উত্তাপ গা ছুঁইলে বোঝা যাইবে। অতি সন্তর্পণে সে তাপ দেখিল। জ্বর যে খুব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই ধীরে ধীরে গাখানি চাদরে ঢাকিয়া দিল। তখন-ও হাত তোলা সম্পূর্ণ হয় নাই, ইয়াকুব চোখ মেলিয়া তাকাইল। বান-মাছের গর্তে খুঁজিতে গিয়া যেন হঠাৎ সাপ ঠেকিয়াছে হাতে—দরিয়া-বিবি এমন-ই আতঙ্কিত শিহরণে তাড়াতাড়ি পিছাইয়া দ্রুত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রমণের পথ ধরিল ও তাড়াতাড়ি বলিল, "তক্তপোষের উপর সাবু রইল, উঠে খেয়ো।"

ইয়াকুব চোখ বুঁজিল, হয়ত পুনর্বার ঘুমাইতে।

৪৪

ইয়াকুবের অগস্ত্য যাত্রা। ইয়াকুব অসুখে মরে নাই। কিন্তু আর ফিরিল না। মহেশ-ডাঙার পথ সে চিরতরে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

দরিয়া-বিবির চতুর্দিকে অন্ধকারের নৈরাজ্য। অন্ধকার-ই অন্ধকারের পরিসমাপ্তি ঘটায়। নচেৎ অভ্যস্ত জীবনে মানুষ আনন্দ পাইত কি করিয়া ? এই ক্ষেত্রে সেই পথ-ও চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল।

দুই তিন মাস পরেই তিলে তিলে অনটন-উপবাস উদ্বেগের সড়ক বহিয়া সেই রাত্রি আসিল—অন্ধকার যার লীলাভূমি। দরিয়া-বিবির এই তমসার যেন প্রয়োজন ছিল। সে সত্যই হাত তুলিয়া আল্লার শোক্‌রিয়া আদায় করিল। ও যদি দিবালোকে আসিত ? এত মানুষের সম্মুখে, পুত্র-কন্যার সম্মুখে। তোমার কত মরজী, আল্লা। তোমার এই রহমত-টুকুর জন্য তোমার কাছে হাজার শোক্‌রিয়া, হাজার মোনাজাত !

গভীর রাত্রির কালো ডানা মহেশ-ডাঙার উপর প্রসারিত। সুপ্তির শাসন দিকে দিকে। নৈশ পাখীর দল হয়ত জাগিয়া আছে। আর জাগিয়া ছিল দরিয়া-বিবি !

ধীর মৃদু বাতাস বহিতেছিল। দরিয়া-বিবির হস্তস্থিত প্রদীপের শিখা তাই কম্পমান। দরিয়া-বিবি জাগিয়া ছিল, জাগিয়া উঠিল। দাওয়ার উপর ডিপা-হাতে দণ্ডায়মান। বাহির হইতে টাঁটির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে সে কিছুক্ষণ আগে। আমজাদ, শরী, প্রায়ান্ধ নঈমা—সকলে ঘুমাইতেছে। কান-পাতিয়া সে শুনিল। শিশু-কিশোরদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ। এইখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

দরিয়া-বিবি নিঃশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে রান্না-ঘরের ভেতর ঢুকিল ও ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। মজবুত বাঁধা কি না,

তা-ও একবার টানিয়া দেখিল। তারপর কম্পিত হাতে ডিপা এক জায়গায় নামাইয়া একটী মাদুর পাতিল।

বহু দিন গোপন ছিল। কিন্তু বিকাশের ধারা কোথাও বন্ধ হয় না। সময় শুধু এই এক মাত্র ক্ষেত্রের অপেক্ষা করে।

দরিয়া-বিবির সমস্ত শরীর নাড়া দিতেছে, তবু এতক্ষণ সে মুখে যন্ত্রণার সামান্য কুঞ্চন পর্যন্ত ফেলে নাই। সমস্ত কাজের ভার তার নিজের-ই উপর। তার ত কেউ সাহায্যে আসিবে না।

মাদুর পাতিয়া দরিয়া-বিবি গায়ের ছেঁড়া কুর্তা খানি খোলা-মাত্র আরো কাপড় বাহির হইল। শরীর ব্যাপিয়া তখন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি শুরু হইয়াছে। তাড়াতাড়ি কোমরের কাপড় পর্যন্ত আল্‌গা করিয়া দিল। তখন একরাশ কাপড়, ছেঁড়া ন্যাকড়া, নঈমার ফালি, আমজাদের ছেঁড়া শার্ট—একস্তূপ বাহির হইল। আসন্ন-প্রসবা জননীর স্ফীত উদর-খানি প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হয় না। আরো অন্ধকারে রহিয়াছে বিশ্বের বিস্ময়তম মানব-শিশুর নীড়খানি। দরিয়া-বিবি পেটের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। হঠাৎ তার মনে পড়িল আমিরণ-চাচির কথা, "বুবুর শরীর যেন ফেটে পড়ছে।" আহ্‌, সত্যি যদি ফাটিয়া যাইত—সেই ত' ছিল সকল সুখ। দরিয়া-বিবি জোরে একবার প্রশান্তির নিঃশ্বাস লইল। আরো কাজ আছে। উদর-অন্ধকারে মুমুক্ষু মানবশিশু যতই আর্তনাদ করুক বাহিরে আসার আকুলতায়, কর্তব্যের ডাকে দরিয়া-বিবি সারা জীবন অচল। আজ তার কোন নড়চড় হইবে না। ঘুটের মাচা হইতে ছোট-ছোট বহু পুরাতন শিশু-কাঁথা দরিয়া-বিবি মাদুরের এক কোনে রাখিল।

তারপর উবুড় হইয়া সে সমস্ত মাদুর চাপিয়া ধরিল। আহ্‌, এখন শুধু একটু চীৎকারের স্বাধীনতা পাওয়া যাইত। ছেলেরা না জাগিয়া ওঠে। তাই সারাদিন কাহাকে-ও ঘুমাইতে দেয় নাই। আমজাদ-কে সারাদিন সে খাটাইয়াছে। ক্লান্তির ঘুম প্রগাঢ়, দরিয়া-বিবি তা জানে। অসহ্য বেদনায় দরিয়া-বিবি এই প্রথম মুখ কুঞ্চন করিল। মাদুরে হাত পিছ্‌লাইয়া যায়, তাই একটু আগাইয়া সে মাটী আঁকড়াইয়া

ধরিল। মাটীর কন্যা জননীর আশ্রয় ছাড়া আর কোথায় তাবৎ পাইবে।

দরিয়া-বিবি অসহ্য যন্ত্রনায় দিশাহারা হয় না। আগন্তুক অতিথির অসম্মান সে কিরূপে সহ্য করিবে? এক হাত দিয়া পেছনে দেখিতে হয়, সে না হঠাৎ মাটীর উপর আছাড় খায়।

দরিয়া-বিবির চোখে আর কোন প্রশ্ন নাই। ত্বরান্বিত হোক হে আদিম শিশু তোমার আগমন। এত যন্ত্রনার মধ্যে জননী তোমার পথ-ই ত চেয়ে থাকে। কত লজ্জা, কত অপমান ধিক্কার বাহিরের জগতে প্রতীক্ষমান, আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষমান। আপ্ত-রমণী মাঝে মাঝে মনের সঙ্গে যোঝাযুঝির ক্ষেত্রে কতবার পরাস্ত—আজ বিজয়িনীর মত দরিয়া-বিবি ধাত্রী ও প্রসূতি হইয়া যায় একত্রে। নিজে নিজের শরীরের উপর অসম্ভব ঝাঁকুনি প্রয়োগ করে সে। গৃহস্থের দুলালীর মত সে ত বহুক্ষণ এই ঘরে পড়িয়া থাকিতে চায় না। সে আবার ধাত্রী একাধারে। আরো কাজ আছে। কাজ……

দেড় ঘন্টা কেমন করিয়া কাটিল, বিধাতা হয়ত জানেন।

প্রথম শিশুর অসহায় চীৎকারে ছোট্ট রান্নাঘরটী একবার সচকিত হইল।

মাটীর গামলা ও পানী পূর্বেই রাখা ছিল।

দরিয়া-বিবি প্রথমে শিশু-কে বুকে তুলিয়া লইল। হয়ত তাকে বুকে চাপিয়াই বসিয়া থাকিত। শিশুর চীৎকারে খেয়াল হয়। এই সাবধান-বাণীর জন্য দরিয়া-বিবি বড় কৃতজ্ঞ-সজল চোখে শিশুর দিকে তাকাইল; তারপর গামলায় গোসলের সব খুটিনাটি সম্পন্ন করিল। অতঃপর শয্যার ব্যবস্থা। কয়েকটী রঙীন কাঁথা দরিয়া-বিবি বিছাইল ও দুইটী কাঁথা মুড়িয়া নবজাতক-কে শোয়াইয়া দিল। সে নিজে তখন-ও দিগ্বসনা। তাড়াতাড়ি নিজে পরিষ্কার হইয়া তার নবতম অতিথিকে মাই খুলিয়া দিল। কি সুন্দর চুক্‌চক্‌ শব্দ হয়। কি মোটা তাজা গৌররং শিশু! দরিয়া-বিবি উম দিতে থাকে। শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে হঠাৎ কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল অলক্ষিতে।

বাহিরে শৃগাল প্রহর ডাকিল। দুই পেচক কলহ করিয়া আবার জুড়ি কণ্ঠ মিশাইল।

দরিয়া-বিবি বসিয়া রহিল।

নব-প্রসূতির দেহে কোথাও কি যন্ত্রণা আছে, দুর্বলতার আক্রমণ আছে? হয়ত নাই। তাই নির্বিকার দরিয়া-বিবি বসিয়া রহিল। উম পাইয়া শিশু ঘুমাইতে লাগিল। সে-ও কেমন নির্বিকার। বাহিরের পৃথিবী সুপ্ত। এখানে গ্রাম্য রান্না-ঘরের বুকে কি গভীর প্রশান্তি! পুত্র ও জননী পরস্পরের সান্নিধ্যে পৃথিবী-কে ভুলিয়া গিয়াছে।

মানুষের পক্ষে বিস্মরণ কি এত সহজ? দর্মায় মোরগ বাং দিল। ভোর হইয়া আসিয়াছে। দরিয়া-বিবি মনে মনে শুধু ভাবিল, ভোর হোয়ে এসেছে। ভাল কথা। একটু পরে সকাল হবে।

আবার মোরগ ডাকিল। সাকেরদের পাড়া হইতে-ও মোরগের আওয়াজ আসিতেছে। আরো ভোর হইল।

শিশুকে শোয়াইতে গেলে সে হাত-পা নাড়িয়া একটু শিহরিয়া উঠিল, তার কাঁচা ঘুমে ব্যাঘাত। আবার সে শান্ত হইয়া গেল।

দরিয়া-বিবি নবজাতকের দিকে অপলক চাহিয়া, বার কয়েক চুম্বন করিল।

তারপর উঠিয়া পড়িল। শ্লথ-গতি নয়, দ্রুত। দরিয়া-বিবি কর্তব্যে ঢিলা, কে এমন অপবাদ দিবে?

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকিতেছিল চালের বাতার কাছাকাছি ফাঁক দিয়া। তখন-ও বাহিরে অন্ধকার।

গরুর দড়ী-গাছি দরিয়া-বিবি নিজেই মাচাঙে দাঁড়াইয়া চালে টানাইল। শুধু প্রসূতি, ধাত্রী নয়। আর এক কর্তব্য সম্পাদন বাকী আছে। দরিয়া-বিবি যে জল্লাদ।

শিশুর বিছানায় গিয়া সে দেখিল, পুত্র ঘুমাইতেছে। পুত্র! বেটা ছেলে! কয়েকবার মৃদু চুম্বন দিয়া দরিয়া-বিবি উঠিয়া দাঁড়াইল। কুক্কুটের কি অসীম স্নেহ ও প্রভু-ভক্তি। নিজের হাতে ইহাদের দরিয়া-বিবি কত খুদ-কুঁড়া খাওয়ায় প্রতিদিন। কৃতজ্ঞ প্রাণী—ভোরের

সানাই বাজাইল।

আর দেরী করা চলে না। দরিয়া-বিবি নিজের মনে উচ্চারণ করিল। হঠাৎ আসেক্‌জানের কথা মনে পড়িল তার। বুড়ি চাল্লিশা খাইয়া ঘরে ফিরিতেছে, হাতে খাবারের পুঁটলি, লাঠির উপর ভর দিয়া বৃদ্ধ হাঁটিতেছে।……

দড়ীর ফাঁসের দিকে দরিয়া-বিবি তাকাইল। সারা জীবনে কত উদ্বেগ কত সংগ্রামজনিত ক্লান্তি—সব ওইখানে ঝুলাইয়া রাখিয়া আজ সে নিশ্চিত হইতে চায়।

তার আগে দরিয়া-বিবি ডিপা নিভাইয়া ঘর অন্ধকার করিয়া দিল।

৪৫

রৌদ্র উঠিয়াছিল গাছে-পালায়, আকাশ ভরিয়া। মার তাড়া নাই। আমজাদ নঈমা শরী খুব ঘুমাইয়াছিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া আর কেউ বাহিরে আসিতে পারে না। অগত্যা চেঁচামেচি সাকেরের মা হাসু-বৌকে খবর লইতে পাঠাইয়াছিল। সে টাঁটি খুলিয়া দিল।

আবার রান্না-ঘরের টাঁটি বাহির হইতে তাহাকেই কৌশলে খুলিতে হইল। হাসু-বৌর প্রথম চোখে পড়িল, রঙীন কাঁথার অরণ্যে সদ্যজাত ঘুমন্ত শিশু।

তারপর উপরের দিকে চাহিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। আতঙ্কিত পরিবেশের মধ্যে সে কাঁথা-সহ শিশুটী-কে বুকে তুলিয়া লইল আর নামাইল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে জন-বিরল গ্রামের এই অখ্যাত অঙ্গনটী ক্ষুদ্র জনতায় ভরিয়া উঠিল। আসিল রহিম বখ্‌শ, রোহিনী চৌধুরী, চৌকিদার, সাকে আমিরণ-চাচি অনেকে। রহিম বখ্‌শ চৌধুরী—যাহাদের পা'র ধূলা কোন-দিন দীন আজহারের অঙ্গনে পড়ে নাই, তাহারা-ও আসিয়াছিল। সংসারে প্রতিদিন মৃত্যুর তোরণ যারা সাজাইয়া রাখে, মৃত্যুর প্রতি তাহাদের কৌতূহল বেশী। কৌতূহল মিটাইতে হইবে বৈকি! তাঁহারা আসিয়াছিলেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সার্টিফিকেটেই সব কাজ হইল। থানা পর্যন্ত আর দাঁড়াইল না।

হাসু-বৌ শিশুটীকে বুকে করিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল। সাকের প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু হাসু-বৌ মরীয়া। তার সুপ্ত অদম্য তেজের মুখে, নিষ্পাপ শিশুর নিরপরাধিতার সাফাই-কীর্তনের মুখে সকলের জবরদস্তি উবিয়া গেল।

আমিরণ-চাচি শরী আমজাদ ও নঈমা-কে নিজের ঘরে আশ্রয় দিল।

আরো দুই-তিন মাস পরে আসিল মোনাদির। লেখা-পড়া ছাড়িয়া চটকলে কাজ লইয়াছে সে। আরো জওয়ান; আরো জঙ্গী-ভাব চেহারায় স্পষ্ট।

আমিরণ-চাচি তাহার হাত ধরিয়া হাউমাউ করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। মোনাদির রাজী হইয়াছে ঃ শহরে তার কর্মস্থল, কিন্তু তার আবাস-ভূমি চিরদিনের জন্য মহেশ-ডাঙায়।

BANGLA BAZAR GOVT. GIRLS' HIGH SCHOOL
DACCA